শুধাই জনে-জনে

শুধাই জনে-জনে

অচিনকুমার চক্রবর্তী

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রকাশক :
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ,
মহালয়া—১৩৬৩

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
ফণী সাহা

মুদ্রাকর :
অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
সীতারাম প্রেস
৩৮/এ, হরিতকীবাগান লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পরম সুহৃদ্

ডাক্তার :—

শ্রীশঙ্করনাথ গুপ্ত, এফ. আর. সি. এস্.

ও

শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ

করকমলে—

॥ লিখে রেখে যাই ॥

সাহিত্য জগতের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন, তীক্ষ্ণ শ্রবণ-শক্তি এবং সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী থাকলে সমাজের অনেক কিছু দেখা যায় ও শোনা যায়। সেই দেখা কিংবা শোনা বস্তুগুলি যদি হৃদয়ের গভীর অনুভূতি দিয়ে পর্যালোচনা করে, সহজ-সরল ভাষায় রূপ দেওয়া হয়, তাহলেই সু-সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।

কথাটা খুব সত্য সন্দেহ নেই, তবে সাহিত্যেও ইদানীং সমাজের নানা বাস্তব চিত্র তুলে ধরার বিষয়ে নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তবু কেউ কেউ সাহিত্য-কর্মে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় নিচ্ছেন। তার ফলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য হয়তো অনেক ক্ষেত্রে মাধুর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠছে, আবার এর বিপরিত দিকটাও লক্ষ্য করে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। আমি সাহিত্য সমালোচক নই, সুতরাং এই বিষয়ে কিছু বলার অধিকার আমার নেই। তবে যে যা বলেন তার সত্যাসত্য ভাবতেই হয়।

এখানে স্বীকার করতে দোষ নেই, আমি সমাজের একজন অতি সাধারণ মানুষ। সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার অনুভূতি আপনাদের মতন আমারও আছে। সুতরাং অন্তর দিয়ে যা অনুভব করি তার প্রভাব লেখার মধ্যে যদি এসে পড়ে, তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। তার পরিচয় এই গ্রন্থ। তবে এই গ্রন্থে আমার দৃষ্টিভঙ্গী বা রচনাশৈলীতে যদি কোন অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে বুঝব দীর্ঘ দিনের সাহিত্য সাধনায় আমি সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। এটাই লেখক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার মনে করি।

বিপুলা পৃথিবী, অফুরন্ত তার সৌন্দর্য ভাণ্ডার। প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের অনুভূতি নিয়েই তো মানুষের জীবন। যে

জীবনে প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা, মায়া-মমতা, হাসি এবং কান্নার অন্ত নেই। সেই জীবন যতই আজ জটিল মনে হোক না কেন, জীবন-সংগ্রাম অতীতেও মানুষকে করতে হয়েছে। ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনিই করতে হবে। তবে তফাৎ যেটুকু দেখা যাবে তা' হচ্ছে, অতীতে জীবন-সংগ্রামের নায়ক-নায়িকার ভাষা ছিল মূক, আর আজ তাদের ভাষা যুগ-যন্ত্রণার ফলে ক্রমশঃ মুখর হয়ে উঠেছে। তাই আজকের নায়ক-নায়িকাদের সমাজের কাছে রয়েছে নানা প্রশ্ন। যার সদুত্তর তারা চাইছে কিন্তু পাচ্ছে না। এখন জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায় সেই নায়ক-নায়িকাদের হয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর আজ আমিই "শুধাই জনে-জনে"। যদি জনগণের কাছ থেকে তার কোন উত্তর পাওয়া যায়, তাহলে আমার শ্রম সার্থক হবে। নায়ক-নায়িকারাও বোধ হয় খুশী হবেন, তাঁদের প্রতি আমার গভীর মমত্ববোধের জন্য।

নববর্ষ ১৩৬৩
শিক্ষা-নিকেতন
কলানবগ্রাম
বর্ধমান

অচিনকুমার চক্রবর্তী

॥ এক ॥

লোকে অনেক কিছুই বলে।

যে যাই বলুক, আমি কিন্তু সত্যি-কথাই বলছি ভাই—। আমার বাজারে দেনার মধ্যে একগাদা টাকা, আর এখন পর্যন্ত পাওনার মধ্যে অফিসে দিন কয়েক ছুটি। কথাটা শেষ করে অতর্কিত ভাবেই নলিনী দারোগার সামনে এসে দাঁড়াল শুল্কবিভাগের তরুণ-অফিসার, বন্ধু-শরদিন্দু মিত্র।

—তাই চলে এলে বুঝি! কয়েকদিন এখন তাহলে বাড়িতেই থাকবে?

: হ্যাঁ। বন্ধুকে আর কোন রকম প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়েই, শরদিন্দু সামনের শূন্য চেয়ারটা জবর দখল করে বসে পড়ল।

একমনে হুইলে নতুন কেনা সুতোর ফেটিটা গুটিয়ে যাচ্ছে নলিনী। মাঝে মাঝে শুধু একবার জ্বলন্ত সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে ফেলছে।

কিছুক্ষণ শরদিন্দু চুপ করে বসে থাকার পর একটু ব্যঙ্গ স্বরেই বলে উঠল, আজ তাহলে কোথাও রূপসী মৎস্য কন্যার সন্ধানে যাচ্ছ?

রসালো কথাটা কানে যেতেই একবার মুখ তুলে তাকাল নলিনী দারোগা। তারপর মৃদু হাসতে হাসতে সে বেশ মিষ্টি কণ্ঠে উত্তর দিল, রূপসী কন্যা তেমন আর পেলাম কই! তোমার সন্ধানে যদি থাকে তো…?

উত্তরটা বোধহয় ঠোঁটের ডগায় তৈরীই ছিল শরদিন্দুর। তাই সে বলে ফেলল, তা তুমি যদি খোঁজ করতে বল তাহলে এই ছুটির মধ্যেই খুঁজে দেখতে পারি। তবে—।

—থামলে কেন ভাই! বলে যাও, তোমার যা বলার আছে। আমার কাছে, তোমাদের ঐ তবে-ঠবে বলে কোন বস্তু নেই। খোঁজ পেলেই বলবে, একদিন গিয়ে ধরে আনব।

নলিনীর কথা শুনে চমকে উঠল শরদিন্দু। তারপর অভিযোগের সুরে বলতে লাগল, ঐ তো এই জন্যই তখন তবে কথাটা বলতে চাইছিলাম।

—তার মানে? হাতের হুইল শুদ্ধ ছিপটা একপাশে রেখে দিয়ে

নলিনী তাকাল বন্ধুর মুখের দিকে। তার জিজ্ঞাসু চোখ দুটিতেও সেই একই প্রশ্ন!

দুই বন্ধুর দৃষ্টি বিনিময় হতেই হঠাৎ হালকা পরিবেশটা অন্য রকম হয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শরদিন্দু আবার প্রসঙ্গটা তুলে বলতে লাগল, তোমার ঐ ধরে আনার কথাই আমি একটু আগে বলছিলাম ভাই। তোমাদের পুলিশি ধর-পাকড় ব্যাপারটা অনেকে খুব ভাল চোখে দেখেন না জান বোধ হয়। কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করেন। তাই তোমার জন্য কোন রূপসী কন্যার সন্ধান করতে গেলে হয়ত আমাকে অনেক জবাবদিহি—!

শরদিন্দুর কথায় বাধা দিয়ে নলিনী বলে উঠল, আমার দারোগাগিরির কথা বলতে চাইছো? কেন! আমরা কি মানুষ নয়? পুলিশে চাকরী করি শুনলে, তোমার রূপসী কন্যা ভয়ে বেঁকে বসবে! মন্তব্যটা শেষ করে নলিনীদারোগা অদ্ভুত ভাবে হাসতে লাগল।

সেই হাস্যরোলের মাঝে শরদিন্দু নিজের বক্তব্যের সমর্থনে বলে চলল, আমি ঠিক ও কথা বলতে চাইনি, বলছিলাম—পুলিশের লোক এবং তাদের ব্যবহার সম্পর্কে এখন সাধারণ মানুষের ধারণা খুব একটা ভাল—!

—ও:তো অতি পুরাতন কথা, কবেই বা পুলিশের সুনাম ছিল! যেমন আজও লোকে বলে, হাঁস ডিম পাড়ে—খায় দারোগাবাবু। মানে পুলিশের লোক সব শাক্ত, আর সাধারণ মানুষেরা সমস্ত বৈষ্ণব। পাপ তাঁদের সহ্য হয় না, কি বল?

আচমকা বন্ধুর এই রকম তির্যক উক্তির জন্য বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না শরদিন্দু। তাই সে যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে সামলে নিতে তাকে বেশী বেগ পেতে হ'ল না। ঠিক আগের মত দৃপ্তকণ্ঠেই সে বন্ধুকে বলল, আরে ভাই, সব পুলিশই তো সমান নয়! তাঁদের মধ্যেও ভাল-মন্দ আছে বৈকি। এই ধর যেমন তুমি! সবাই বলে লোকটা ও লাইনে গেল কেন?

অন্যমনস্ক হয়ে আবার হুইলে সুতো গুটিয়ে যাচ্ছিল নলিনীদারোগা। হাতের কাজটা শেষ হতেই সে শুধাল, হ্যাঁ কি যেন বলছিলে? আমি কিন্তু তোমার কথাগুলো ঠিক খেয়াল করিনি।

প্রসঙ্গটাকে এবার সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে শরদিন্দু বললে, নাঃ তেমন কিছু বলিনি। শুধু বলছিলাম—আজ তাহলে মৎস্য-কন্যার সন্ধানেই যাবে?

— কি আর করি বল, পুলিশে চাকরী করি বলে যদি তোমার রূপসী কন্যা ভয়ে দূরে সরে যায়, তাহলে দু'একটা সখের জিনিস নিয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি? জীবনটাকে তো আর মরুভূমি করে তুলতে পারি না!

হঠাৎ একটা তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে নলিনীদারোগা আবার বললে, ও সব কথা এখন থাক ভাই। একটা কাজের কথা শোন। ভাল কোন পুকুরের হদিস দাও দেখি। মনের সুখে একদিন মাছ ধরে আনি।

শরদিন্দু এসে প্রথম যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিল, তার খেই হারিয়ে ফেলেছিল সে। নলিনী কথার মোড় ঘোরাতেই নতুন ভাবে কথা বলার সুযোগ পেয়ে বেশ উৎসাহ সহকারেই তখন শরদিন্দু বলল, পুকুরের হদিস! তা' দিতে পারি বৈকি।

—কাদের পুকুর? কৌতুহলপূর্ণ প্রশ্ন নলিনীদারোগার।

: মেমসাহেবদের।

—মেমসাহেবদের পুকুর! সে আবার কোথায় হে? অবাক হয়ে জানতে চাইল নলিনী বসু।

: অবাক হোচ্ছ কেন! আমরা অজ পাড়া গাঁয়ে বাস করি বলে কি, এখানে মেমসাহেবদের পুকুর থাকতে পারে না হে?

—তা' পারবে না কেন! তবে এ' থানায় বদলী হয়ে সেই আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত তো—ভাই শুনিনি, তোমাদের গ্রামে ঐ নামে কোন পুকুর আছে! কারণ আমি তো—!

একটু মুচকি হেসে সরস ভঙ্গীতে এবার শরদিন্দু বলে, আছে হে—আছে। আমাদের গ্রামে মেমসাহেবও আছেন, আর তাঁদের বিরাট পুকুরও রয়েছে। তবে সেখানে অথৈ জল।

—জল পুকুরে যত খুশী থাক—তাতে ক্ষতি নেই। মাছ আছে কিনা তাই বল।

বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে শরদিন্দু বলে যায়, মাছ আছে কিনা সেতো টোপ আর চার ফেললেই বুঝতে পারবে—দারোগা মশাই।

—তা' অবশ্য বুঝতে পারব। তবে অনেক পুকুর আছে যেখানে অযথা

চার-মশলাই নষ্ট হয়। এখানে আবার তা' হবে না তো? তাছাড়া পুকুরে যদি কাঁকড়া থাকে তাহলেই সর্বনাশ!

শরদিন্দু এবার বেজার হয়। সে বলে, —আমি ভাই মৎস্য শিকারী নই। সুতরাং অত সূক্ষ্ম খবর রাখি না। মাছ ধরার কায়দাও আমার জানা নেই। লোক-মুখে শুনি, ভাল চার-মশলা ফেললে মাছ যেখানেই থাক ছুটে আসে। কাজে-কাজেই— !

—তুমি ঠিক কথাই শুনেছ। ভাল মশলার সুগন্ধে চারে মাছ ছুটে আসে বটে, তবে অনেক পুকুরের কাত্‌লা মাছ শুধু লেজে খেলায়, টোপ খায় না—একথাটা বোধ হয় শোননি? এর উপর যদি পুকুরে আমাছা থাকে তাহলে বিরক্ত করে মারে। সারাদিনের শ্রম, পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়। এটাও বোধ করি তুমি জান না!

ঃ কি করে মাছ ধরার এতো রহস্য জা'নব বল, আমার বাড়িতে ও সবের পাঠ নেই। সহপাঠীদের মধ্যে একমাত্র তোমারই ছোটবেলা থেকে ঐ বাতিক আছে দেখে আসছি। তাও— !

—আরে! ছোটবেলার কথা তাহলে এখনও তোমার মনে আছে দেখছি! সত্যি ভাই, শেষ পর্যন্ত আমাদের বড় জ্যাঠামশাইর কথাই আমার জীবনে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। তিনি মাছ ধরার বাতিক দেখে আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'লিখিবে পড়িবে থাকিবে দুখে, মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে!'

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নলিনী দারোগা বোধ হয় একবার কৈশোর জীবনের তপ্তোজ্জ্বল দিনগুলির কথা ভেবে নিল। তারপর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলতে লাগল, জ্যাঠামশাইর এই ব্যঙ্গোক্তি শুনে, মা—আমায় কত বকাবকিই যে করতেন তার হিসাব নেই। বাবাও রাগারাগি কম করতেন না, একবার তো পায়ের খড়ম দিয়ে ঘা-কতক দিয়েই বসলেন। ব্যস্‌ আর যায় কোথা! ঠাকুরমা গর্জে উঠলেন। তিনি কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলে বলতে আরম্ভ করলেন, নলেন মাছ ধরে, তাই বলে ওকে তুই খড়ম পেটা করবি? ওর ধরা মাছ তোরা কি ফেলে দিস্‌! গুষ্ঠিশুদ্ধ সবাই তো বেশ রসিয়ে রসিয়েই খাস! বাবা প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঠাকুমার ধমক খেয়ে চুপ করে গেছলেন।

আমি খড়মের চোট খাওয়া জায়গায় হাত বোলাতে বোলাতে কাঁদছি দেখে, ঠাকুমা আমায় বলেছিলেন। নাঃ তোকে আর লেখাপড়া করতে হবে না। যত দূর করেছিস তাতে আর কিছু না হোক—দারোগাগিরি করে খেতে পারবি।

বাল্যবন্ধুর কথা শুনে হেসে উঠল—শরদিন্দু। ঠাট্টারচ্ছলেই সে বললে, ঠাকুরমার ভবিষ্যৎ বাণীই তো দেখছি তোমার জীবনে মিলে গেছে। সত্যি-সত্যিই বাঘা দারোগা হয়েছ।

—তা' হয়েছি বলতে পার। ঠাকুরমার কথায় সায় দিয়ে জ্যাঠামশাইও একদিন আমাকে এই কথা বলেছিলেন। তাঁদের ভবিষ্যৎ-বাণী সবই প্রায় মিলে গেছে। শুধু একটা এখনও মেলেনি! কথাটা শেষ করে নলিনী অর্থপূর্ণ হাসির ফোয়ারায় কিছুক্ষণ ডুবে রইল।

হাস্যরোল থামতেই হঠাৎ শরদিন্দু, নলিনীকে জিজ্ঞেস করে বসল, তোমার জ্যাঠামশাই খুব নাম করা জ্যোতিষ ছিলেন না? শুনেছি, ভাল জ্যোতিষীদের কথা, অনেক সময় ঠিক ঠিক মিলে যায়। তোমার সময় হলে হয়ত বাকি ভবিষ্যৎ-বাণীটাও মিলে যাবে।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে অদ্ভুত ধূম্রকুণ্ডলী সৃষ্টি করে, উদাস নয়নে বেশ কিছুটা সময় শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল—নলিনী দারোগা। তারপর আবার আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে শরদিন্দুকে সে বলতে লাগল, ভবিষ্যৎ যা হ'বার তাই হ'বে। আজ ও সব ভেবে লাভ নেই। বর্তমানের কথা বলছি শোন, কালই তাহলে সেই মেমসাহেবদের পুকুরে মাছ ধরতে যাওয়ার ব্যবস্থা কর।

: কালই ব্যবস্থা করতে হবে? কেন দু'দিন পরে হলে চলবে না! কাল না হয় আমাদের নতুন পুকুরে বসার ব্যবস্থা করি। গত বছর ওটাতে অনেক মাছ ছাড়া হয়েছে।

—এক বছরের হালি পোনা! অত ছোট মাছ ধরে সুখ হবে না। তার চাইতে বরং অন্য কোথাও যদি ভাল—!

বন্ধুকে আর বেশী কথা বলতে দিল না শরদিন্দু, এক রকম ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলল সে, বেশ তাহলে কাল মেমসাহেবদের পুকুরেই চল।

—অতি উত্তম কথা। এই ছোট্ট বাক্যটি উচ্চারণ করেই নলিনী

জানতে চাইল, হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল, আচ্ছা—আগে থেকে খবর-টবর না দিয়ে গেলে তুমি কোন অসুবিধায় পড়বে না তো ? তাছাড়া আজ-কালকার দিনে পুলিশের লোক শুনে যদি তোমার মেমসাহেব— !

: এঁ্যা, কি বললে ? আমার মেমসাহেব ! অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল শরদিন্দু ।

বন্ধু-কথার প্যাঁচ ধরে ফেলতেই, নলিনী এবার সেই কথাটাই আর একটু ঘুরিয়ে বলতে চেষ্টা ক'রল, হ্যাঁগো-হ্যাঁ, তোমাদের গাঁয়ের মেম-সাহেবই না হয় হ'ল, শহরের হ'লে ভয়ের কিছু ছিল না !

: না-না তোমার কোন ভয় নেই। বাঙালী মেমসাহেব রে ভাই, তার উপর আমার ছোট বোনের বান্ধবী। প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসে। সদা হাস্যময়ী, কলা-বিদূষী তরুণী, বুঝলে। মনটাও চমৎকার। মাছ ধরতে তুমি তাদের পুকুরে গেলে খুব খুশীই হবে। তার বাবাও অতিশয় ভাল মানুষ, ভীষণ সাহিত্য রসিক তিনি। আলাপ করে আনন্দ পাবে। বাড়িতে শুধু দুই মেয়ে আর নিজে থাকেন। বড় মেয়ে বি. এ. পাশ করেছে, তবে এখনও বিয়ে হয়নি। ছোটটি এবার বি. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। অর্থাৎ পার্টওয়ান দেবে।

—তারপর, তারপর ? বর্ণনা তো চমৎকার দিচ্ছিলে থামলে কেন ! শরদিন্দুর মুখের রূপান্তর লক্ষ্য ক'রেই কথাটা হঠাৎ বলে ফেলল নলিনী দারোগা। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু আগের মতই বন্ধুর মুখাবয়বের প্রতি নিবদ্ধ। যদি আর কোন—!

সামান্য অভিযোগের সুরে উত্তর দিতে গিয়ে শরদিন্দু বলল, তোমার কথাটা যেন একটু বেসুরো ঠেকছে ! আমাকে তুমি সন্দেহ-ঠন্দেহ করলে না কি ?

—তোমাকে সন্দেহ করতে যাব কেন ! তবে তোমার কণ্ঠের সুর আমার কানে যেন কেমন-কেমন লাগছে ! কোন গোলমাল নেই তো ? অবশ্য আজকাল এ'রকম—!

: এই তো ভাই তোমাদের দোষ। যে কোন কথার মধ্যেই তোমরা কেবল গোলমাল শুনতে পাও। এই জন্যই কেউ সহজে পুলিশের কাছে

মুখ খুলতে চায় না। লোকে বলে, 'বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা।' তার উপর তুমি দীর্ঘদিন আই. বি. অফিসার ছিলে!

শরদিন্দুর অভিযোগপূর্ণ উক্তি শুনে নলিনী দারোগা আবার অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠল। বাল্য বন্ধুর মনের মধ্যে ঝড়ের সংকেত দেখতে পেয়ে সে বলতে লাগল, তুমি বোধ হয় জান যে, ভাল গোয়েন্দা অফিসাররা মানুষের চোখ-মুখ, চাল-চলন এবং কথাবার্তার সূত্র ধরে অনেক সময় রহস্য উদ্ঘাটন করে থাকেন। কাজেই তোমার কথা শুনে যদি আমি কোন রহস্যের সন্ধান পাই, তাহলে—!

: দোহাই তোমার ভাই নলিনী, আমার পিছনে তোমাকে আর গোয়েন্দাগিরি করতে হবে না। একেই জ্বলে-পুড়ে মরছি। ছোট বোন সর্বদাই বাক্যবান দর্ষণ করছে। তার উপর যদি আবার পশ্চাতে তুমি লাগো, তাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে অন্য জেলায় বদলীর চেষ্টা করতে হবে। নয়ত দেশান্তরে—!

বন্ধুকে বাধা দিয়ে দারোগা মশাইকে বলতে শোনা গেল, ব্যস্-ব্যস্। আমার যা জানার ছিল তোমার ঐ কথাতেই তা জেনে গেছি। ঠিক আছে—তোমাকে যাতে দেশ ছেড়ে পালাতে না হয়, তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। খরচ-টরচ কেমন করবে? সেই বুঝে কাজে হাত দিতে হবে তো!

: তার মানে! ঘুসের কথা—!

—আরে না-না, ঘুস্-টুস্ লাগবেনা। তুমি কি ভেবেছ বল দেখি? আমি কি শুধু দারোগাগিরিই করি, সমাজ-সেবার কাজও আমাকে মাঝে মধ্যে করতে হয়। সুতরাং তুমি এখন নিশ্চিন্তে বাড়ি গিয়ে মেমসাহেবকে বলে, কাল তাঁদের পুকুরে ছিপ ফেলার ব্যবস্থা করে রাখ। তারপর যা থাকে অদৃষ্টে—! এসপার-ওসপার যা হয় একটা করে আসব।

অনেক ক্ষণের বাক্ যুদ্ধে দু'জনেই কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। গলাও শুকিয়ে গেছে দুই বন্ধুর। শরদিন্দু উস্‌খুস্ করছে দেখে নলিনী জানতে চাইল, কি হে! চা—না কফি? কোনটা খাবে বল। সেই সঙ্গে যদি আর কিছু ইচ্ছা কর তাও বলে ফেল। আমার ত্রাণকর্তা দয়াল ঠাকুরকে স্মরণ করি। তাঁর দয়াতেই তো এখন পর্যন্ত বেঁচে আছি।

: চায়ের সঙ্গে যা হয় একটা কিছু আনতে বল। তোমার দয়াল ঠাকুর ভাল চিড়ে ভাজতে পারে! আজ তাই না হয় হোক। বেশি ঝামেলায় দরকার নেই। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

—বেশ তাই আনতে বলি। আজ তোমায় খাঁটি গব্য ঘৃতে ভাজা চিড়ে আর চা খাওয়াচ্ছি। তার সঙ্গে গরম গরম কয়েকখানা আলুর পাঁপড়ও হবে নাকি?

: আরে না—না, ওতেই হবে। তোমার ঘরে লক্ষ্মী আসুক তাঁর কাছে একদিন এসে কব্‌জি ডুবিয়ে খাওয়ার বায়না ক'রব। এখন বেচারা দয়াল ঠাকুরকে অযথা বিব্রত করে লাভ নেই, বুড়ো মানুষ!

লক্ষ্মীর কথা তুলতেই নলিনী হেসে ফেলল। স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে বন্ধুর কথার জবাব দিতে গিয়ে বলতে লাগল, আরে ভাই আমি চিরকালের লক্ষ্মীছাড়া। সুতরাং লক্ষ্মীভাগ্য আমার নেই। নইলে এতদিনে! এই পর্যন্ত বলে সে হঠাৎ থেমে গেল। অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে চেষ্টা করল, পারল না। দয়াল ঠাকুর এসে দাঁড়াতেই ওকে চা আর চিড়ে ভাজার হুকুম দিয়ে, কথার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার জন্য তাকে অন্য আলোচনার সূত্রপাৎ করতে হ'ল। বুঝলে শরদিন্দু, মাকে প্রায়ই বলতে শুনতাম—'রাহুর দশা শনির শেষ প্রাণে না মারে ছাড়ায় দেশ'। আমারও হয়েছে তাই। রাহুর দশা আর শেষ হচ্ছে না!

: কেন কি হয়েছে তোমার? বেশ তো আছ বাবা! আমার মতন ঝামেলাতো আর তোমাকে পোহাতে হবে না। প্রসঙ্গক্রমে শরদিন্দু সেই পুরাতন কথাটা আবার শোনাল, বাজারে এক গাদা টাকা দেনা। তার উপর কাঁধে রয়েছে আইবুড়ো একটা বোন।

নলিনী দারোগাকে দু'বার দেনার কথা শোনাতেই সে বিরক্ত প্রকাশ করে বলে উঠল, তোমার তো ভাই দেনা হবার কথা নয়! অত টাকা আয় কর, সংসারে লোকও বেশী নেই। তাহলে দেনা হবে কেন? তাছাড়া বাড়িতে কিছু জমি জায়গাও তো রয়েছে! তাতে যা হোক কিছু আয়—।

বন্ধুকে কথাটা শেষ করতে দিল না শরদিন্দু। সে তার বক্তব্যকে জোরদার করবার জন্য বলতে লাগল, জমি জায়গা থাকলে কি হবে। তার আয় পেতে হলে আজকাল যে রকম খরচ তাতেই দিনদিন দেনার অংক

বাড়ছে। কারণ ফসল যা পাই তাতে চাষের খরচ উঠে না। মাইনের টাকায় সংসারও চলে না, কাজেই—!

—কাজেই অযথা চিন্তা করে মেজাজ খারাপ করে লাভ নেই। যেমন চলছে চলতে দাও। যা হওয়ার তাই হবে। নাও দয়াল চা নিয়ে আসছে খাও।

গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নলিনী, দয়ালকে বলল, 'সিগারেটের আর একটা প্যাকেট দিয়ে যাও। আর শোন—কাল আমি সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে শরদিন্দুদের ওখানে মাছ ধরতে যাব। চাট্টি চারের মশলা ভেজে গুঁড়ো করতে হবে। যদি পার আজ কিছু পিঁপড়ের ডিম সংগ্রহ করে রেখো।'

দয়াল ঠাকুরের প্রতি নির্দেশ শুনে শরদিন্দু হাতের পেয়ালাটা টেবিলের উপর রেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, সেকি! তুমি অত সকালে খেয়ে-দেয়ে যাবে কেন? মা শুনে ভীষণ রাগ করবেন। মীতাও অসন্তুষ্ট হবে। না—না দয়াল, তোমাকে ওর জন্য রান্না করতে হবে না! কাল নলিনী আমার ওখানেই খাবে, তুমি বরং ওকে খুব ভোরে ডেকে দিও নইলে বাবুর আটটার আগে ঘুমই ভাঙ্গবে না।

শরদিন্দু ঠিকই বলেছে। দারোগা মশাই একটু বেলাতেই শয্যা ত্যাগ করেন। অবশ্য তার কারণও আছে, মনিবের পক্ষ সমর্থন করল স্বয়ং দয়াল ঠাকুর! সে, বাবুর বেলায় ঘুম থেকে উঠার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলল, আজ্ঞে, বাবুর নাওয়া-খাওয়া আর শোয়ার যে কোন সময়ের ঠিক নাই। রেতের ডিউটি তো প্রায়ই থাকে। সেই জন্যই ঘুম থেকে উঠতে বেলা হয়। তাতেও ভাল করে একটু ঘুমোতে পারেন না। সর্বক্ষণ থানায় একটা না একটা হুজ্জত লেগেই থাকে। সাহেব-সুবো এলে তো কথাই নাই। দারোগার চাকরীতে কোন সুখ নেই দাদাবাবু! আমি, বাবুর সঙ্গে রয়েছি তা' আজ কমদিন তো হল না। সবই নিজের চোখে দেখছি।

দয়ালকে আর কথা বেশী বলার সুযোগ দিল না নলিনী, সে কৃত্রিম ধমকের ভঙ্গীতে বলল, সব নিজের চোখে দেখ—ক্ষতি নেই। এখন যা বলেছি তাই করগে। রাতে আজ ভাত খাব না। অন্য কিছু করতে পারবে?

: যা খেতে চাইবেন তাই করে দেব। লুচি না-পরটা, কি খাবেন বলে দেন। গরম-গরম ভেজে দিতে আমার কোন অসুবিধাই হবে না। মাংস তো রান্না করাই আছে। যখন খাবেন গরম করে দিলেই হবে।

দয়াল ঠাকুরের লোভনীয় খাদ্য তালিকার জের শুনতে শুনতে ধুমকেতুর মতই এসে উপস্থিত হয়ে বীরেশ রায় বলল—আসর আজ খুব গরম মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি বড় বাবু? নিশ্চয়ই কোন সুখবর আছে!

—তুমি তো সব সময়েই খবর সংগ্রহের ধান্ধায় ঘুরে বেড়াও, হঠাৎ অসময়ে যে? নতুন কিছু লেখার মাল-মশলা চাই বোধ হয়। যাক এসেই যখন পড়েছ—তখন বসো। তোমার সঙ্গে আমার বাল্যবন্ধু শরদিন্দু মিত্রের পরিচয় করিয়ে দিই। শরদিন্দু, ইনি সাংবাদিক বীরেশ রায়! কয়েকটি নামকরা দৈনিক পত্রিকার স্থানীয় সংবাদদাতা। একজন সুলেখকও বটে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প-টল্প লিখে হালফিল বেশ নাম হয়েছে। বইও লিখছে একখানা। যাকে তোমরা বলে থাক উদীয়মান কথা-সাহিত্যিক। ইনি হলেন তাই।

সবিস্ময়ে বলে উঠল শরদিন্দু, তাই নাকি! আলাপ হয়ে ভালই হ'ল, সাহিত্যিক—তার উপর সাংবাদিক। দরকার হলে আমিও আপনাকে লেখার মাল-মশলা সরবরাহ করতে হয়ত পারব।

বীরেশ রায় অতি বুদ্ধিমান এবং চতুর লোক। যে কোন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের অসাধারণ ক্ষমতা আছে ভদ্রলোকের। বাকপটু তিনি, সুতরাং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষকে মুগ্ধ করে মনের কথা জানার সুযোগ পেলে আর কথা নেই। বেশ আসর জমিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারেন। সেই ফাঁকে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ হয়, তাই ফলাও করে সংবাদ তৈরী করতে বেশী সময় লাগে-না রায় মশাইর। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ ফ্যাসাদেও পড়ে যায়। এই জন্যই অনেকে সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলেন। নয়ত তৈল মর্দন করেন।

নলিনী দারোগা তো স্পষ্টই শরদিন্দুকে বলে দিল। বীরেশ বাবুকে লেখার মাল-মশলা দাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো—সাংবাদিকদের অসাধ্য কোন কাজ নেই। বিশেষ করে তিলকে তাল

বানাতে ওরা সিদ্ধ হস্ত। সেই কারণে তোমার কর্মস্থলের পরিচয়টা ইচ্ছে করেই দিলাম না। আপাততঃ বাল্যবন্ধু এইটুকুই বলে রাখা ভাল। নইলে—!

গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দাগিরি করতে পারেন। পরিহাসচ্ছলে মন্তব্য প্রকাশ করে শরদিন্দু তাকায়—বীরেশ রায়ের দিকে। তারপর স্বেচ্ছায় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নলিনী। তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইল। কাল সকালেই তুমি আমাদের বাড়ি যাচ্ছ।

দুই বন্ধুর আলোচনার মাঝখানে এসে পড়ে নিজেকে বড় অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন বীরেশবাবু। তাই অযাচিত ভাবেই কিছু বলার চেষ্টা করলেন, আমি হঠাৎ এসে পড়ায় বোধ হয় আপনাদের কথাবার্তার ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম! কিন্তু কি করব বলুন? সাইকেল ঠেঙ্গিয়ে এতদূর যখন এসেই পড়েছি, তখন বড়বাবুর কাছ থেকে কিছু মাল-মসলা সংগ্রহ করে না নিয়ে গেলে পরিশ্রমের মজুরী উঠবে না। যদি কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে আর একটু বসে যান না শরদিন্দুবাবু। আলাপ হ'ল অথচ কোন কথা হ'ল না। এটা যেন সেই শ্রীরাধার কাছে ললিতা সখির শ্রীকৃষ্ণ সংবাদের মতন—!

মাছ ধরার সরঞ্জামগুলো হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল নলিনী দারোগা। তারপর বেশ তির্যক রস মিশিয়ে বলতে আরম্ভ করল, নাও এবার ঠ্যালা সামলাও শরদিন্দু। সাহিত্যিকের পাল্লায় পড়েছ—এখন বসে কিছুক্ষণ বৈষ্ণব গীতিকাব্য শোন। আমি বরং দয়াল ঠাকুরকে আর একদফা চা দিয়ে যাওয়ার কথা বলে আসি।

চা! তা হলে তো ভালই হয়। আপনার এখানকার চা খেয়ে সত্যিই খুব তৃপ্তি পাই। আসলে কি জানেন, দয়াল ঠাকুর চা তৈরী করে ভাল। আচ্ছা বড়বাবু, আপনি কার দোকান থেকে চা কেনেন বলুন তো? গন্ধটি কিন্তু চমৎকার। নিশ্চয়ই দামও তেমনি নেয়! বেশ চটুল ভাবেই কথাগুলো শেষ করলেন বীরেশ রায়।

বীরেশবাবু সম্পর্কে প্রথম মন্তব্য শুনেই শরদিন্দু বাক সংযম করে এতক্ষণ শুধু নীরব শ্রোতা হয়েছিল। এবার তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'ল, 'যেমন গুড় তেমনি মিঠে'। ভাল চা খেতে হ'লে একটু দাম বেশী দিতে হবে বৈকি।

দয়াল ঠাকুর চা দিয়ে যেতেই বীরেশবাবু গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন, আমাদের বড়বাবু অত্যন্ত সৌখিন মানুষ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁর রুচিই আলাদা। এক কথায় যাকে সবাই সুরুচিবান বলে থাকে।

অল্প সময়ের মধ্যে পুরো পোষাকে এসে উপস্থিত হ'ল নলিনী বসু। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে জানতে চাইল, সুরুচির কথা কি যেন বলছিলে সাহিত্যিক? ও মেয়েটি কিন্তু সুবিধের নয়। কেসটায় আমাকে ফাইন্যাল রিপোর্টই দিতে হচ্ছে।

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন বীরেশবাবু। কণ্ঠস্বরও তাঁর বদলে গেল। এতদিন তিনি আশা করেছিলেন সুরুচির কেসটায় বড়বাবু চার্জসীট দেবেন। ছেলেটার সাজা হয়ে যাবে। ফাইন্যাল রিপোর্ট দিলে ছেলেটা জেল হাজতে থেকে খালাস পেয়ে এসে সর্ব প্রথম যে তাঁকেই আক্রমণ করবে। কারণ তিনিই তো সুরুচির পক্ষ সমর্থন করে ছেলেটির বিরুদ্ধে ফলাও করে স্থানীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এমন কি ছেলেটির বাবাকে ব্যক্তিগত ভাবে দু'কথা শুনিয়ে দিতেও ছাড়েননি। আর সেই ছেলে নির্দোষী প্রমাণ হয়ে বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে! সর্বনাশ—যদি মান-হানির মামলা করে দেয়!

আলোচনার গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বীরেশবাবুর বাচন ভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটতে দেখে, মনে মনে হাসছিল নলিনী বসু। সাহিত্যিকের মলিন মুখে ভীত এবং সন্ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠতেই সে জিজ্ঞেস করল, কি হে! ভয়ে চুপ করে গেলে কেন? আমি তো ভাই তোমাকে সংবাদ প্রকাশ করার আগেই বলেছিলাম, ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। তুমি বললে, না না মেয়েটিকে তোমরা ভাল রকম জান। ওকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে কাণ্ডটা করেছে। তদন্ত করতে গিয়ে দেখলাম আসলে ঘটনাটা একেবারেই সাজানো। অযথা ভদ্রলোকের ছেলেটাকে ফ্যাসাদে ফেলেছে!

ঝানু দারোগার কথার সদুত্তর দিতে পারে না নবীন সাংবাদিক বীরেশ রায়। তাকে আমতা আমতা করে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতে হয়, আমি যত দূর শুনেছিলাম—!

এবারে কিছুটা বিরক্ত হয়েই নলিনী বসু বলে উঠে, আরে বাবা শোনা

কথার কি মূল্য আছে? সাংবাদিক হয়েছ, নির্ভরযোগ্য তথ্য না পেয়ে এই ধরনের সংবাদ পরিবেশন করতে যাওয়াটাই তোমার আহাম্মুকি হয়েছে। যাঁরা অভিজ্ঞ সাংবাদিক, তাঁরা এ'রকম বোকার মতন কাজই করেন না।

বন্ধুর মন্তব্য শুনে নিছক কৌতূহলবশত শরদিন্দু কিছু বলতে চেষ্টা করতেই নলিনী দারোগা ইসারায় থামিয়ে দেয় তাকে। তারপর বীরেশ রায়কে উদ্দেশ্য করে বলল, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, এড়ে বাছুরই তার কাল হ'ল কিনে। এবার ঠ্যালা সামলাও।

ভগ্ন হৃদয়ে আসন ত্যাগ করে চলে যেতে হ'ল আজ বীরেশ রায়কে। তাঁর জীবন-গীতিকাব্য শরদিন্দুকে আর শুনতে হ'ল না। ভদ্রলোক সাইকেল নিয়ে স্থান ত্যাগ করা মাত্র, বন্ধুর কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইল শরদিন্দু। তার সকৌতুক প্রশ্ন, লোকটিকে তুমি হঠাৎ এত দমিয়ে দিলে কেন বলত?

—তা' নইলে তোমাকে সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত বকাত। আর আমাকেও জ্বালাতন করে মারত। তারপর যদি শুনত আমি কাল তোমাদের ওখানে মাছ ধরতে যাব, ব্যস্ অমনি আমার পিছু নিত। ব'লত, আমিও তাহ'লে ছিপ নিয়ে আসব বড়বাবু! তুমিও ভদ্রলোককে তখন এড়াতে পারতে না। তাই মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করে ওকে ভাগিয়ে দিলাম। অবশ্য আবার ওর সাক্ষাৎ তুমি পাবে, কথা যখন একবার দিয়েছ—তখন লেখার মাল-মশলার তাগিদেই আসবে।

নলিনী বন্ধুর বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না শরদিন্দু। সেই সঙ্গে তার একই অনুরোধ, কাল তুমি কিন্তু সকাল বেলাতেই আমাদের বাড়ি চলে আসবে। সন্ধ্যায় শিকার সেরে ফিরে আসতে চাও আসবে, নয়ত—!

—রাত্রে থাকার কথা বলছ! পাগল তাই হয় নাকি? থানায় আমাকে ফিরতেই হবে। কখন কোথায় যে হুট্ করে গোলমাল বাঁধবে তার ঠিক নেই। তার উপর নতুন মেজবাবু, তিনি তো মফঃস্বলেই আছেন। তাঁর আজ ফেরার কথা। রাত্রে ফিরলে, কাল আমি সকালে তদন্তে বের হ'ব।

: সেকি! তদন্তে বের হ'লে আমার ওখানে যাবে কখন! বিস্মিত নেত্রে শরদিন্দু তাকায় বন্ধুর দিকে।

—ওসব দারোগার দপ্তরের আইন-কানুন তুমি বুঝবে না। আমাদের

নাওয়া, খাওয়া, ঘুমোতে যাওয়ার এমন কি প্রত্যুষে প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করা, সবই করতে হয় ডায়েরীতে একটি কথা লিখে রেখে, লেফ্‌ট্ ফর্ ইন্‌ভেস্‌টিগেসন্। বুঝলে? কথাটা শেষ করেই আবার সেই অদ্ভুত হাসির ঢেউ তুলে থানার দিকে এগিয়ে গেল নলিনী বসু।

দারোগা মশাইর হাস্যরোল শুনে সতর্ক প্রহরীর বুঝতে অসুবিধা হ'ল না বড়বাবু আসছেন। সে তাড়াতাড়ি ডিউটি-অফিসারকে জানিয়ে দিল, হুজৌর বড়া বাবু আ—!

বারান্দায় উঠেই হাঁক ছাড়ল নলিনী দারোগা, রামবিলাস, হাবিলদার সাহেবকো বলাও। পরক্ষণেই বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলল, তাহলে ঐ কথাই রইল শরদিন্দু! তুমি ও'দিকে সব ঠিক করে রেখ। আমি কিন্তু—!

: 'হ্যাঁ—সকাল-সকালই এস। কাল আবার সাক্ষাৎ হবে সরসী-তীরে।' মৃদু অথচ কাব্যময় শব্দটি উচ্চারণ করে যেন বেশ তৃপ্তিলাভ ক'রল শরদিন্দু।

দীর্ঘ সময়ের আলাপের গুঞ্জন ধ্বনির রেশ থামতে না থামতেই শরদিন্দুর দ্রুত চলমান পদধ্বনি থানার গণ্ডী পেরিয়ে, শিরীষ আর কৃষ্ণচূড়ার গাছে ঢাকা জনবহুল পথে হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হয়ে গেল।

শরদিন্দুর অকস্মাৎ আবির্ভাব এবং প্রস্থান দুই নলিনী বসুর কাছে বোধ হয় কিঞ্চিৎ রহস্যময় বলে মনে হ'ল! যেমন রহস্যাবৃত চরিত্র শরদিন্দুর মনে হয়েছে ঐ বীরেশ রায়ের!

॥ দুই ॥

পরদিন দুই বন্ধুতে গিয়ে অনুমান করে দেখল, পুকুরটা দৈর্ঘে ও প্রস্থে যথাক্রমে ষাট হাত এবং প্রায় তিরিশ হাত হবে। বড় পুকুর তো বটেই দীঘিও বলা চলে, সুতরাং জলের গভীরতা অনেক। অশান্ত নীলাভ জলে ভাসমান শ্বেত শতদল, আর আশে-পাশের কলমী লতার ফাঁকে দু' একটা শালুক ও রক্ত কুমুদ ফুল। জনশ্রুতি এই পুকুরে রুই-কাত্‌লা থেকে শুরু করে শাল-শোল, বোয়াল মাছ পর্যন্ত নাকি আছে!

এ'হেন মৎসবহুল পুকুরে সুগন্ধী মশলা-একাঙ্গী প্রভৃতির চার এবং বোলতার টোপ, পিঁপড়ের ডিম, পাউরুটির মতন মুখরোচক মাছের খাবার নিয়ে ছিপ ফেলে বসল নলিনী বসু। পাকা মেছুরে সে—তাই তোড়-জোড়ের অভাব নেই। ঝোলায় সরঞ্জাম অনেক রকম আছে, অর্থাৎ পুকুর থেকে খালি হাতে ফেরার পাত্র দারোগা মশাই নয়।

মিথ্যে কথা বলেনি শরদিন্দু, সত্যিই পুকুরটায় ভাল মাছ আছে। অল্প সময়ের মধ্যে চারে মাছও এসে জমেছে। জলে এন্তার ফুট কাটছে। মনে হয় এখনই টোপ্‌ ধরবে। সিগারেট ধরিয়ে নলিনী বসু ফস্‌ করে বলে ফেলল, একটু মেয়া আনব ভেবেছিলাম-তা আনার সুযোগ পেলাম না। কাল ঐ পাগলাটা এসেই সব গোলমাল করে দিল!

—মেয়া! সে আবার কি হে? শুধায় শরদিন্দু। কারণ ঐ জিনিসটি কি, তার জানা নেই। নামও শোনেনি কোনদিন।

ওঃ তুমি তো ভাই—বস্তুটির পরিচয় না দিলে বুঝতে পারবে না। কিন্তু পরিচয় দেওয়াও যে—বিপদ! শুনলে হয়ত আঁতকেই উঠবে।

—ভনিতা না করে সোজা বল জিনিসটা কি?

: তাহলে একান্তই জানতে চাও! তবে শোন—জিনিসটি ধেনো মদের ছাকা, অতি দুর্লভ বস্তু। যত্র-তত্র মেলে না।

—এ্যা! মাছ ধরতে তোমাদের ঐ বস্তুও লাগে?

: লাগে বৈকি, নেশার আকর্ষণ যে সাংঘাতিক। একবার ওর গন্ধ নাকে গেলে মাছ চার ছাড়তে চায় না। টোপ ধরবেই।

অনর্গল বকে গেলেও নলিনীর দৃষ্টি এবং মন দুই জলে ভাসমান ফাতনার দিকে, কারণ মাছ মাঝে মধ্যে টোপ খাচ্ছে। এমন সময়ে হঠাৎ পুকুরের জলে এসে নামল একদল মরাল-মরালি। তাদের চঞ্চল কলধ্বনি এবং সন্তরণের ঢেউয়ে স্থির ফাত্‌নাটা দুলে উঠতেই ছিপ তুলে আর একটু দূরে বঁড়শীটা ফেলতে অনুরোধ করল শরদিন্দু।

বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করে নলিনী একটা ঢিল ছুঁড়ে মারতেই মরাল-দম্পতি সশব্দে চলে গেল। কিছু সময় নীরব থাকার পর আবার তারা পদ্ম কুঞ্জের অন্তরালে গিয়ে আরম্ভ করল লুকোচুরি খেলা। সেই সঙ্গে শামুক আর গুগ্‌লি খাওয়ার জন্য একের পর এক দিতে লাগল ডুব সাঁতার।

হংস-মিথুন দর্শনের লোভ সামলাতে পারল না বোধ হয় শরদিন্দু। মরাল-মরালিদের জলকেলীতে বন্ধুর মৎস্য শিকারে ব্যাঘাত ঘটছে বুঝতে পেরেই অনিচ্ছায় সে বলে উঠল, যতই ঢিল ছুঁড়ে মার আর তাড়া দাও, সহজে ওরা জল ছেড়ে উঠছে না।

হুঁ, ধ্বনিটির সঙ্গে সঙ্গে নলিনীবসু একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নিল সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সুদর্শন বন্ধু শরদিন্দুকে। এতক্ষণ সে তার ভাবান্তর লক্ষ্য করেনি। এবার যেন চক্ষু ও কর্ণ তাকে একটু সচেতন করে তুলল। এই যে তার সচেতনতা, একি কোন নাটকীয় দৃশ্যর মূল্যায়ন করা বা রহস্য আবিষ্কারের পূর্ব ইঙ্গিত। না অন্য কিছু! একেই বলে দারোগার মন। সব কিছুরই উপর যেন সন্ধানী দৃষ্টি।

প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখছিল শরদিন্দু। সত্যিই মনোমুগ্ধকর সে দৃশ্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তিল ও ছাতিম ফুলের মৃদু গন্ধ পরিবেশটাকে যেন আরও সুন্দর এবং কাব্যময় করে তুলেছে। দিগচক্রবালের ধূসর তটরেখার দিকে দৃষ্টি পড়তেই শরদিন্দুব মনটা যেন আরও উদাস হয়ে উঠল। নলিনীও মাঝে মাঝে মুগ্ধ নয়নে উপভোগ করছিল সেই দিগন্তের মায়াজড়ানো অনন্ত সৌন্দর্য রাশি।

—আয় চই-চই-চই! আয়-আয়।

অপূর্ব নারী কণ্ঠের ঝঙ্কারে চমক ভাঙ্গল দুই বন্ধুর! ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে জল থেকে উঠে গেল মরাল দম্পতির দল। একটু অন্য মনস্ক হয়েই পড়েছিল মৎস্য শিকারী নলিনী বসু। সেই ফাঁকে

মাছে টোপ খেয়ে যেতেই ছিপ তুলে আনল সে। টোপও বদলে দিতে হ'ল ফের।

শরদিন্দু, নারী কণ্ঠের ঝঙ্কারের যাদু দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সত্যিই কি আশ্চর্যজনক ব্যাপার! এতক্ষণ ঢিল ছুঁড়েও যাদের জল থেকে তোলা সম্ভব হয়নি, তারা শুধু একটি ডাকেই উঠে গেল! নাঃ এই জন্যই বোধহয় ওদের—!

নেহাৎ অনিচ্ছা বশত একটা খ্যাঁচ মারল নলিনী, অল্প সময়ের মধ্যে আবার শূন্য বঁড়শীটা জল থেকে তুলে আনতে দেখে, হঠাৎ নেপথ্য থেকে শোনা গেল এক ঝলক চঞ্চল হাসির শব্দ। খিল খিল ধ্বনির-প্রতিধ্বনি কানে যেতেই ছিপটা বন্ধুর হাতে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে নলিনী দেখল, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে শুভ্র মরাল কোলে উদ্ভিন্ন যৌবনা এক সুন্দরী তরুণী। কাজল পরা ষোড়শীর নয়নে চটুল চাহনি আর ওষ্ঠে তার বিদ্রুপের হাসি। শরদিন্দুর হাতে ছিপ দেখে সে বলে উঠল, 'ইস্ উনি মাছ ধরবেন! তাহলেই হয়েছে আর কি। মাছ ধরা যেন অতই সহজ।

এবার ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। নলিনী বন্ধুর আদৌ বুঝতে কষ্ট হ'লনা যে, তার বন্ধুর উদ্দেশ্যেই ঐ তীক্ষ্ণ বাক্যবান বর্ষণ করলেন এই বিদূষী তরুণী। আড়চোখে সে একবার তাকাল শরদিন্দু মিত্রের মুখের দিকে। পরক্ষণে দৃষ্টি ফেরাল নেপথ্যের নায়িকার পদসঞ্চরণ অনুসরণ ইচ্ছায়। কিন্তু তার সন্ধানী দৃষ্টি ব্যর্থ হবার উপক্রম হ'ল। ভীতা বন-হরিণীর মতই চঞ্চল পদে কখন সে একটু দূরে সরে গেছে! যাক ক্ষতি নেই। আবার তাকে আসতেই হবে। অন্ততঃ মনোবিজ্ঞানে—!

'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত পোহায়।' ঠিক এই ভয়ের আশঙ্কাই করছিল শরদিন্দু। তনুশ্রীর চটুলতায় বেশ লজ্জিতও হ'ল বোধ হয় সে।

একটা ঝোপের আড়ালে বসেছিল নলিনী দারোগা। তাঁর সতর্ক দৃষ্টি বোধ হয় কিছু আবিষ্কারের জন্যই অপেক্ষা করছিল। বঁড়শীতে নতুন টোপ গেঁথে জলে ফেলতে গিয়ে সুতোটা ঝোপের একটা লতায় আটকে গেল। বসে সেটা ছাড়ানো গেল না। তাকে উঠে দাঁড়াতেই হ'ল। বেশ কিছুটা সময় টানাটানি করে বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল, যা বাবা

দিদি তো মেজাজটা বিগড়ে। চারে মাছ রয়েছে আর এই সময় সুতোটা গেল লতায় আটকে! ইস্ টোপ ফেলতে পারলেই মাছটা গেঁথে যেত।

নলিনী বসুর সুতোর টানে ঝোপটা নড়ে উঠতেই হঠাৎ কি যেন বলতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল তনুশ্রী। বোধহয় শরদিন্দুর—দারোগা বন্ধুকে দেখে লজ্জায় সে আর কিছু বলতে পারলনা। দ্রুত সলজ্জ পদে পালিয়ে গেল কিন্তু যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তার আরক্তিম মুখভঙ্গী যে শরদিন্দুর মনে ঠিক বনশ্রীর মতই ক্ষণিকের জন্য মৃদু দোলা দিয়ে যাবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তনুশ্রীর বাক্যবান বর্ষণটাও দিদির মতন মনে হতেই পরাজয়ের গ্লানি বশত দৃপ্ত কণ্ঠে তাকে বলতে শোনা গেল, আজ মাছ আমাদের ধরতেই হবে। নলিনী, তুমি সুতোটা ঠিক করে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছিপ ফেল ভাই। মাছ তোমাকে ধরতেই হবে।

: হ্যাঁ, তাতো ধরতেই হবে বুঝতে পারছি, এক অপূর্ব ভঙ্গীতে জবাবটা দিল নলিনী বসু। তারপর চারে কিছুটা মশলা ছিটিয়ে দিয়ে আবার সে ছিপ ফেলে বসল।

একেই বলে গ্রহের ফের! গ্রহরাজ তাঁর আপন গতিতে স্থান পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে বেলা পড়ে আসছে, অথচ পাকা মেছুরে হওয়া সত্বেও দারোগা সাহেব বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না দেখে—শরদিন্দু ভাবতে লাগল, ভাগ্য অনুকূল নয়। নইলে এতক্ষণে একটা মাছ অন্ততঃ ছিপে ওঠা উচিৎ ছিল।

দেখতে দেখতে বেলা শেষ হ'ল। সূর্যের শেষ রশ্মির প্রতিবিম্ব এসে পড়ল দীঘির অথৈ জলে, বৃক্ষ চূড়ায় তারই রক্তিম আভা, দিগন্তে নেমে আসছে গোধুলির স্নিগ্ধ মধুর আমেজ। অরণ্য-বহ্নি শীতল হতেই শোনা যাচ্ছে দূরে বহু পত্র পুষ্পে শোভিত বনরাজির শাখা-প্রশাখায় দক্ষিণা বাতাসের মৃদু-মন্দ পদধ্বনি। মধু অন্বেষী ক্লান্ত মধুকরগণের সঙ্গীতপ্রিয়, লজ্জাবগুণ্ঠিতা আরক্তিম কুমুদ—ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে দেখে, নলিনী দারোগাকে আপন মনে বলতে শোনা গেল, আশ্চর্য! প্রকৃতির কি বিচিত্র খেয়াল। সূর্য-অস্ত যাবার সাথে-সাথেই লাল শাফলা-গুলো ফুটে গেল?

ঋতুরাজ বসন্ত। অপরূপ তাঁর সৌন্দর্যানুভূতি। সৃষ্টির উন্মাদনায়

তিনি ব্যাকুল। তাই কবির কল্পনায় তাঁর আর এক নাম ব্যাকুল বসন্ত। কালের বিবর্তনের সঙ্গে তাই তো এর নিবিড় সম্পর্ক, জীবন ও যৌবনের অতি প্রিয়। হাস্য-লাস্যেই তার অভিব্যক্তি। চঞ্চলতা কি অসমাপ্ত কৈশোর আর অনাগত যৌবনের অলংকার।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে তন্ময় হয়ে কি যেন চিন্তা করছিল শরদিন্দু। বন্ধুর স্বগতোক্তি কানে প্রবেশ করতেই চমকে উঠল, আচমকা নলিনীকে জিজ্ঞাসা করল, এ্যাঁ! কি বললে? প্রকৃতি—তাই না!

নলিনী একমনে মৎস্য শিকারের আশায় ফাত্‌নার দিকে তাকিয়ে ছিল। স্থির দৃষ্টি রেখেই একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল, হুঁ।

ঝরণাধারার মতই আবেগে শরদিন্দু বলতে লাগল, এবার ছুটিতে আসার পর থেকেই দেখছি আমার প্রতি তনুশ্রীর বাক্যবান বর্ষণটা হঠাৎ কেন যেন বেড়ে গেছে।

: তনুশ্রী! বিস্ময় ভরা দৃষ্টি ফেরায় নলিনী-বন্ধুর দিকে।

—হ্যাঁ, তনুশ্রী! আমার বোনের বান্ধবী, বনশ্রীর ছোটবোন। কতই বা ওর বয়স! এই সেদিন ও ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াত! সবে মাত্র শাড়ী পরতে আরম্ভ করেছে। এই শাড়ী পরা আরম্ভ করার পর থেকেই ওর—!

: চুপ, বাধা দিল নলিনী। ফাত্‌না ডোবাচ্ছে দেখছ না? আস্তে আস্তে ছিপটা হাতে তুলে নিয়ে তাক্ করে বসে রইল দারোগা মশাই; মিনিট পাঁচেক পরে বিরক্ত হয়ে বলতে লাগল, দেখলে বেশ কিছুক্ষণ টোপ ঠুকরেও শেষ পর্যন্ত খেলনা ভাই মাছটা! চার ঘোলা করে দিয়ে চলে গেল। এখনও জলে বুদবুদ উঠছে। একেই বলে ফিচেল মৃগেল মাছ। ব্যাটারা কিছুতেই বঁড়শী গিলতে চায় না। খালি চারে এসে ঝামেলা করে। অন্য মাছগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে হাঁপিয়ে গেল নলিনী বসু। তারপর একটি মোক্ষম মশলার টোপ দিয়ে ছিপ ফেলার পর শরদিন্দুকে প্রশ্ন করল, হ্যাঁ, এখন তুমি জবানবন্দী আরম্ভ করতে পার। আমি মন দিয়ে শুনে যাচ্ছি।

শরদিন্দু তার জবানবন্দী আরম্ভ করতেই হঠাৎ জলের শব্দে চমকে উঠল দারোগা মশাই, একটা গন্ধরাজ ফুলের ঝোপের ভিতরে বসে সে

পরিষ্কার দেখতে পেল সান্ধ্য স্নান করার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই মেয়েটি। কণ্ঠে তার এক অজানা সুন্দর পল্লীগীতি।

মেয়েটিকে বড় বেহায়া মনে হচ্ছিল নলিনীর, কিন্তু সে শরদিন্দুর সম্মান-হানির আশঙ্কায় কিছু বলতে পারছিলনা কারণ মেয়েটির নাম শুনলেও তার কাছে সে এখন পর্যন্ত অপরিচিতা। সুতরাং—!

চিন্তায় ছেদ্ পড়ল। আচমকা ছিপে টান মারতেই নলিনীর হাতের হুইল থেকে সশব্দে অনেকটা সুতো টেনে নিল খুব বড় একটা মাছে। কয়েক গজ সুতো টেনেই গোটা কয়েক লাফ মারল লাল টকটকে বিরাট এক রুই। তৎক্ষণাৎ গভীর জলের তলায় তলিয়ে গেল সে। শক্ত হাতে হুইল চেপে ধরে সুতো ছাড়ছিল নলিনী বসু। তারপর ধীরে ধীরে খেলাতে লাগল তাকে। প্রায় এক ঘণ্টা মাছ ছুটাছুটি করে এলিয়ে পড়ল, তখন আস্তে আস্তে মাছটা পারের কাছে টেনে আনল। ছাক্‌নি জালের সাহায্যে শরদিন্দু জল থেকে অতি সাবধানে মৎস্যরাজকে তুলে দিতেই ওপারে সেই মধু কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল, ওরে বাবা কি বিরাট রুই মাছ! প্রায় চার কে. জি. হবে! যাই এখনই বাড়িতে বলিগে।

ত্রস্তপদে জল থেকে উঠার সময় সিক্তবসনা তনুশ্রী দেহের আবরণ অতি সতর্ক ভাবে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছিল বটে, কিন্তু তার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি ছিল সদ্য জল থেকে তোলা বিরাট সেই রুই মাছটার প্রতি। তাই—সে ভিজে কাপড়ের বেয়াদপি খেয়াল করতে পারেনি।

এতক্ষণে শরদিন্দুর মুখে উল্লাসের হাসি দেখা দিল। সে বেশ উঁচু গলায় বলল, নাঃ তোমার সত্যিই বাহাদুরী আছে নলিনী! আমি ভাই ধৈর্য প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলাম, ভেবেছিলাম—!

—আপনি যাই ভাবুন, আমাদের পুকুরের অত বড় মাছ ধরেছেন ভাগ দিয়ে যেতে হবে কিন্তু, নইলে দিদিকে বলে দেব! বেশ তির্যক ভঙ্গীতে কথাগুলো বলে বাড়ির মধ্যে চলে যাচ্ছিল তনুশ্রী।

দিদির ভয় দেখাতেই আর চুপ করে থাকতে পারল না শরদিন্দু। সেও দৃপ্ত কণ্ঠে জবাবটা শুনিয়ে দিল, কষ্ট করে মাছ ধরেছি কি ভাগ দিয়ে যাবার জন্য? আর একটা পেলে দিয়ে যাব। দিদিকে গিয়ে বল এখনই

আমাদের দু' কাপ চা পাঠিয়ে দিতে। সেই সকাল থেকে পুকুর ধারে বসে আছি, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

বন্ধুর মুখে খৈ ফোটার মতন কথা শুনে অবাক হয়ে গেল নলিনী বসু। সে ক্লান্তি বিনোদনের জন্য সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আজ আর মাছ পাবার আশা নেই। এটারই অর্ধেক ভাগ দিয়ে যেও।

নলিনী দারোগার কথায় হাসতে লাগল শরদিন্দু। তারপর সে বলল, অনেক মেহনতের মাছ এটা! কাজেই ভাগ চাইলেই কি ভাগ দেওয়া যায় হে?

: ওদের পুকুরের মাছ যখন—তখন ভাগ দেবেনা কেন?

খুব মেজাজের মাথায় শরদিন্দু জবাব দিল, সে আমি বুঝব। তোমায় ভাবতে হবেনা। নাও ছিপটা আবার ফেল দেখি। এখনও সে রকম অন্ধকার হয়নি। যদি আর একটা লেগে যায়!

তৎক্ষণাৎ হাত ঘড়িটার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নলিনী বলে উঠল, সাড়ে পাঁচটা বাজে! আর ছিপ ফেলে কাজ নেই। চল এখন যাওয়া যাক। জিনিস পত্তর গুছিয়ে ফেল।

মাছটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে শরদিন্দু সোৎসাহে বন্ধুর কাছে জানতে চাইল, এখনই উঠবে? আরও আধ ঘণ্টা তুমি অনায়াসে বসতে পার। তাছাড়া চায়ের কথা যখন শ্রীমতীর কানে গেছে, তখন—! এই পর্যন্ত বলে রহস্যপূর্ণ হাসির অন্তরালে সে নিজেকে লুকোতে চেষ্টা করল। পারল না—ধরা পড়ে গেল দারোগার কাছে।

মৌচাকে খোঁচা দিল দারোগা সাহেব। সে চট্ করে বেশ লাগাম সই জবাবটা দিলে, শ্রীমতীর হাতের তৈরী চা তোমার তৃষ্ণা মেটালেও আমার তৃষিত কণ্ঠ থেকে কিন্তু খুব সুখশ্রাব্য উক্তি বেরুবে না। জানই তো আমার মুখ?

একটু ঘাবড়ে গেল শরদিন্দু। সে ভাবল নলিনী বোধ হয় অন্য লাইনে যাচ্ছে, শ্রীমতী বলতে কি বুঝেছে তার ঠিক নেই। তাই বেচারা বাক্যটির ব্যাখ্যা করে শোনাতে চেষ্টা করল, আরে শ্রীমতী মানে তনুশ্রী। ওরা গ্রামে আসার পর থেকেই আমার সঙ্গে চলছে শ্রীমতীর রেষারেষি। ছোট বোনের বান্ধবী হিসাবে ওরা দুই বোন প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসে।

মীতার সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করে। মাঝে মাঝে নানা রঙ বেরং এবং মৌসুমী ফুল উপহার দিয়ে যায়।

: আর সেই ফুল মীতা তোমার টেবিলের ফুল দানিতে সযত্নে সাজিয়ে রেখে দেয়। তারপর?

—তারপর আবার কি! নলিনীর কথার উত্তরে বিস্ময় প্রকাশ করল শরদিন্দু। ছেলে মানুষের মতন অন্য প্রসঙ্গ তুলে কথার মোড় ঘোরাতেও সে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু কোন সুফল হ'ল না। অগত্যা তাকে সেই সাহিত্যিক বীরেশ বাবুর ব্যাপার জানার আগ্রহ প্রকাশ করতে হ'ল।

: তোমার বরাৎ ভাল যে, আজ আমার সঙ্গে সাহিত্যিক আসেনি। বলল, নলিনীবসু। শরদিন্দুর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে সে আবার বলে, চেহারাটাতো বেশ নায়ক-নায়ক বানিয়ে ফেলেছ দেখছি! তা'শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গড়াবে? বীরেশবাবু সঙ্গে থাকলে হয়ত তোমাকে নিয়েই একটা উপন্যাস—!

দারোগার হেঁয়ালী বেশী দূর গড়াতে দিল না অমেত্য, অর্থাৎ তনুশ্রীদের বাড়ির বহু পুরাতন চাকর অমৃতলাল এসে জানাল, আঁজ্ঞে আপনারা আসুন, চা তৈরী হয়ে গেছে।

শরদিন্দুর ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলনা নলিনী। চা এর তাগিদেই তাকে সরঞ্জাম গুটিয়ে ফেলতে হ'ল। তাছাড়া সূর্যও অস্ত গেছে। মাছ ধরার সময় আর নেই। মেজাজও বিগড়ে যেতে বসেছে, কারণ কোন অপরিচিত মানুষের বাড়িতে গিয়ে এইভাবে চা খাওয়াটা তার ধাতে সয়না। বরং—!

বন্ধুর মনোভাবটা বুঝতে পেরেই শরদিন্দু বলতে লাগল, এক কাপ চা তো বাবা—অমেত্যকে দিয়ে এখানেই পাঠিয়ে দিতে পারত। আবার বাড়ির মধ্যে টানার কি দরকার ছিল! আসলে প্রমথবাবু বোধ হয় তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান, বুঝলে?

: প্রমথবাবু? এ' নাম তোমার কাছে কোনদিন শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না!

—আরে বাবা, কোন নামটা শোনাবার সুযোগ তুমি আমাকে দিয়েছ? গতকাল তোমার ওখানে যেতেই পুকুরের খোঁজ করতে বললে

আজকের সারাদিনটা এখানেই কাটল। চল বাড়িতে গিয়ে একের পর এক নামাবলি শোনাব।

: নামাবলি শুনে আমি কি করব! মোল্লার দৌড়—মসজিদ পর্যন্ত এইটুকুই আমরা বুঝি। নাম মাহাত্ম্য আমাদের মনে কোন সময় রেখাপাত করেনা। একমাত্র বাপ-মায়ের নাম ছাড়া।

বাবার কাছে মীতার দাদা ও তাঁর দারোগা বন্ধুর মাছ ধরার গল্প বলতে বলতে হঠাৎ অমেত্যর হাঁক ডাকে তনুশ্রীকে নীচে নেমে আসতে হ'ল। বৈঠকখানা ঘরে নলিনী বন্ধুকে নিয়ে শরদিন্দুকে ঢুকতে দেখেই সে দিদির কাছে এসে বলল, দিদি! ওঁরা এসে গেছেন। আমি যাই বাবাকে খবরটা দিয়ে আসি। অত বড় মাছ দেখলে বাবা খুব খুশী হবেন।

প্রমথবাবু নীচে এসে চাকরকে ডেকে বললেন, অমেত্য, মাছটা এখনই শরদিন্দুদের বাড়িতে পৌছে দিয়ে আয়।

—গোটা মাছটা! অর্ধেকটা কেটে রাখার কথা বলছিল যে, নলিনী। প্রমথবাবুকে খুব সংকোচের সঙ্গেই বলল শরদিন্দু।

: না-না কাটাকাটির দরকার নেই। গোটা মাছটাই দিয়ে আসুক। কষ্ট করে তোমরা একটা মাছ ধরেছ, ওটা তোমাদের—!

চায়ের পেয়ালা আর জলখাবার নিয়ে বনশ্রী ঘরে প্রবেশ করতেই প্রমথবাবু বলে উঠলেন, আগে জল খাবার দিয়ে পরে চা আনলে ভাল হ'ত। নইলে চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!

টেবিলের উপর ডিস দিতে দিতে বনশ্রী বললে, ওঁদের চা তনুশ্রী আনছে। এটা আপনার জন্য এনেছি। আপনাকে কি এখন আর কিছু দেব?

গরম চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে প্রমথবাবু বলতে লাগলেন, আমি এখন শুধু এককাপ চা-ই খাব। ওঁরা সেই সকাল থেকে রোদে বসেছিলেন ক্ষিদেও নিশ্চয়ই পেয়েছে। ঐ কখানা লুচিতে কি হবে? আর কয়েকখানা এনে দাও। ডিমের মামলেট—!

দুটো প্লেট লুচি আর মামলেট এনে বনশ্রীর হাতে দিয়ে তনুশ্রী জিজ্ঞেস করল, চা আনব?

অতিথিদের আপ্যায়নের মধ্যে কোনরকম বাহুল্য নেই—রয়েছে অকৃত্রিম

আন্তরিকতা, এটা পরিষ্কার বুঝতে পারল নলিনী বসু। বেশ ঘরোয়া এবং আপনজনের মতই শরদিন্দুর সঙ্গে কথাও বলছিলেন প্রমথবাবু। তনুশ্রী চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তিনি বনশ্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, অমেত্যর গাই দোয়ান হয়নি?

প্রমথবাবুর প্রশ্নের নিহিতার্থ বুঝতে পেরেই শরদিন্দু বলে উঠল, না-না দুধের চাইতে এখন গরম এক পেয়ালা চা হলেই ভাল হয়। এত জল খাবার খাওয়ার পর—!

মৃদু কণ্ঠে বিনয় প্রকাশ করল এবার বনশ্রী, এত আবার কোথায়? সামান্য জলযোগ। সেই সাত সকালে তো খেয়ে এসেছেন। বাবা, দুপুরে আপনাদের এখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা করতে আমায় বলেছিলেন।

মেয়ের বক্তব্য সমর্থন করে প্রমথবাবু বললেন, সেইটা হলেই তো ভাল হ'ত। নলিনীবাবু প্রথম আমাদের বাড়িতে এলেন, অথচ মধ্যাহ্ন ভোজন করলেন তোমাদের ওখানে এটা কিন্তু আমার কাছে ভাল লাগল না শরদিন্দু।

—তাতে কি হয়েছে? বলল নলিনী বসু। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আবার সে বলে, জলযোগ যা ক'রলাম তা আমার কাছে সমুদ্র যোগ বলেই মনে হ'ল। এই হারে যদি মধ্যাহ্ন-ভোজন হ'ত, তাহলে শরদিন্দুর কিছু না হলেও আমার পৈটিক গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল।

গম্ভীর চেহারার দারোগার মুখে সরস সংলাপ শুনে উচ্চ স্বরে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ প্রমথবাবু। বনশ্রীও আঁচল দিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করল। তনুশ্রী শুধু শরদিন্দুর দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে শুনিয়ে দিলে, সবই তাহলে যোগাযোগের ব্যাপার!

চঞ্চলা মেয়েটির কথার পুনরাবৃত্তির মতই আর একটি অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করে বসলেন প্রমথবাবু, মৎস্যরাজ যদি আজ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতেন, তাহলে আপনার এই মধুর বাচনভঙ্গীতে মুগ্ধ হওয়ার সুযোগ পেতাম না নিশ্চয়, কি বলেন? তার জন্য ধন্যবাদটা—!

—ধন্যবাদটা তো আপনারই প্রাপ্য। জবাব দিল নলিনী দারোগা।

হাস্য-পরিহাসচ্ছলে কথা বলতে বলতে বেশ কিছুটা সময় অতিক্রান্ত হতেই নলিনী বসু বন্ধুকে জানাল, তাকে বেশী রাত পর্যন্ত আটকে রাখলে

চলবে না। দশটার মধ্যেই ছেড়ে দিতে হবে। ঘড়িতে ছটা কিন্তু বেজে গেছে!

শরদিন্দুর বন্ধুর ব্যস্ততা দেখে প্রমথবাবু আক্ষেপ করতে লাগলেন, কোন কথাই তো হ'ল না। আর একদিন কিন্তু আসতে হবে। সেদিন আর শরদিন্দুদের বাড়িতে নয়, ভোজনটা এখানেই করা চাই। ভয় নেই ওজনের দিকে লক্ষ্য রাখব। বক্তব্য শেষ করে শিশুর মতন সরল মনে হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক।

নলিনী বসু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতেই তাকে থামিয়ে দিল শরদিন্দু। জানি তুমি কি বলবে! সময়ের অভাবের অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা এখানে চলবে না। আর একদিন না হয় লেফট্ ফর ইন্‌ভেস্টিগেসন্ ডায়েরীতে লিখে, ছিপ নিয়ে সোজা পুকুরে চলে আসবে। পরিচয় তো হয়েই গেল। ভাবনার কিছু নেই।

শরদিন্দুর যুক্তিপূর্ণ কথায় সবাই সায় দিয়ে বলল, কি ছোট্ট একটা মাছ ধরলেন? ওর চেয়ে অনেক বড় মাছ পুকুরে আছে।

—আচ্ছা, মাছের লোভ যখন দেখাচ্ছেন সবাই, তখন না হয় আর একদিন আসব।

তনুশ্রী কিন্তু এতক্ষণ কান পেতে সব শুনছিল। সকলের বক্তব্য শেষ হতেই সে বলে উঠল, অমেত্য এখনও ফিরল না কেন? ও আবার মাছটা নিয়ে সোজা থানায় চলে গেল না তো!

ঘরের বারান্দায় পা দিয়েই ছোড়দির উদ্বেগপূর্ণ কথা শুনে অমৃতলাল বলে উঠল, আজ্ঞে না। মাছ আমি মীতাদিদিব হাতে দিয়ে এলাম। তিনি দাদাবাবুব বন্ধুকে তাড়তাডি নিয়ে বাড়ি যেতে বলেছেন। দিদির মাঠাকুরুন আমাদের নেমন্তন্ন করতে লোক পাঠাচ্ছেন। রাতে সকলকে ওনাদের বাড়িতে খেতে যেতে হবে।

এতক্ষণ বনশ্রী ঠিক এই আশঙ্কাই করছিল। সে জানে নলিনীবাবু এখানে রয়েছেন, তা নাহ'লে কখন নেমন্তন্ন করতে মীতা এসে হাজির হ'ত। মাসকয়েক আগে সেই তাকে এই ভদ্রলোকের কথা বলেছিল। আজ তাঁকে দেখে বান্ধবীর গোপন মনের রহস্য কিছুটা অনুমান করে নিল। কিন্তু ভদ্রলোক—। হঠাৎ তার চিন্তাস্রোতে বাধা দিল শরদিন্দু।

সে বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি যাবার সময় বার বার বলে গেল, তনুশ্রী তোমরা তাড়াতাড়ি আসছ তাহলে? না-আমরা গিয়ে লোক পাঠিয়ে দেব?

: না-না লোক পাঠাতে হবে না। অমেত্যকে নিয়ে আমরা যাব। জ্যোৎস্না রাত কোন অসুবিধা হবে না। আসার সময় বরং—!

—আপনি এগিয়ে দেবেন। দিদির অসমাপ্ত কথাটা ফস করে বলে দিল তনুশ্রী। তারপর অপূর্ব এক নয়নভঙ্গীর পর, সে তাকাল বনশ্রীর দিকে। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কের ভাব প্রকাশ করে, হঠাৎ তাকে প্রশ্ন করতে শোনা গেল, হ্যাঁরে দিদি, সেদিন মীতুদি তোকে কি যেন একটা সংস্কৃত শ্লোক বলছিল?

: 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' শ্লোকটা আবৃত্তি করে শোনাল বনশ্রী।

—এর অর্থ কিরে দিদি? সবিনয়ে অনুরোধ জানায় তনুশ্রী।

: জানিনা যাঃ।। কৃত্রিম উষ্মার ভান দেখিয়ে দ্রুতবেগে বনশ্রী অন্য ঘরে চলে গেল।

দিদির রূপ ও রূপান্তর লক্ষ্য করে অতি চঞ্চলা তনুশ্রী, মুখ টিপে হেসে উঠতেই পাশের ঘর থেকে প্রমথবাবুর গলা শোনা গেল, অমেত্য! তুই ওদের নিয়ে মিত্তির বাড়ি যাবার আগে গরম জলের ব্যাগটা আমাকে দিয়ে যাস।

বনশ্রী, বাবার রাতের খাবার দুধ আর রুটীর বদলে আজ দুধ-খই আনতেই প্রমথবাবু সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা তুই আমার মনের কথা কি করে বুঝতে পারিস বলত? সকাল থেকেই আজ আমি ভাবছিলাম—।

: দুধ খই খাবেন! বাবার মনের ইচ্ছাটা বলেদিল বনশ্রী। তারপর হাসতে, হাসতে কিছুক্ষণ আগে আবৃত্তি করা সংস্কৃত শ্লোকটা শুনিয়ে সে বাবাকেই প্রশ্ন করে বসল, সত্যি মানুষ যা ভাবে—তাতে কি সিদ্ধিলাভ হয় বাবা?

—সাধনায় সিদ্ধিলাভ! এইতো হাতে হাতে তার প্রমাণ এবং ফলশ্রুতি।' কথাটা শেষ করেই মেয়ের মুখের দিকে তাকান প্রমথবাবু। সস্নেহে হাসেনও খানিকটা সময়।

গরম জলের ব্যাগটা অমৃতলাল এনে দিতেই প্রমথবাবু বনশ্রীকে বললেন, তোরা আর অযথা দেরী করিসনা। ওরা হয়ত আবার লোক পাঠাবে।

কর্তার কথা শুনে একটু খুশী মনেই এক গাল হেসে, অমৃতলাল দিদিমণিকে ইঙ্গিতে তৈরী হতে বলে ধীর পদক্ষেপে চলে গেল।

বনশ্রীদের বাড়ি থেকে ফিরতে তুই বন্ধুর বেশ কিছুটা সময় উত্রে গেল। নলিনী পথ হতেই বিদায় নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তাকে কিছুতেই ছাড়ল না বন্ধু শরদিন্দু। সে বেশ অনুযোগের সুরে বলতে লাগল, এত কষ্ট করে তুমি মাছটা ধরলে। সেই মাছ তুমি আমাদের দিয়ে চলে যাবে, এ' কেমনতর কথা? তাছাড়া শুনলেই ত মীতার তুই বান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করে এলাম। ওরা এসে তোমাকে না দেখলে কি মনে করবে বলত?

বন্ধুর অনুযোগভরা কথার কোন সদুত্তর দিতে পারল না নলিনী-বসু। শুধু ক্লান্ত কণ্ঠে তাকে বলতে শোনা গেল, যত তাড়াতাড়ি পার আমায় ছেড়ে দিও। কারণ থানায় আমার নাইট ডিউটি আছে।

নলিনীর কথায় তেমন গুরুত্ব দিল না শরদিন্দু. সে তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকেই বেশ চড়া গলায় হাঁক দিল, মীতা শীগ্‌গির এদিকে আয়। মাছ ধরতে এসে দারোগা মশাই কি কাণ্ড করে বসেছেন দেখে যা।

মীতা ছুটে এসে ঘরের দরজার পাশে দাঁড়াতেই তার দাদা তাকে শুনিয়ে বলতে লাগল, তোর বান্ধবীদের সঙ্গে আজ হয়ে গেল।

—কি হয়ে গেল? অত বড় মাছ ধরার জন্য মেসোমশাই রাগ করেছেন নাকি! অমেত্য মাছটা দিয়ে যেতেই আমি মাকে বললাম, ও মাছটা দিয়ে গেল কেন! নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে। দাদার আসতে এত দেরীই বা হচ্ছে কেন? দেখ দেখি কোন কাণ্ড বাধিয়ে এলে!

শরদিন্দু চোখ টিপে নলিনীকে কোন কথা বলতে বারণ করে দিল। বোনকে ক্ষ্যাপাবার জন্য অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলতে লাগল, ওরা এই রকম করবে—তা যদি আমি বুঝতে পারতাম, তাহলে তোমায় নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকতাম না। পুকুর ধার থেকেই চলে আসতাম। ওরা এই রকম করবে তা' আমি বুঝতে পারিনি ভাই নলিনী।

—ও মা! তোমরা মাছ ধরতে গিয়ে ওদের সঙ্গে—! দেখ কি কাণ্ড!

এবার গলাটাকে একটু বিকৃত করল শরদিন্দু. মীতাকে ধমক দিয়ে বলল, থাম বেশী চেঁচাসনি। আগে দু' কাপ চা করে আন দেখি। আর শোন, নলিনী সেই সাত সকালে চাট্টি খেয়ে গেছে। মাকে বল কিছু খাবার-টাবার করে দিতে। জানিসত ও আবার একটু ভাজাভুজি বেশী পছন্দ করে। পারিসত তুই তাড়াতাড়ি কিছু করে দেনা। আমারও বাপু ক্ষিদে পেয়েছে।

দাদার লম্বা বক্তৃতা শুনে মীতা বক্-বক্ করতে করতে চলে গেল। যাবার সময় শুধু বলে গেল, কি জানি তোমরা ওদের সঙ্গে কেন গোলমাল বাধালে!

নলিনী আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে বন্ধুর ক্ষিদে পাওয়ার কথা শুনে বলল, এইমাত্র প্রমথবাবুর বাড়িতে অত খেয়ে এলে! এইটুকু পথ হেটে আসতেই সব হজম হয়ে গেল?

ঃ তুমি একটু চুপ করে থাক, হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিও না। মীতার বান্ধবীরা না আসা পর্যন্ত ব্যাপারটা রহস্যাবৃত থাক। দেখ না কি মজাটা হয়।

অনেকক্ষণ ধুম পান করতে না পেরে নলিনী বসুর মেজাজটা বিগড়ে ছিল। শরদিন্দুর ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে উঠল, তুমি আচ্ছা ছেলেমানুষ দেখছি! বয়স হয়েছে তবু এখনও স্বভাবটা সেই আগের মতই রয়েছে?

ঃ তার মানে! বেশ ভারী গলায় জানতে চাইল শরদিন্দু।

বিদ্যুৎ বেগে বলতে লাগল নলিনী। ঠিক ছোটবেলায় মীতার সঙ্গে যেমন খুনসুটি করতে, এখনও দেখছি তাই কর!

ঃ তোমার নিজের বোন নেই তাই একথা বললে, থাকলে বলতে না। ছোট ভাই-বোনের সঙ্গে খুনসুটি করার যে কি আনন্দ, তার স্বাদ তুমি জীবনে পাওনি। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে—কাজেই এসব তোমার ভাল লাগবে না। মোদ্দা কথা এ' রসে বঞ্চিত তুমি যবন হরিদাস।

বন্ধুর কথা শুনে হেসে ফেলল নলিনী বসু। তারপর হাসতে হাসতেই বললে, আরে নিজের ছোট ভাই-বোন নেই তাতে কি হয়েছে! জ্যাঠতুত, খুড়তুতর অভাব—!

মাঝ-পথেই বাকরোধ করে দিয়ে শরদিন্দু বলল, আরে ভাই রেখে দাও তোমার জ্যাঠতুত, খুড়তুত—ভাই-বোন, মায়ের পেটের ভাই-বোনদের ছোটবেলার মধুর সম্পর্ক বড় হলেই আজকাল থাকে না। তার আবার জ্যাঠতুত, খুড়তুত! বলি, তোমার তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক এখন আছে?

—তা—অবশ্য—নেই। আমতা-আমতা করে জবাব দিতে হল নলিনীকে।

: ব্যস্, ও প্রসঙ্গ চেপে যাও। আপাততঃ মীতার একবার খোঁজ নিই। একটু কিছু খাবার তৈরী করতে যদি এত দেরী করে, তাহলে রাত্রে সকলকে খেতে দেবে কখন! বিরক্ত হয়ে এতগুলো কথা বলে গেল শরদিন্দু।

নলিনী বসু আবার সেই আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে, আরে বাবা! এইতো প্রমথবাবুর বাড়ি থেকে অত সব খেয়ে এলে! এরই মধ্যে খাওয়ার জন্য এত ছট্‌ফট্ করছ কেন?

: ও সব সাহেবী কায়দায় চেয়ার টেবিলে বসে খেলে আমার পেট ভরেনা। সারাদিন পর এখন প্রয়োজন স্রেফ বাঙলা খাবারের, বুঝলে? আমি বাঙালী, তোমার মত সাহেবী কায়দার অনুরাগী নই।

—বাঙলা খাবার মানে? সকৌতুক প্রশ্ন নলিনীর বাল্যবন্ধুর কাছে।

: এখনই তার নমুনা দেখতে পাবে। সেই নমুনা পাওয়ার জন্যই তো বাড়িতে এসে মীতাকে তাতিয়ে দিলাম। কিন্তু এত দেরী হচ্ছে কেন বুঝতে পারছিনা। বস আমি একবার তদন্ত করে আসি।

শরদিন্দুর বাড়ির মধ্যে তদন্তে যাওয়ার আর দরকার হ'লনা। বাঙলা খাবারই মীতা নিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রল। দু'জনের জন্য বড় দু' বাটি আম তেল আর মশলা দিয়ে মাখা গরম মুড়ি। তার সঙ্গে গরম গরম পিঁয়াজের মুখরোচক বড়া। মুড়ির সাথে তেলে ভাজা পেয়ে শরদিন্দু খুব উৎফুল্ল হয়ে বললে, এই না হ'লে আমাদের পোষায়? তা না কয়েকখানা ফুলকো লুচি আর বেগুন ভাজা—আলুর দম! তাও যদি না পাত পেড়ে বসে খেতাম।

—তোমার সঙ্গে ওদের যেমন হৃদ্যতা লক্ষ্য ক'রলাম, তাতে অনায়াসে পাত পেড়ে বসে খাওয়ার কথা তুমি বলতে পারতে। ওরাও নিশ্চয়ই

খুশী হয়ে সেই ব্যবস্থা করে দিত। বক্তব্য শেষ হতেই বাঁকা হাসির রেখা হঠাৎ ঝিলিক মেরে গেল দারোগা সাহেবের ওষ্ঠদ্বয়ের ফাঁকে।

শরদিন্দুর ঘরের একপাশে রেডিওটা বাজছিল। দুই বন্ধুর ঘরোয়া আলোচনার মাঝখানে ওটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে মনে হতেই, মীতা ঝপ্ করে রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। ওর যাবার ভঙ্গী দেখে শরদিন্দু আবার হাঁক ছাড়ল, এই আমাদের চা দিবিনা?

কর্মব্যস্ত মীতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আগে মুড়ি খাও তারপর চা দিচ্ছি। এখন দিলে সে চা তো সরবৎ হয়ে যাবে! নিজের বাচন ও কণ্ঠস্বর ভঙ্গী শুনে মীতা মনে মনে বেশ লজ্জিত হ'ল। সে ভাবল দাদার বন্ধু কিছু—! নাঃ কি আর ভাববেন। উনি তো আমাকে ভাল রকমই চেনেন। ছোটবেলা থেকে দেখেও আসছেন। তাছাড়া আমাকে উনি খুব—!

মীতার বিদ্যুৎ বেগে ঘর থেকে চলে যাওয়াটা কেমন যেন লাগল নলিনী বসুর। সে ভাবল, মেয়েরা এত তাড়াতাড়ি রূপ বদলায়? সেদিনের মীতু! আজ তার দেহের ও মনের কত রূপান্তর ঘটেছে। আশ্চর্য! চোখে মুখের ভাবও আগের মতন নেই। ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে ওদের মধ্যে কি—! সহসা তার চিন্তায় বাক্যাঘাত করে বসল শরদিন্দু। সে বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলে চলল, কি ব্যাপার নলিনী, হঠাৎ চুপ করে বসে ভাবছ কী? ওরা কিন্তু এখনই এসে পড়বে। নাও মুড়িটা খেয়ে ফেল। মীতা চা আনতে গেছে।

মুড়ির বাটিটা শরদিন্দুর দিকে এগিয়ে দিয়ে নলিনী জবাব দিল, আমি খেয়েছি। বাকিটা তুমি খেয়ে ফেল। তোমার তো ক্ষিদে পেয়েছে বলছিলে?

বন্ধুর মন্তব্যে হাসতে লাগল শরদিন্দু। সে বিনাদ্বিধায় নলিনীর এগিয়ে দেওয়া বাটি থেকে একগাল মুড়ি মুখে দিয়ে বলল, দেখ ভাই আমার একটা বদঅভ্যাস আছে। বাড়ির বাইরে কোথাও খেয়ে আমার মন উঠেনা। যেখানে যাই সেখান থেকে ফিরে এসেই আমাকে আবার বাড়িতে কিছু না কিছু খেতে হয়। অর্থাৎ লুচি-টুচি খাওয়া আমার ধাতে সহ্য হয় না। মিষ্টিতো পছন্দই করিনা। আমার কাছে সব চাইতে প্রিয় হচ্ছে মায়ের তৈরী বাঙলা খাবার।

চায়ের পেয়ালা দুটো টেবিলের উপর রেখে মীতা দাদাকে শুধাল, বাঙলা খাবার, বাঙলা খাবার কি যেন বলছিলে তুমি ?

: বলছিলাম-আমার সবচাইতে প্রিয়, মায়ের তৈরী বাঙলা খাবার। যেমন সুক্তো, থোর-চচ্চড়ি, ডুমুরের ডালনা। পলতার বড়া আর কুমড়োর কিংবা লাউশাকের ডাল। লাউ চিংড়ি, শোল মুলো, মাছের টক। হ্যাঁরে, আমি আর কি ভালবাসি বলত মীতা ?

—কেন আলুপোস্ত, মোচার ঘন্ট। খুব হালকা জবাব দেয় মীতা।

শরদিন্দুর প্রিয় খাদ্য তালিকার খেই হারিয়ে যাওয়া মাত্র উচ্চ কণ্ঠে নলিনী হাসতে লাগল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সে শ্লেষ ভরা কণ্ঠে বলল, আসলে তুমি কি ভালবাস, তা' নিজেই জাননা। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, তাও বোঝনা। অর্থাৎ—!

: থামলে কেন ? বলে যাও।

—বোকা পঁচিশ বলে একটা কথা আছে জান? জাননা! তবে শোন। ঐ বয়স পার না হলে ছেলেদের ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা জন্মায় না। তোমার বয়স কত হল বল তো ?

: এবার ছাব্বিশ হবে। উত্তর দিল শরদিন্দু।

—তাহলে তুমি আর কি ভালবাস, মীতাকে জিজ্ঞেস করছ কেন ? যা' বলবে ভেবে চিন্তে বল। আর শোন, লুচি-আলুর দম সাহেবী খাবার নয়। বিশুদ্ধ বাঙলা খাবার। কেন পাকা ফলারের গল্প জাননা! বামুনরা পাকা ফলারের নিমন্ত্রণ পেলে—।

: তুমি তো ভাই কুলীন কায়েত। বামুনদের মতন অত পাকা ফলার প্রীতি তোমার কেন ?

—কুলীন বংশ প্রীতি নেই বলে।

শরদিন্দু ও নলিনীর কথা মীতার কেন যেন ভাল লাগল না। সে দু' জনের আলোচনার মাঝ থেকে চলে গেল। যাওয়ার সময় শুধু বলে গেল, দাদা, মা একবার তোমায় ডেকেছে।

বন্ধু ঘর থেকে চলে যেতেই নলিনী, হাত-ঘড়িটা দেখে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। সে থানায় ফিরে যাওয়ার কথাই বোধ হয় চিন্তা করছিল। কারণ রাত দশটার পর তার ডিউটি। তার পক্ষে আর বেশীক্ষণ বাইরে থাকা ঠিক

হবে না। থানার বড়বাবু ও মেজবাবু দু'জনেই সারাদিন বাইরে। একলা ছোটবাবু থানার ঝামেলা হয়ত সামলাতে পারবে না। তার উপর যদি কোন অফিসার আকস্মিক এসে উপস্থিত হয়, তাহলে মুস্কিল হতে পারে। অবশ্য সার্কেল ইন্‌স্পেকটার এবং সাবডিভিশনাল পুলিশ অফিসার দু'জনেই হেড-কোয়ার্টারে উপস্থিত আছেন। তাঁরা থাকতে নলিনী বসুর কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তাছাড়া সে ডায়েরীতে মফঃস্বলে তদন্তে যাওয়ার কথা লিখেও রেখে এসেছে। তবু তাকে কিছুটা ভাবতে হয়। দিনকাল ভাল নয়। চারদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা লেগেই আছে। কখন কোথায় কি যে গোলমাল বাধবে—তার ঠিক নেই!

কিছুই ঠিক নেই সত্যি কথা। তরুণ দারোগা নলিনী বসুর দশ বছরের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাও তাই বলে। তথাপি তাকে অবচেতন মনের পুঞ্জীভূত নানা প্রশ্ন উত্যক্ত করে। সাধারণ মানুষের মতন কখনও কখনও প্রশাসনের বিরূপ সমালোচনা মুখ দিয়ে তার বেরিয়েও যায়, কারণ সে এই সমাজেরই একজন সাধারণ মানুষ। সামাজিক ন্যায়-অন্যায় সুখ ও দুঃখের অনুভূতি আছে বলেই ত মাঝে-মাঝে সে কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যায়। সমাজবিপ্লবের প্রতিচ্ছবির পীড়ন ক্ষনিকের জন্য ভুলতে চেষ্টা করে। সেই অবকাশে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ-কাতর জীবনকে উপভোগ করতে চায়। চাওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ চাওয়া আর পাওয়ার আকাঙ্খা মানবজীবনের চিরন্তন প্রবৃত্তি। তাতে শ্রেণীবিভাগ নেই। নেই কোন উচ্চ নীচ ভেদাভেদ। মানব-জীবনের বিবর্তনের ইতিহাস যাই বলুক না কেন, প্রবৃত্তির তাড়নায় নর ও নারী উভয়েই চলে। তার ব্যতিক্রম—!

হঠাৎ নলিনীর চিন্তাস্রোতে বাধা দিল মীতা। সে অতি-সুপরিচিত নারী-সুলভ ভঙ্গীমায় ঘরের মধ্যে এসে শয়দিন্দুর টেবিলে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা রাখতেই চমক্ ভাঙ্গল তরুণ দারোগার। গন্ধে উৎফুল্ল হয়ে তাকে বলতে শোনা গেল, বাঃ ভারী চমৎকার ফুলগুলো তো! এই অসময়ে কোথায় পেলে এতো সুন্দর রজনীগন্ধা?

দাদার বাল্যবন্ধুর অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে মীতার অবচেতন মন কিঞ্চিৎ পুলোকিত হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ সে একবার কাজল-পরা নয়নের কটাক্ষ হেনে মুখ টিপে হাসল। যৌবন-সৌন্দর্যে বিকশিত দেহ ও মনের গোপন

ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্যই বোধ হয় তির্যক ভাষায় তাকে বলতে শোনা গেল, যে বাড়িতে মেয়ে দেখে এলেন, তাঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নলিনী, মীতার বাক্যবানের প্রত্যুত্তর দেবার আগেই সে আবার দ্বিতীয় বাক্যবান বর্ষণ করল, কোনটি পছন্দ হ'ল? বড়টি, না ছোটটি। দুটিই কিন্তু সুন্দরী, আর আপনার সঙ্গে—। এই পর্যন্ত বলেই ঠিক আগের মতই মুখ টিপে হাসতে লাগল মেয়েটি, অর্থাৎ বন্ধুর ভগিনী।

—মেয়ে দেখে এলাম! শরদিন্দু তোমাদের তাই এসে বলেছে নাকি! আশ্চর্য! ওতো দেখছি সাংঘাতিক ছেলে। মীতার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আকাশ থেকে পড়ার মতই ভাব ফুটে উঠল নলিনী বসুর মুখমণ্ডলে। স্বচ্ছ দৃষ্টিতেও তারই বহিঃপ্রকাশ। শুধু কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল যৌবন গর্বিতার মুখের তৃতীয় উক্তিটি শোনার আশায়।

নলিনীর নীরবতার সুযোগ নিয়েই এবার মীতা মুখর হয়ে উঠে। তার বিস্ময়ভরা চোখের উপর দৃষ্টি রেখে নির্ভয়ে বলে—দাদা আবার কি বলবে। আমি যেন কচি খুকী, কিছু বুঝিনা! মাছ ধরতে আসার নাম করে, চুপি-চুপি মেয়ে দেখা! অন্য কোথাও—! আর কথা এল না মীতার কণ্ঠে, রক্তিম হয়ে উঠল সারা মুখখানি। চঞ্চল আঁখি দুটিতে সহসা অভিমানের আভাস স্পষ্ট ফুটে উঠল। অন্তরের অন্তস্তলে মৃদু কম্পন তাকে আরও বিচলিত করে তুলতেই নিজেকে সামলাবার জন্যই সে বিদ্যুৎ গতিতে চলে গেল অন্য ঘরে।

আকস্মিক ঘটে যাওয়া ব্যাপারটায় বেশ হক্‌চকিয়ে গেল নলিনী বসু। কারণ এ' রকম একটা পরিস্থিতির মোকাবিলা আজ তাকে করতে হবে, এর জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাছাড়া মীতা যে এই ভাবে তাকে আক্রমণ করবে, এও ছিল তার কাছে কল্পনার অতীত। তাই মনের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল তরুণ দারোগার। মূক হয়ে বসে রইল সে কয়েক লহমা। মীতার কোমল হাতে সাজিয়ে রেখে যাওয়া রজনীগন্ধার গুচ্ছ দুটির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভাবতে লাগল আকাশ-পাতাল। বার-বার তার মন তোলপাড় করে যে প্রশ্ন উদয় হতে লাগল তা হচ্ছে, এমন অঘটন ঘটাও কি সম্ভব!

সম্ভব-অসম্ভবের কথা না হয় নলিনী বসু নাই ভাবল। মীতার সামান্য

ঐ কথা দুটি যে তার মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে, তা সে ভাবতেই পারছে না। তাই তাকে এখন এর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ফেলে আসা দিনগুলির দিকে একবার ফিরে তাকাতে হ'ল।

অতীত স্মৃতি-চারণ করতে গিয়ে নলিনী বসুর চোখের সামনে ভেসে উঠল এক চঞ্চলা কিশোরীর প্রতিচ্ছবি। যাকে সে প্রায়ই টিক্‌টিকি এবং আরসোলা দেখালেই ছুটে পালাত। আজ সেই চপলা কিশোরী অপরূপা তরুণী! কত আর বয়স হয়েছে মীতার! খুব বেশী হলে কুড়ি। তবু সে নলিনীর চাইতে বেশ কয়েক বছরের ছোট। তবে কি কৈশোর জীবনে তাদের সেই মেলামেশারই এটা প্রতিক্রিয়া, না অন্য কিছু—! নারীর মন ও চরিত্র সম্বন্ধে তার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে, রহস্যাবৃত বলে সমস্ত ব্যাপারটাকেই ধরে নিতে হল নলিনীকে।

অনেক চেষ্টা করেও রহস্যের সূত্র খুঁজে পেল না নলিনী দারোগা। মানসিক দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে থাকে ওর তথ্যানুসন্ধানী মন। একটার পর একটা ঘটনা রহস্য সন্ধানের পটভূমি সৃষ্টি করার অপেক্ষায় উঁকি দিয়ে যায় গহন মনের অতি নিভৃত আঙ্গিনায়। ক্রমশঃ নানা প্রশ্ন অন্তরকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। কারণ শরদিন্দুর সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্যই তাকে এই পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে হয়েছে। বন্ধুর অনুপস্থিতিতে বেশ কয়েকবার এই বাড়িতে তাকে আসতেও হয়েছে। কিন্তু কোনদিন তো মীতাকে দেখে—! না কোন রকম দুর্বলতা সে অনুভব করেনি হৃদয়ে। দিনের পর দিন স্বাভাবিক ভাবে তার সঙ্গে কথাবার্তাও বলে গেছে। তবে কেন আজ মীতার এহেন ভাবান্তর? আর ভাবতে পারে না বিস্ময়াহত তরুণ দারোগা। ক্লান্তি বিনোদনের নেশায় আবার সিগারেট ধরায় সে।

শরদিন্দুকে খুব হালকা মেজাজে বাড়ির ভিতর থেকে ঘুরে আসতে দেখে, একটু সরস সংলাপের সদ্‌ব্যবহার করতে চেষ্টা করল নলিনী, কি হে, রাত যে অনেক হতে চলল! তোমাদের মেমসাহেবরা কোথায়?

বন্ধুর মুখে আবার সেই ধরণের প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গেল শরদিন্দু। তারপর কি ভেবে যেন হেসে উঠল সে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তাকে পাল্টা প্রশ্ন করতে শোনা গেল, তুমি ফের বেয়ারা ধরনের ঐ প্রশ্নটা করলে

কেন বলত? আমাদের মেমসাহেব মানে! জানই ত ভাই, মনে প্রাণে এবং পোষাকে-পরিচ্ছদে আমি একজন খাঁটি বাঙালী। বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে অত্যন্ত ভালবাসি! সুতরাং আমাদের ঘরে কোন মেমসাহেব আসবে না। একান্তই যদি কেউ আসে তাহলে সে হবে আদর্শ বাঙালী বধূ। বুঝলে?

—বুঝেছি বলেই ত প্রশ্নটা করলাম। কারণ একটু আগে তুমি বলে গেলে না? বাঙলার খাবার তোমার সব চাইতে প্রিয়! বাঙালীর পোষাক-পরিচ্ছদ-ব্যবহার করে নিজেকে খাঁটি বাঙালী মনে কর।

অবশিষ্ট সিগারেটের টুক্‌রোটা জানলার ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নলিনী বসু। তারপর এক রকম ব্যঙ্গের হাসির রেশ টানতে-টানতেই সে আবার বলল, আজকালকার আধুনিকারা রন্ধন-বিজ্ঞান দেখে নাকি রান্না করেন। তাঁরা চপ, কাটলেট, মাছের ফ্রাই, ভেজিটেবল রাইস্ ইত্যাদি মুখরোচক খাদ্যবস্তু তৈরী করতেই শুনেছি পটু। তাই বলে কি দরিদ্র বাঙালীর খাবার পোস্ত কিংবা ডালের বড়া ভাজতে জানেন! মোচা, কচু শাকের ঘণ্ট, আর থোর-চচ্চরির কথা শুনলে বোধ হয় হেসে গড়াগড়িই যাবেন। গাঁদাল পাতা, থানকুনির ঝোল তাঁদেব কাছে হয়ত আকাশ কুসুম। শোল-মুলো, লাউচিংরির স্বাদ তাঁরা জানেন কিনা সন্দেহ! পিঠে-পায়েসের কথা না বলাই বোধ হয় ভাল। কি বল?

অনেকগুলো অপ্রিয় সত্য কথা শুনে শরদিন্দু জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। মীতার দিকে তাকাতেই সে দাদার হয়ে জবাবটা দিয়ে দিল, বাঙালী মেমসাহেবরা চেষ্টা করলে সব রকম রান্নাই করতে পারে। কিন্তু সাহেবরাই যে আজকাল নতুন নতুন রান্না পছন্দ করেন। তাই ত বাঙালী মেয়েরা এখন দিন দিন আধুনিকা হয়ে উঠছে! সেই রকম চাল-চলন শিখছে।

মীতাকে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কথাকটা বলতে দেখে অবাক হয়ে গেল নলিনী বসু। তার রূপ ও রূপান্তর লক্ষ্য করে কিছুটা উত্তেজিত কণ্ঠে আক্রমনাত্মক ভঙ্গীতে বলতে লাগল, তোমাদের ঐ বাঙালী, মুখে রং মাখা উগ্র আধুনিকাদের নিয়েই ত যত রাজ্যের ফ্যাসাদ। ওঁরা জাতীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করার বদলে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অনুকরণ করছেন।

তাঁদের আহার-বিহার, আচার-আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ দেখলে মনে হয় বাঙলার জাতীয় সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। আমরা দিন দিন যেমন দেউলিয়া হয়েই যাচ্ছি।

প্রখ্যাত দারোগা নলিনী বসুর মুখে সমাজ-তত্ত্বের কথা শুনে, তার বাল্য-বন্ধু শরদিন্দু মিত্র অবাক না হলেও অবাক হয়ে গেল পাশের ঘরে উপবিষ্টা শিক্ষিতা মেয়ে বনশ্রী। সে তার প্রিয় বান্ধবী মীতাকে উদ্দেশ্য করেই একটু শান্ত গলায় বললে, আজকাল থানার দারোগারাও সমাজের কথা চিন্তা করেন। শুধু চোর-ডাকাতই ঠ্যাঙ্গান না ?

কথাটা শরদিন্দুর কানে যেতেই সে বন্ধুকে ইসারা করে জানাল, পাশের ঘরে ওরা এসে গেছে। এবার মা-কিন্তু আমাদের খেতে ডাকবেন।

সন্ধ্যাগতা মীতার বান্ধবীদের আগমন বার্তা দক্ষিণা বাতাসই বহন করে এনেছিল শরদিন্দুর ঘরে। অতি সুগন্ধী স্নো প্রসাধনের সুবাস—তীব্র ঘ্রাণশক্তি সম্পন্ন নলিনী দারোগা পেয়ে, স্বভাবসুলভ ভাবে বলে উঠল, আমরা চোর, ডাকাত ঠ্যাঙ্গারে হলেও এই সমাজেরই মানুষ। সমাজের নানা সমস্যার ধকল আমদের উপর দিয়েও বয়ে যায়। সুতরাং সমাজের কথা একটু আধটু চিন্তা করতে হয় বৈকি। তাছাড়া প্রগতিশীল সমাজ এবং তার বিপ্লবের ঢেউ সর্বপ্রথম থানার লোকদেরই সামলাতে হয়।

কথা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে দেখে, বনশ্রী চুপ করে গেল।

সকলে খেতে বসে গল্পের পর গল্প বলতে এবং শুনতে গিয়ে রাত ক্রমশঃ আপন গতিতে কখন যে দশটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তা' বুঝতে পারেননি মীতার-মা। তাই তিনি নলিনীকে বললেন, তোমার ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল বোধ হয় ?

—তা' একটু হল বটে। শরদিন্দু যে বড্ড দেরী করিয়ে দিলে।

: দেরী হয়ে গেল বলে কোন অসুবিধায় পড়তে হবে না তো বাবা ! জিজ্ঞাসা করলেন মীতার-মা।

—অসুবিধায় পড়লে তা' সামলে নিতে হবে মাসিমা। কি'আর করব বলুন। এমন চাকরী নিয়েছি যে, লোক-লৌকিকতা রক্ষা করার উপায় নেই আমার।

মীতা সবলকে পান দিতে এসে নলিনীর সাথে তার দৃষ্টি বিনিময় হতেই

মুখখানা ইচ্ছা করেই সে বোধহয় ঘুরিয়ে নিল। বান্ধবীর নতুন ছন্দের কবরী রচনা, সুরুচি সম্পন্ন অঙ্গ সজ্জার উদ্দেশ্য অনুমান করে, বনশ্রী আচমকা মীতাকে একবার চিমটি কাটল। তারপর দু'জনের ওষ্ঠে বিদ্যুতের মতন পলকে হাসির রেখা ঝিলিক দিয়ে গেল।

নিজের সাইকেল খানা নিয়ে নলিনী বসু চলে যেতেই—অমেত্য, বনশ্রীদের তাগিদ দিল, এবার বাড়ি যাবে না দিদিমনি? দশটা যে বেজে গেল!

॥ তিন ॥

বড় বাবুকে থানায় ঢুকতে দেখে ডিউটি অফিসার সত্যেন বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, স্যার আপনি এসে গেছেন ?

—কেন নতুন কোন কেস এসেছে নাকি ! মেজবাবু এখন পর্যন্ত ফেরেননি ?

: না স্যার। মেজবাবু এখনও আসেননি। এই কেসটার ডায়েরী লেখার জন্য অপেক্ষা করছি। আগে আপনাকে ইন্ করে নেব, না— ডায়েরীটা লিখে নিয়ে পরে আপনাকে—?

—কি কেস ? ডায়েরী করাতে যাঁরা এসেছেন, আমার কাছে তাঁদের পাঠিয়ে দিন। আমি কেসটা দেখছি। সুবেদার সাহেব কিংবা হাবিলদারকে একবার ডেকে পাঠান।

ডায়েরী বইটা দিতে এসে সত্যেনবাবু হাসতে-হাসতে বড়বাবুকে বললেন, জামাই, শ্বশুরের টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। প্রতারক আর কি।

—তাই নাকি ! ৪২০ এর কেস তাহলে ?

: হ্যাঁ স্যার। ভারী মজার ঘটনা। মানুষ যে এখনও কত অজ্ঞ, আর আহম্মক হতে পারে, সেই কাহিনী শুনুন। প্রতারণার পদ্ধতিটা কিন্তু নতুন। রসিকলাল কৈ, এদিকে এস।

—কি হয়েছে ? জামাই টাকা নিয়ে পালাল কেন ! তার বাড়ি কোথায় ? বিয়েতে দেনা-পাওনা নিয়ে গোলমাল হয়েছিল নিশ্চয়ই !

: আজ্ঞে না হুজুর। উত্তর দেয় রসিকলাল।

—তাহলে জামাই এই কুকর্ম করতে গেল কেন ?

: কি জানি বাবু, মেয়েটাকে বোকা পেয়ে ঠকিয়ে গেল। সরলার মাকে আমি পই পই করে বলেছিলাম, আবার কেনে মেয়েটার বিয়ে দিচ্ছিস্ ! একবার বিয়ে দিয়ে তোর আক্কেল হয়নি। বেশ তো ইট ভাঁটায় কাজ করে দিন চালাচ্ছে। ঘরের মেয়ে ঘরেই না হয় থাকুক। তারপর যদি ওর মন চায়— !

রসিকলালের কথায় বাধা দিল বড়বাবু। গম্ভীর মেজাজে জানতে চাইল, মেয়ের বয়স কত ?

: কুড়ি-বাইশ হবে। বাবুদের ইট ভঁাটায় কাজ করে।

—আরে বাবা বয়স দুটো হয় না, কুড়ি না বাইশ ঠিক করে বল।

: আমাদের ছোট জেতের বয়সের হিসেব কি ঠিক থাকে দারোগা-বাবু। সেই বানের বছর জন্মেছে। এখন আপনি একটা আন্দাজ করে নিন।

—বয়স আন্দাজ করে নেব! তা' না হয় নিলাম। মেয়ের প্রথম কোথায় বিয়ে দিয়েছিলে ? সে জামাই ওকে নিয়ে ঘর করল না কেন ?

: সে জামাইর কথা আর শুধোবেন না বাবু। যেমন মাতাল, তেমনি বদমায়েস। বিয়ে করে বউকে গঞ্জনা দিত। খেতে দিত না, মারধোর করত। অন্য মেয়ে মানুষের কাছে যেত। মেয়ের লাঞ্ছনা সইতে না পেরে তাকে বাড়ি নিয়ে এলাম। সেই থেকে সরলা আমার কাছেই আছে, খাটে খায়। তাতে আমারও উপকার হয়।

—বেশতো, ফের মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে কেন ? দিব্বি খেটে দু'পয়সা আনছিল— !

: আজ্ঞে আমিও তো সেই কথা ওর মাকে বলেছিলাম। আমার বাক্যি সে কানেই তুললে না। বললে, মেয়ের সোমত্ত বয়স। স্বাদ-আহ্লাদ আছে। ছেলেটাকে মনে যখন ধরেছে তখন আর দেরী করা কেনে, কালীতলায় গিয়ে নোয়া-সিঁদুর পরিয়ে আনি। বারণ করলাম, শুনলে না। ঘর-জামাই রাখলে। দু'জনায় ইট-ভঁাটায় মাসখানেক কাজও করলে।

—তারপর ? রসিকলালকে শুধায় নলিনী দারোগা।

দারোগা বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার কেঁদে ফেলল রসিকলাল। কাঁদতে-কাঁদতেই সে বলে গেল, গত হাটের দিন বকনা বাছুর দুটো বেচে তিনশো টাকা পেয়েছিলাম বাবু। ঘরখানা বর্ষার আগে বাগাবো বলে টাকাটা ঘরে রেখে দিয়েছিলাম। মেয়েটা তার মাকে বললে, ইট ভঁাটার কাজ এ হপ্তায় বন্ধ হয়ে যাবে। তোমার জামাই বলছে—ঐ টাকাটা দাও চালের ব্যবসা করি। বর্ষার আগে আসল টাকা ফেরৎ দেবে। মা-মেয়েতে যুক্তি করে জামাইকে চালের ব্যবসা করতে টাকা দিয়ে দিলে।

আমাকে ঘুনাক্ষরে জানালেও না। জামাই সেই যে টাকা নিয়ে চাল আনতে গেছে, আর আজ পর্যন্ত ফিরল না। আমার সর্বনাশ হয়ে গেল দারোগাবাবু। ও ব্যাটা পালিয়েছে, তিনদিন হয়ে গেল। শালা আর আসবে না। আমার টাকাটা উদ্ধার করে দিন বাবু। গরীব মানুষ নইলে মরে যাব।

রেগে ধমক দিয়ে উঠল বড়বাবু। যেমন আহাম্মক তোমরা, অচেনা—অজানা লোককে ঘরজামাই করতে গেলে কেন? এখন থানায় এসে কাঁদলে তোমার টাকা উদ্ধার হবে? যাও তার খোঁজ কর। বাড়ি ঘরের হদিস পেলে আমাকে এসে খবর দিও। ব্যবস্থা করব।

হতাশ হয়ে গেল রসিকলাল। সে ভেবেছিল থানায় এসে এজাহার দিলেই দারোগা বাবুরা তার টাকাটা উদ্ধার করে দিতে পারবে। এখন সে বড় বাবুর কথা শুনে কপাল চাপরাতে লাগল।

—কপাল চাপরালে কোন ফল হবে না হে, টাকা উদ্ধার করতে হলে তার নাম-ধামের হদিস চাই। নইলে তাকে আমরা ধরব কেমন করে, বুঝলে? খুব সহৃদয়তার সঙ্গেই নলিনী দারোগা ব্যাপারটা রসিককে বুঝিয়ে দিল।

হাজতের আসামীদের খাবার আনিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে, সত্যেনবাবু বড় বাবুকে এসে বললেন, স্যার, আজ আমি আপনার নাইট ডিউটিটা দিয়ে দিচ্ছি। কাল আপনি—!

—কেন—কাল আপনার কি আছে?

: কাল স্যার, আমার শালীর বিয়ে। বিকেলের দিকে একবার ক'লকাতায় যেতে হবে। রাতে আর ফিরতে পারব না। পরশু এসে ডিউটি ক'রব।

—শালীর বিয়ে! বিকেলে যাবেন কি মশাই? সকালেই যাবেন। আমি না হয় থানায় থাকব।

: সকালে আপনি থাকবেন কি করে! কাল তো কোর্টে সাক্ষী আছে আপনার।

—ওঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই সুরুচির কাল মামলার দিন। ভাল, মনে করিয়ে দিলেন। আমার খেয়ালই ছিল না। কাল খুব ভোরেই হয়ত বীরেশবাবু

এসে হাজির হবেন। ওঁর কেসটা সম্পর্কে ভীষণ উৎসাহ। চার্জসীট দেবার জন্য অনুরোধও করে গেছলেন। যত্ত সব শুকনো ঝামেলা।

: কেসটায় ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়েছেন না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব ভোগাস ব্যাপার। অযথা ভদ্রলোকের ছেলেটাকে হাজত খাটালে। আমি তো ওকে জামীন দিতেই চেয়েছিলাম। বীরেশ-বাবু, এস ডি. ও.র কাছে দরবার করে কেসটা জটিল করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারল না। ফাইন্যাল রিপোর্ট দিয়েছি শুনে, বীরেশবাবু আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। তা'হলে আর কি ক'রব। ওকে সন্তুষ্ট করতে হ'লে—!

সুবেদার সাহেব অভিবাদন করে সামনে এসে দাঁড়াতেই, নলিনী বসু অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। সে তখন কনষ্টবলদের কাকে কোথায় ডিউটিতে পাঠান হয়েছে তার খোঁজ খবর নিতে নিতে বলল, চাঁপাতলা ফাঁড়িকে বলে দিন তারা তিনজন চেক পোস্টে যাবে। আজ স্পেশাল চেকিং আছে, আপনিও একবার গেলে ভাল হয়।

স্পেশাল চেকিং-এর কথা শুনে সুবেদার সাহেব জানালেন, তিনি নিজেই রাত্রে চেক পোস্টে হাজির থাকবেন। দরকার হয় হাবিলদারকেও সঙ্গে নেবেন। কারণ মাল বোঝাই লরি ড্রাইভাররা ভীষণ গোলমাল করে।

—গোলমাল তো ড্রাইভাররা করবেই। গাড়ি কাঁটায় তোলা, পারমিট দেখান, লাইসেন্স চেক করাতেই ওদের যত আপত্তি। ওদিকে স্থানীয় লোকেরা অভিযোগ করছেন, চেক পোষ্টে না-না কেলেঙ্কারী চলছে। কাঁটা না করেই নাকি লরি ছেড়ে দেওয়া হয়। ব্যাপারটা বড় সাহেবের কানেও গেছে। তাঁর অর্ডারেই আজ থেকে স্পেসাল ডিউটিতে ডি. এস. পি. একজন থাকবেন। সুবেদার সাহেব, আপনি গিয়ে সব দেখে এসে আমাকে রিপোর্ট দেবেন। আমিও একবার রাউণ্ডে কাল যাব।

বড় বাবুর মুখে চেকপোষ্টের কার্যকলাপের সমালোচনা শুনে সুবেদার-সাহেব কোন উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন না। কারণ ঘটনার বিবরণ তাঁর অজানা নয়। থুতু উপরে ছুঁড়লে নিজের মুখে এসে পড়ে, তাই তিনি নীরবে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন।

থানার কাজে বিরক্ত হয়ে উঠেছে নলিনী দারোগা, এর চাইতে আই.

বি.-তে থাকাই তার পক্ষে ভাল ছিল এ রকম ঝামেলা সেখানে ছিল না। কেন যে তাকে থানায় বদলী করা হ'ল, আজ পর্যন্ত তা সে বুঝতেই পারল না। অথচ নলিনী বসুর মত দক্ষ অফিসার সেখানে বোধ হয় খুব কমই আছে। কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য বছর কয়েক আগে ভদ্রলোককে রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতি এবং এই থানার অফিসার-ইন্‌চার্জ্জ করে বদলী।

উচ্চপদস্থ অফিসাররাই অবশ্য নলিনীকে সীমান্ত থানায় আনিয়েছেন। তাঁদের ধারনা গোয়েন্দা বিভাগের সুদক্ষ একজন অফিসার এখানে না দিলে আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা যাবে না। কারণ বাঙলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের পর দু'দেশের সরকার সীমান্ত ব্যবসা নিয়ে যে কথাবার্তা চালাচ্ছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ও বাঙলা দেশ সীমান্তে চোরাকারবারীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য থানা পুলিশের দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই কারণে গুরুত্বপূর্ণ থানা গুলিতে দায়িত্বশীল তরুণ অফিসারদের অন্য বিভাগ থেকে বদলী করিয়ে আনা হয়েছে।

সহকর্মীদের মুখে উপর মহলের মন্তব্য শুনে নলিনী বসু ভাবে এতদিনে সাহেবদের চৈতন্যোদয় হয়েছে। কিন্তু—! নাঃ ভেবে লাভ নেই। বদলীর চাকরী যখন, তখন যেখানে দেবে সেখানেই যেতে হবে। তবে থানার কাজ এবং তার আঁট-ঘাট বুঝতে-বুঝতেই হয়ত তাকে আবার অন্য— !

থানার পেটা-ঘড়িতে রাত বারোটা বাজল।

সত্যেন বাবু নৈশ ভোজন সেরে এসে বললেন, স্যার আপনি তাহলে, বাসায় যান। দয়াল ঠাকুর দু'বার আপনার খোঁজ করে গেছে।

নিশুতি রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে থেমে-থেমে, দূর হতে হঠাৎ থানার পেটা ঘড়ির আওয়াজ কানে আসতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল প্রমথ বাবুর। বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের, তাই ঘুমও পাত্‌লা হয়ে গেছে। তার উপর যদি কোন রকম চিন্তা একটু বেশী করেন, তাহলে ঘুম আর হয় না। সারাটা রাত একরকম অনিদ্রায় কাটান। মেয়েরা এসে রাগারাগি করে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেয়। প্রয়োজন হ'লে গা ও মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে কিনা জানতে চায়। শরীর খারাপ বুঝলে, বাবার কাছে বসে তারাও রাত

জেগে কাটায়। আজ কিন্তু সে রকম কিছু ঘটেনি। তবে নলিনী বসুকে দেখে তাঁর মনের মধ্যে সেই বিকেল থেকেই চিন্তাটা কেবলই ঘুর পাক্ দিচ্ছে, যেমন অন্যান্য বিবাহযোগ্যা মেয়ের বাপ-মায়ের মনে হামেশাই ঘুর পাক্ দেয়।

নাঃ শরদিন্দুর বন্ধুটিকে খুব ভালই লেগেছে প্রমথবাবুর। চমৎকার ছেলে, যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমনি সুন্দর কথাবার্তা। বিদ্যা-বুদ্ধি দুই আছে। চাকরীতে এ' লাইনে উন্নতিও আছে। এমন পাত্র পেলে তিনি সানন্দে— !

ঠিক এই কথাই চিন্তা করছিলেন মীতার মা। তাঁর মেয়েও যে ওকে পছন্দ করে, এটাও বুঝতে পেরেছেন তিনি। কিন্তু নলিনী কি তাঁদের প্রস্তাবে রাজি হবে! শরদিন্দুর কথাবার্তায় মনে হয় ও নাকি বিয়ে করতেই চায় না। কি জানি বাপু, আজকালকার ছেলে-মেয়েদের মতি-গতি বুঝি না। মনে মনেই কথা ক'টা আওড়ান ভদ্রমহিলা।

দাদার বন্ধুকে বাজাতে গিয়ে মীতা, যে কথাগুলো বলেছিল—তার প্রতিক্রিয়া সামলাতে মেয়েটাকে সারারাত এলোমেলো অনেক অবাস্তব চিন্তাই করতে হয়েছে। তবু মীতার মনের দ্বন্দ্ব কাটেনি। দেখতে-দেখতে রাত ভোর হয়ে গেছে।

আজ আবার সেই ঘটনা!

মেজবাবুর স্ত্রীর উত্তেজিত কণ্ঠের আওয়াজে নলিনী বসুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিরক্ত হয়ে দয়ালকে সে বলল, জানলাটা বন্ধ করে দাও। ভদ্র-মহিলার চেঁচামেচির ঠ্যালায় কার সাধ্য এখানে ঘুমোয়! কেন যে উনি এমন করেন বুঝি না!

স্ত্রীর অহেতুক উত্তেজিত হওয়ার কারণ বুঝতে পারেন না থানার মেজ দারোগা নরেন দত্ত। তিনি অতি শান্ত ভাবে বলেন, এই সাত সকালে কেন অযথা গলাবাজি ক'রছ? বড়বাবু বাসায় বোধ হয় ঘুমচ্ছেন।

বড় বাবুর দোহাই দিয়ে ব্যাপারটা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা ক'রনা। আগে তুমি আমার কথার জবাব দাও, কেন পরশু বাড়ি ফিরলে না। তদন্তে যাওয়ার নাম করে কোথায় গিয়ে রাত কাটাও? ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না! মাইনে পেয়ে এদিকে ওদিকে প্রায় সব টাকা উড়িয়ে দাও।

আর আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে উপবাস করে মরি! আজই আমি বড়বাবুকে বলে এর বিহিত ক'রব। সংসারের এই অশান্তি আমি আর সহ্য করতে পারব না। তোমার ছেলে-মেয়ে নিয়ে তুমি থাক। আমার দু' চোখ যেদিকে যায়, সে দিকে চলে যাই। আর কোন কথা বলতে পারল না, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মহিলা।

সংসারের অশান্তিতে জর্জরিত নরেন দত্ত। মানসিক রোগগ্রস্ত স্ত্রীকে নিয়েই তিনি সর্বদা ব্যতিব্যস্ত। তার জন্য অনেক সময় তাঁকে সহকর্মীদের কাছে অপদস্থও হ'তে হয়। বাড়ির ঝি-চাকররা পর্যন্ত মনীবকে নিয়ে নানা মহলে কুকথা বলে, যার ফলে অল্পদিনের মধ্যে বেচারাকে সবার কাছেই মাথা হেঁট করে চলতে হয়। এমনকি থানার সিপাইরাও মেজবাবুর সম্পর্কে কখনও কখনও অবাঞ্ছিত কথা নেপথ্যে বলে বেড়ায়। কিন্তু কি করবেন তিনি। সবই অম্লান বদনে সহ্য করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

সেদিন নতুন মেজবাবুকে পারিবারিক অশান্তির কথা জিজ্ঞাসা করতেই বড়বাবুর কাছে চোখের জল ফেলছিলেন নরেনবাবু। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু একটা কথা বললেন, সবই অদৃষ্ট বড়বাবু। সবই অদৃষ্ট।

—অদৃষ্ট আপনি মানেন?

: আগে মানতাম না। এখন মানি। জীবনে এমন বিপর্যয় ঘটবে এ' যদি বুঝতাম, তাহলে সংসারের মায়াজালে নিজেকে জড়াতাম না, আপনার মত শান্তিতে জীবনটা কাটিয়ে দিতাম। বিয়ে না করে খুব ভাল কাজ করেছেন। বেশ আছেন আপনি। সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে দেখে আমার হিংসা হয়।

নরেন দত্তর কথা শুনে দুঃখের হাসি ফুটে উঠল নলিনী বসুর চোখে মুখে। সমবেদনার সুরে সে বলে, ক'লকাতায় আমায় এক ডাক্তার বন্ধু আছেন। তিনি মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ। যদি বলেন, তাঁকে আমি চিঠি লিখে দিতে পারি। স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর কাছে একবার গিয়ে দেখতে পারেন। শুনেছি ভদ্রলোকের চিকিৎসায় অনেকে আরোগ্য লাভ করেছেন।

: অনেক বড় বড় ডাক্তারকে দেখিয়েছি বড়বাবু। টাকাও প্রচুর খরচ করেছি। কিছুদিন ভাল থাকে তারপর আবার যে কে সেই।

আসলে আমার কপাল খারাপ। নইলে এমন হবে কেন! নিজে দেখে শুনে বিয়ে করলাম। বাপ-মা আমাকে—!

—থামলেন কেন? কি বলছিলেন বলুন। অন্যের জীবন-কাহিনী শুনতে আমার খুব ভাললাগে।

: আমার দুঃখের কথা বলতে আরম্ভ করলে এখন শেষ হবে না বড়বাবু। আপনাকে আবার কোর্টে আজ সাক্ষী দিতে যেতে হবে। সময় নেই থাক, আর একদিন না হয় শুনবেন। অবসর মত আমি নিজেই আপনাকে সব ব'লব।

॥ চার ॥

চলমান জীবনের প্রতিটি দিন যে, কখন কি ভাবে কেটে যায় তার হিসাব রাখতে হিমসিম খায় মানুষ। সুখ, দুঃখ, ব্যথা-বেদনা যাঁদের নিত্য সঙ্গী, তাঁদের কাছে দিনলিপির হয়ত কোন মূল্য নেই। তবু জীবনে এমন অনেক দিন আসে, যার স্মৃতিটুকু চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে ব্যক্তি বিশেষের মনে। কখনও সেই স্মৃতি কথা তাঁদের হৃদয়কে আনন্দ স্রোতে অবগাহন করিয়ে শান্তি দেয়। কখনও অশান্তির দাবানলে দগ্ধে মারে। ক্ষত-বিক্ষত করে, অন্তরের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করিয়ে শুধু লোক চক্ষুর অন্তরালে বেদনাশ্রু ঝরায়। তা সত্বেও মানুষ হাসে। সেই হাসির নেপথ্যে যাই লুকিয়ে থাকনা কেন, অন্তত: জীবনের একটা দিন তাঁরা নাস্তিক হলেও ধর্ম ভীরু হন। ঈশ্বরের কাছে দীর্ঘজীবন কামনা করে পুষ্পার্ঘ দেন। প্রণাম জানান জগৎ ঈশ্বরকে। প্রণাম করেন জননীকে। তাঁর আশীর্বাদ জন্মদিনের শ্রেষ্ঠও অমূল্য সম্পদ। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

মীতাকে কথা কটি বলেছিলেন বনশ্রীর জন্মদিনে প্রমথবাবু। বৃদ্ধের বলিষ্ঠ কণ্ঠের আবেগ জড়িত সেই কথাগুলি আজ বার বার মীতার মনে পড়ছে। কারণ কাল তারও জন্মদিন।

কাল সকাল থেকেই সে খুব ব্যস্ত থাকবে। ঠাকুরমার সঙ্গে গাঁয়ের পঞ্চাননতলায় গিয়ে পূজা দিয়ে আসতে হবে। তারপর বাড়িতে রয়েছে নানা মাংগলিক অনুষ্ঠান। অবশ্য সবই নিছক ঘরোয়া ব্যাপার এবং আড়ম্বরহীন। যেমনটা প্রতি বছর হয়।

বিকেলে দাদার ঘর থেকে খবরের কাগজটা নিয়ে যাচ্ছিল মীতা। তাকে সামনে পেয়ে খেয়াল বশতই প্রশ্নটা করল শরদিন্দু, হ্যাঁরে! তোর বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করেছিস?

দাদার এ'হেন প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করে মীতা বলে, কি ব্যাপার বলত?

এবার হঠাৎ আমার জন্মদিনে বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করতে বলছ কেন? ওদের দেখাদেখি খুব ঘটা করে জন্মদিন পালন করবে নাকি!

শরদিন্দু বেশ মেজাজের মাথায় উত্তর দিলে, কারুর দেখাদেখি আমি কিছু করতে চাই না। তবে আজ সকালে কি ভাবছিলাম জানিস? তোর জন্মদিনে এবার যখন বাড়িতেই আছি তখন—!

—একটা কিছু করি এই তো? অর্থাৎ লাউ গড় দিয়ে কুমড়ো কাটার আনন্দ উপভোগ করি! তা—বেশতো তুমি যদি বল এবং মাকে বলে সব কিছুর ব্যবস্থা করতে পার, তাহলে কাল ভোরে আমি যখন ফুল আনতে যাব তখনই ওদের নিমন্ত্রণ করে আসতে পারি।

: তাতো না হয় পারিস বুঝলাম। কিন্তু শুধু ওদের নিমন্ত্রণ করলে মা, কিছু মনে করবে না তো?

—তা আমি কি জানি। তবে যদি বেশী বাড়া-বাড়ি কর, তাহলে মা কিন্তু রাগ করতে পারেন। কারণ—!

: মুস্কিল, কি করা যায় বল দেখি? চট্ করে একটা বুদ্ধি বাত্‌লে দেনা। যাতে সাপও মরে—আবার লাঠিও না ভাঙ্গে।

মীতা-দাদার বিনয় সুলভ মন্তব্যের জবাবে কৃত্রিম উষ্মা প্রকাশ করে বলে, মনে যদি সাধই থাকে, তা'হলে অত ভয় কেন? মা তো আর তোমাকে ত্যাজ্য পুত্র করবেন না!

শরদিন্দু কথার মোড় ঘোরাতে চেষ্টা করল। সে ছোট বোনকে মৃদু তিরস্কারের অছিলায় বলতে লাগল, তোকে একটা বুদ্ধি বাত্‌লাতে বলছি আর তুই কিনা—!

: আমার অত প্যাঁচাল বুদ্ধি নেই। তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। বক্তব্যটা শেষ করে বেশ অভিমান ভরেই মীতা দাদার ঘর থেকে চলে গেল।

—এই শোন মীতা। শুনে যা—আ, যাঃ বাবা! মেয়ে রাগ করে চলেই গেল! যাক্‌গে। ভেবেছিলাম এবার যখন বাড়িতে রয়েছি, তখন ওর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান ক'রব। আমার বন্ধু নলিনী, আর ওর বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াব। তা' বোধ হয় হবে না। আমার কি! আর কদিনই বা ছুটি আছে। দেখতে-দেখতেই দিন কটা ফুরিয়ে যাবে; তারপর যথা পূর্বম্ তথা পরম্। আবার সেই মেস্ আর

অফিস। অফিস আর মেস্। এক ঘেয়ে ঠাকুরের রান্না,-পোড় বড়ি খাড়া-খাড়া বড়ি থোড়! একটু ভাল-মন্দ খাওয়া যেত। দিলে না তার ব্যবস্থা করতে। নাঃ যাই একবার নলিনীর ওখান থেকেই ঘুরে আসি। দেখি দারোগামশাই কি বলেন।

ছেলেকে জামা-কাপড় পরতে দেখে মা, সুমিত্রা দেবী শরদিন্দুকে শুধালেন, হ্যাঁরে, এই অসময়ে কোথায় যাচ্ছিস্?

—যাচ্ছি একবার নলিনীর ওখানে। সামনের সপ্তাহে চলে যাব। যাওয়ার আগে ওর সঙ্গে দেখা না করে গেলে খুব অসন্তুষ্ট হবে। তাই বেরুচ্ছি, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরব। কেন তুমি কিছু বলবে?

: তা তো ফিরবি। শুনলাম, নলিনী নাকি আমাদের থানা থেকে বদলি হয়ে যাচ্ছে?

—ও বদলি হয়ে যাচ্ছে! কই সেদিন আমাকে তো কিছু বলেনি। হঠাৎ—!

শরদিন্দুর কথা শেষ না হতেই সুমিত্রা দেবী বলতে লাগলেন, সেদিন ছেলেটা তাড়াহুড়োর মধ্যে কি যে খেয়ে গেল, ভালভাবে লক্ষ্য করতেও পারিনি। মীতা তো তার বান্ধবীদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল। নলিনী এখান থেকে চলে যাবে, আর একদিন যদি একটু ভাল করে খাওয়াতে পারতাম!

মায়ের অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় তাঁর কথাতেই শুধু নয়। সারা মুখ-মণ্ডলেও তারই অভিব্যক্তি দেখে থমকে দাঁড়াল শরদিন্দু। মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটাকে বুঝতে পেরে, দক্ষ অভিনেতার মতই বলে চলল, নলিনীকে আর একদিন খাওয়ানোর ইচ্ছা আমারও ছিল। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে কি জান, ওকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ করলেই বলবে, যেতে পারলে খুশী হতাম। দেখছিস তো ভাই আমার অবস্থা! কখন যাই বলত! নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের আবার কোথাও যাওয়ার উপায় আছে?

আয়নার সামনে নিজেকে একবার দেখে নিয়ে শরদিন্দু, পূর্বের উক্তির জের টেনে বলে যায়, নলিনী কতক্ষণ থানায় থাকে! তদন্তর কাজে বাইরে বাইরেই বেশী ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যার আগে একবার থানায় আসে! তাছাড়া মেজাজ খারাপ থাকলে ওকে কিছু বলাও যায় না।

আগের মতই স্নেহের সুরে সুমিত্রা দেবী বলেন, ওর কাছেই যাচ্ছিস্

যখন, তখন একবার আমার কথা বলে দেখিস্। যদি সময় করে কাল রাত্রে আসতে পারে তাহলে খুব ভাল হয়। মীতুর জন্মদিন শুনলে হয়ত আসতে রাজী হতেও পারে। প্রমথবাবু কাল অমেত্যকে দিয়ে মাছ আর দুধ পাঠাবেন জানিয়েছেন। ঘরোয়া ব্যাপার, তা' হোক। এক সঙ্গে ওদের সকলকে চাট্টি ডাল ভাত— !

মায়ের মুখের কথাটা একরকম থামিয়ে দিয়ে শরদিন্দু গড় গড় করে বলে চলল, তোমার শরীরটা যে ভাল নয়, যতই ঘরোয়া ব্যাপার বলনা কেন, অত ঝামেলা কাল তুমি সামলাতে পারবে ?

: ঝামেলার কি আছে ! মীতুর জন্মদিনে বরাবর যা করা হয়, তাই করব। ঐ দিয়েই ওদের খাইয়ে দেব। নলিনী আমাদের ঘরের ছেলের মতন। ওর জন্য বিশেষ কিছু করতে হবে না। তুই শুধু মোহনের দোকান থেকে একটু দই-মিষ্টি এনে দিবি, আর কিছু লাগবে না।

সুমিত্রাদেবীর প্রস্তাব মেনে নিতে এরপর শরদিন্দুর আর কোন আপত্তি রইল না। কারণ সে অনেকক্ষণ পূর্বেই বুঝতে পেরেছে—মাতৃদেবীর এই সদইচ্ছার অন্তরালে স্নেহধন্যা মীতুর অবদান অপরিসীম। তা' নাহলে তার মনের বাসনা এত তাড়াতাড়ি সফল হ'ত না। নাঃ মীতার সত্যিই খুব বুদ্ধি আছে। ও দেখছি নলিনী দারোগার চাইতে কোন অংশে কম যায় না !

মীতার অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করতে, করতে শরদিন্দু সাইকেলখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অনেকটা পথ তাকে সাইকেল ঠ্যাঙ্গাতে হবে। কারণ থানায় যাওয়ার আগে হাটতলায় মোহনের দোকানে দই-মিষ্টির কথা বলে আসতে হবে। হাটতলা থেকে থানা সে প্রায় মাইল দেড়েকের পথ ! গরুর গাড়ি চলার ফলে এখন রাস্তার যা অবস্থা হয়ে আছে, তা না বলাই ভাল। কথায় বলে, হাটুরে গাড়ি আর হাটবারের পথ। দু'য়ের একই রকম চেহারা। হাটের মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম।

একচালে কিস্তি মাৎ এর আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল মীতা। সে চটপট্ হাতের কাজগুলো সেরে নিতে লাগল। তাকে কাল ভোরেই বনশ্রীদের বাড়ি যেতে হবে। কেননা তার সারাদিন থাকবে নানান কাজের চাপ ! মীতাকে কাছে পেলে বনশ্রী সহজে ছাড়তে চায় না। ওরা কি যে

অত আলোচনা করে তা' একমাত্র ভগবানই জানেন। কথার পর কথা! ওদের প্রাণের কথা যেন আর শেষ হয়না। মাঝে মাঝে তনুশ্রীও দুই বান্ধবীর কাণ্ড কারখানা দেখে অবাক হয়ে যায়! মেয়েদের মন, তাই সে বোধহয় মুখে কিছু না বললেও মনে মনে—!

মাথার চুল বাঁধা গুছিটা বাঁধতে-বাঁধতে মীতা এক রকম ঠিক করে নিল। নাঃ কাল সে বেশীক্ষণ বনশ্রীদের বাড়িতে থাকবে না। নিমন্ত্রণটা করে পুজোর ফুল নিয়েই চলে আসবে। নইলে বুড়ি ঠাকুরমা রেগে যাবেন। তিনি আবার বেলা হয়ে গেলে পঞ্চানন তলায় পুজো দিতে যেতে চানন। বলেন, মাথার উপর সূর্যি গেলে আবার কেউ পুজো দিতে যায় নাকি! পুজো-পার্বন মধ্যাহ্নকৃত্য নয়। বিশেষ করে বাবা পঞ্চানন ঠাকুরের।

শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল স্তরের লোকই বলে জাগ্রত দেবতা তাদের গাঁয়ের পঞ্চানন ঠাকুর। ওঁর অসীম মাহাত্ম্য। লৌকিক দেবতা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরা এ সম্পর্কে নানাতথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মাহাত্ম্য কথা প্রচার করছেন। কেউ কেউ এখনও পঞ্চাননের মূর্তি ও মন্দির নিয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই হয়ত তাঁরা এর প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার করে ফেলবেন। তার ফলে জানতে পারা যাবে এই অজ্ঞাত-অখ্যাত গ্রামটির কিছুটা অতীত ও বর্তমান পরিচয়।

এখন অতীতের দিকে তাকালে অনেক কথা মনে উদয় হয় বৃদ্ধ প্রমথবাবুর। তিনি পিছনের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে অনেক সময় একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন পূর্ব দিগন্তে। যেদিকে আজও সূর্য ঠিক আগের মতন উঠে। দূরের গ্রামগুলো অবশ্য আগের মতন তাদের নিজস্ব সীমানায় পঁচিশ বছরের ইতিহাস বক্ষে ধারণ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও সম্প্রতি নয়, কয়েক বছর আগেই মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে অনেকটা তার রূপান্তর ঘটিয়েছে। তেমনি রূপান্তর লক্ষ্য করছেন, দুই বাঙলার সীমান্তের কাছে অবস্থিত ছোট্ট তাঁদের গ্রামটির। পিছনে বিরাট প্রান্তর—তারপর সারি সারি সীমান্তের পাকা স্তম্ভের নিশানা। যার দু'দিকেই রয়েছে সতর্ক প্রহরী। অতন্দ্র তাঁদের দৃষ্টি। সর্বদা সচেতন তাঁরা।

শুধু এপার আর ওপার!

অতি সামান্য ব্যবধান মীতা এবং বনশ্রীদের বাড়ির। ওদের দু' বাড়ির মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে সুবর্ণরেখা। এটা এখন নামেই শুধু নদী, আসলে সেটা দেখতে একটা কাটা খালের মতন। লোকে বলে, এক সময় এই সুবর্ণরেখাই নাকি খরস্রোতা ছিল। তখন কত বড় বড় মালবাহী নৌকো দু' দেশের মধ্যে যাতায়াত করত। মাইল কয়েক জলপথ অতিক্রম করলেই যশোহর জেলার শেষ সীমানা, তারপরই ঝিকরগাছার হাট। এর মাঝখানেই দু' দেশের মনুষ্যবিহীন প্রান্তর। বন জঙ্গল আরও কি কি।

নাভারণ ছিল প্রমথবাবুদের আদি পৈত্রিক বাড়ি। জনশ্রুতি সামাজিক অত্যাচারে গ্রামে তিষ্ঠোতে না পেরে একদা তাঁদের এখানে চলে আসতে হয়েছিল। সেটা বহুকাল আগের কথা। দু' বাড়ির মাঝের পাকা সেতুটি দুই পরিবারের পূর্ব পুরুষদের অর্থেই নাকি তৈরী। তাই সেতুটাকে মিত্র আর দত্ত বাড়ির মিত্রতার স্মৃতিচিহ্নও বলা চলে। সেই মিত্রতার বন্ধন আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে এপারের মীতা আর ওপারের বনশ্রী। কিন্তু— !

নাঃ এর মধ্যে এখনই কিন্তুর জবাব খুঁজে লাভ নেই। বর্তমানে সুবর্ণরেখা মজা নদী। এটা ইছামতীর শাখা নদী। মূল বা শাখা নদীর ইদানীং কোন স্রোত দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং মিত্র ও দত্ত বাড়ির মাঝখানে অবস্থিত সেতুটি যতই পুরাতন হোক না কেন দু'-চার বছরে সেটা বোধহয় ভেঙ্গে পড়বে না। সুতরাং ওদের দুই বান্ধবীর মিত্রতারও বন্ধন হয়ত ছিন্ন হবে না। যদি ইতিমধ্যে কোন অঘটন না ঘটে!

পরদিন ভোরে ফুল তুলতে এসে সেই কথাটাই বেশ রসিয়ে-রসিয়ে মীতা, বনশ্রীকে বলল, জানিস বিয়ের পাকা দেখার সময় দু'পক্ষের পুরোহিতরা কি বলেন? তাঁরা বেশ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন, অমুকের পুত্র অমুক, এবং অমুকের কন্যা অমুকের সঙ্গে প্রজাপতির নিরবন্ধ থাকলে, আগামী অত তারিখ, শুভলগ্নে বিবাহ কার্য সমাধা হবে। যদি দৈবাৎ কোন— ! আর কথাটা শেষ করতে দিল না বনশ্রী। সে খুব জোরে একটা চিমটি কাটতেই-মীতা, উঃ বলে পালিয়ে গেলেও, চোখে-মুখে তার ফুটে উঠল— যৌবনের অপূর্ব এক আকর্ষণীয় মূর্ছনা। যার অভিব্যক্তি ও অনুভূতি, একমাত্র অনাস্বাদিত হৃদয়েই সম্ভব। ভাষার ব্যঞ্জনায় তাকে প্রকাশ করা যায় না।

ওপার থেকে এপার আসার পূর্ব-মুহূর্তে সেতুটার উপর দাঁড়িয়ে মীতাকে উচ্চ কণ্ঠে বলতে শোনা গেল, "বনশ্রী আমরা কিন্তু তোদের অপেক্ষায় বসে থাকব। তোদের পুকুরের মাছ আগে তোর পাতে না দিয়ে অন্য কারও পাতে দেওয়া যাবে না, মানে তুই পাকস্পর্শ করবি! কাজে-কাজেই— !

বান্ধবীর চটুল চাহনি আর তীক্ষ্ণ মন্তব্যের জবাব দেওয়ার জন্য বনশ্রী কোমরে কাপড়ের আঁচলটা জড়িয়ে ছুটে আসতেই মীতা এপারে পালিয়ে এল।

ওপার থেকেই বনশ্রী চেঁচিয়ে বলে উঠল, হাতের নাগালের বাইরে গিয়ে বেঁচে গেলি। নইলে— ! আচ্ছা ফের কাছে পেলে এর উল্টো কথাটা শুনিয়ে দেব। বুঝলি— !

—আমাকে নতুন কথা কি আর শোনাবি বল ?

: আহাঃ—তুই ভেবেছিস্ কি! তোর নতুন খবর আমি সব জানি। গোপন খবরও— !

দূর থেকে মীতা বান্ধবীকে বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা নেড়ে দেখিয়ে হাসতে-হাসতে চলে গেল।

কাছেই হঠাৎ শোনা গেল এক ফেরিওয়ালার বিকৃত কণ্ঠস্বর চা-ই সায়া ব্লা-উ-জ। বেগমপুরী, শা-ড়ী-ই। চাই ভাল, কা-প-ড়। ভা-ল, ভা-ল, ব্লা-উ-জ।

এত সকালে হঠাৎ ফেরিওয়ালার হাঁক শুনে একবার থমকে দাঁড়াল মীতা। পিছন ফিরে তাকাল ও সে! সুদর্শন যুবক ফেরিওয়ালাকে দেখে বুকের উপর আঁচলটা একটু টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

গরজের রথ ঝড়ের বেগের চাইতেও নাকি দ্রুত চলে! প্রবাদ বাক্যটা যে কতখানি সত্যি তা' বাড়িতে ঢুকেই মীতা বুঝতে পারল। তাই সে দাদাকে সাত সকালে মায়ের সঙ্গে রান্না-বান্নার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেখে মোটেই বিস্মিতা হ'ল না। তবে ভাত হবে, না লুচি হবে, এ' বিষয়ে তার মন্তব্যটা ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কথাটা বেশ ঝাঁঝালো গলায় সে বলল, অতই যখন আয়োজন হচ্ছে, তখন সাদা ভাত না করে-ঘি ভাত করলে কেমন হয়, মা? ডালডার লুচির চাইতে ঘি ভাত অনেক ভাল, নারে দাদা ?

ছোট বোনের মন্তব্য শুনে শরদিন্দু কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠে, শুনলে মা, শুনলে তোমার আদুরে মেয়ের কথা! নাও মেয়ের বান্ধবীদের জন্য এখন ঘি ভাতের ব্যবস্থা কর।

মীতা এবার দাদার দুর্বলতার সুযোগটা বেশ ভাল ভাবেই গ্রহণ করে। সে নীচু গলায় শরদিন্দুর উদ্দেশ্যে বলে, 'শুধু ঘি-ভাত কেন! এখন যদি আমি তোমাকে মাংস-পোলাও করতে বলি, তাহলে তারও ব্যবস্থা তুমি করবে। মানে হঠাৎ—! এইটুকু বলেই মীতা আড় চোখে তাকাল দাদার দিকে। তারপর খুনসুটি মেয়ের মতন মুখভঙ্গী করে পালাল অন্য ঘরে।

তৎক্ষণাৎ খেঁকিয়ে উঠে শরদিন্দু বললে, তুই যে আমায় অতকথা শোনাচ্ছিস্, তোর কোন আব্দারটা কবে রক্ষা করিনি বল?

ঘরের মধ্যে এক চক্কর ঘুরে এসে মীতা জবাব দিল, আমিও সেই কথাই বলছি। আজ আমার জন্মদিন। কাজেই তোমার কাছে যা চাইব, তাই মঞ্জুর হবে। এমন কি সঙ্গে সঙ্গে তা পেয়েও যেতে পারি। কি তাই না? মুখের কথাকটা শেষ হতেই মীতার চোখে-মুখে এক ঝলক দুষ্টু হাসির রেখা ফুটে উঠল। কণ্ঠস্বরেও এসে গেল অস্বাভাবিক পরিবর্তন। সে শুধু ভাব-ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিতে চাইল, এক মাঘেই শীত যায় না। আরও মাঘ আসবে।

শরদিন্দু বোকা নয়। সে পরিষ্কার বুঝে নিল—মীতা আজ কেন এত বেপরোয়া হয়ে, বার-বার তাকে আক্রমণ করছে। তবু স্নেহ এমনই জিনিস যার জন্য বেচারা ছোটবোনের বাক্যবানের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করেও নীরবে কেবল মুখ টিপে হাসছে। এই মধুর হাসির মধ্যে রয়েছে বড় ভাইর ছোট বোনের প্রতি অফুরন্ত স্নেহ-বর্ষাস্নাত সবুজ বনানীর সৌন্দর্যের মতই প্রকৃতি-জাত তার সুন্দর রূপ। সেই স্নেহধন্যা মীতার অভিমান ভরা মুখখানি দেখলে কে না বলবে, সত্যিই সে অপরূপা!

যে যাই বলুক, মীতার কিন্তু মুখে সেই একই রব। অর্থাৎ ভবি-ভুলবার নয়। দাদাকে সে ছেড়ে কথা কইছে না, সুযোগ যেমন করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি তার পার্বণীটাও সুদে-আসলে আদায় করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

মীতাকে একটু জব্দ করার জন্যই শরদিন্দু এবার প্রসঙ্গ বদলের চেষ্টায়, মাকে সাক্ষী মেনে কি যেন বলতে যায়। দাদাকে ছাপিয়ে সেও মাকে সাক্ষী দাঁড় করায়।

দুই ভাই-বোনের অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগ শুনে সুমিত্রা দেবী উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, আচ্ছা তোরা কি এখনও ছোটবেলার মতন খুনসুটি করবি। আমাকে কোন কাজ করতে দিবি না! বেলা কত হয়ে গেল তা তোদের দু'জনের খেয়াল আছে? সুমিত্রাদেবী আর অপেক্ষা না করে নিজের কাজে চলে গেলেন।

ব্যস্ আর যায় কোথায়! মায়ের বকুনির সূত্র ধরেই শরদিন্দু তখন বোনকে ধমক লাগায়, আচ্ছা মীতু, তোকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে ছিলাম, সেগুলো করেছিস?

মীতাও মওকা বুঝে, ঝগড়াটে মেয়েদের মতন চোখ-মুখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে খুব মেজাজের মাথায় ঝড়ের বেগে বলে গেল, করেছি গো করেছি। তোমার দেওয়া দায়িত্ব সব অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছি। তার জন্য আমাকে চিমটিও খেয়ে আসতে হয়েছে। উঃ এখনও হাতে ব্যথা রয়েছে। মেয়ে নয় যেন দস্যি। আসুক না আমিও মজা দেখাব।

পাশের ঘরে পুজোর চন্দন ঘষছিলেন ঠাকুরমা। তিনি নাতনির কথাগুলো শুনে জানতে চাইলেন, কাকে মজা দেখাবি? কার সঙ্গে আবার গোলমাল বাঁধালিরে!

ভাই-বোনের আলোচনা ঠাকুরমা শুনতে পাবেন এটা বুঝতে পারেনি মীতা। তাই পাশের ঘর থেকে তিনি প্রশ্ন করতেই জিব্ কেটে চুপ করে যায় দু'জনে। তারপর গলার স্বর আমূল বদলে মীতাই উত্তর দিলে, এই দেখনা ঠাকুরমা—তোমার কেষ্টার কাণ্ড! ওকে সেই ভোরবেলায় পই পই করে বলেদিলাম, আজ আমার জন্মদিন। পঞ্চাননতলায় পুজো দিতে যাব। চাট্টি ভাল দেখে নিখুঁত বেলপাতা, আর কয়েকটা ধুতরো ও আকন্দ ফুল এনে দিবি। তা' বাবুর এখন পর্যন্ত পাত্তা নেই! আজ আসুক না কেষ্টা মজা দেখাব।

—হতভাগার কাজই ঐ রকম। নাতনির অনেকগুলো কথার উত্তরে, ঠাকুরমা এই একটি কথাই বললেন।

মীতার অপূর্ব অভিনয়ের ক্ষমতা দেখে শরদিন্দু অবাক হয়ে গেল। দাদার কাছে পাছে নিজে ধরা পড়ে যায়, সেই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি কাজের অজুহাতে তার দৃষ্টিপথের আড়ালে সরে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

—মীতু, ও মীতু। সাড়া না পেয়ে ঠাকুরমা শুধান নাতিকে, হ্যাঁরে মেয়েটা কোথায় গেল? স্নান কখন করবে। এদিকে আমার পুজোর যোগাড় যে সব হয়ে গেল। ও এলেই তো আমরা মন্দিরে যেতে পারি। কেষ্টা এখনও বেলপাতা নিয়ে ফিরল না। তুই না হয় একবার ওর খোঁজ কর।

এত শান্ত মেজাজে বুড়ি, শরদিন্দুর সঙ্গে আলাপ করবে—তা সে আশা করেনি। কারণ এবার ছুটিতে আসার পর থেকেই তার, ঠাকুরমার সাথে বেশ কয়েকবার মন কষাকষি হয়ে গেছে। বিশেষ করে বুড়ির কু-সংস্কারপূর্ণ কথাবার্তার প্রতিবাদ করার ফলেই নাতির উপর খড়্গ-হস্ত হয়েছেন তিনি। নাতনির জন্মদিন উপলক্ষ্যে বোধহয় সেই খিটখিটে মেজাজটা এখন শান্ত আছে।

বুড়িকে শান্ত রাখার জন্যই শরদিন্দু খুব উচ্চ কণ্ঠে হাঁক ছাড়ল, কেষ্টা। এ—ই—কে—ষ্টা—আ।

এক বোঝা বেলপাতা আর ধুত্‌রো-আকন্দ ফুল নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সামনে উপস্থিত হতেই, শরদিন্দু ধমক দিয়ে উঠল, এতক্ষণ লাগে কি, ফুল-বেলপাতা আনতে?

: ধুত্‌রো ফুলের গাছ এ' তল্লাটে নাই। সেই—কবরেজ বাড়ির পুকুর ধার থেকে আনতে হ'ল। তাই যেতে আসতে সময় লাগবে না? কবরেজ বাড়ি হেথায় নাকি?

মিথ্যা কথা বলেনি কেষ্ট। শ্রীশ কবিরাজের বাড়ি তাদের ছাঁচতলায় নয়। অনেকটা দূরে, মিত্তিরদের বড় ভুঁই পেরিয়ে তবে সেখানে যাওয়া যায়। সুতরাং অযথা তাকে বকাবকি করে লাভ নেই। মীতা স্নান সেরে এসে ঠাকুরমাকে সেই কথাই বলল। তার উত্তরে ব্যস্ত হয়ে ঠাকুরমা বলেন, নে—বাপু, এখন তাড়াতাড়ি চল। পুজোটা সকাল সকাল দিয়ে আসি। বাড়িতে এসে আবার অনেক কাজ করতে হবে তোকে, নইলে তোর মা একলা সব সামলাতে পারবে কেন!

সারাদিন মিত্তির বাড়িতে একটা হালকা খুশীর হাওয়া বইছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই সে হাওয়া ক্রমশঃ হ্রাস পেতে লাগল। গোটা বাড়িটায় দেখা দিল কল্পনায় বোনা এক মায়া জালের সুন্দর আস্তরণ, মা ও মেয়ের

স্বপ্ন বাস্তব রূপায়ণের আকুল আবেদন। কারণ বসন-ভূষণে, অঙ্গসজ্জায় সে রকম চাকচিক্য না থাকলেও পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতার মধ্যে দেখা যাচ্ছে নিপুন হাতের পরশ। যেন প্রচ্ছন্ন একটা সুরুচির পরিচয় সর্বত্র প্রকাশিত।

অতিথি আপ্যায়নে আন্তরিকতার পরিচয় শুধু মধুর বাচনভঙ্গীতেই পাওয়া যায় না। আন্তরিকতা প্রকাশ পায় গৃহস্বামীর সুরুচির বহিঃপ্রকাশে এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সৌষ্ঠবে। কথা প্রসঙ্গে মীতার কাজের গুণগান করে, তার দম্ভ বাড়িয়ে দিলেন বুড়ি ঠাকুরমা। শরদিন্দুকে তিনি বললেন, ওরে মীতু আমাদের রূপে-গুণে অতুলনীয়া! ও-যার ঘরে যাবে, তার শ্রী ফিরিয়ে দেবে।

ঠাকুরমাকে একটু চটিয়ে দেওয়ার জন্যই মজা করে শরদিন্দু বললে, গোয়ালা কি নিজের দই টক বলে?

নাতির মন্তব্যে বুড়ি ভীষণ রেগে উঠলেন। তিনি নাত্‌নিকে ডেকে বললেন, শুনেছিস তোর দাদার উক্তি!

ঘরের মধ্যের বাক্‌যুদ্ধ নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল বাইরে নলিনী বসুর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে। সাইকেলটায় চাবি লাগাতে-লাগাতে সে হাঁক ছাড়ল, শরদিন্দু! বাড়িতে আছ নাকি হে?

বন্ধুর আগমনে উৎফুল্ল শরদিন্দু। সোৎসাহে সে বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল নলিনীকে। হাসতে-হাসতে তাকে বলতে শোনা গেল, যাক সকাল সকাল এসে তুমি ভালই করেছ। আমরা তোমার আগমন অপেক্ষায় এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম। আমার ঘরে এসে বস। মাকে খবরটা দিয়ে আসি। সেই সঙ্গে!

—সেই সঙ্গে আর কিছু নয় ভাই, শুধু এক কাপ চা। আগে এক গ্লাস জল খাব।

: আনছি। শরদিন্দু একখানা হাত পাখা বন্ধুকে এগিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতর যেতেই, দামী এক রকম সেন্টের সুগন্ধে ঘরখানা ভরে গেল।

কৌতূহল মানবের চিরন্তন প্রবৃত্তি। তাই কৌতূহলবশতই নলিনী বসু দরজার ফাঁক দিয়ে তাকায় ভেতরের দিকে। হঠাৎ দরজার রঙিন পর্দাটায় টান পড়তেই সে বুঝতে পারল, সুসজ্জিতা কেউ রয়েছেন পাশের ঘরে। তাঁদের মৃদু গুঞ্জনও শোনা গেল।

চঞ্চলা হরিণীর মতন, কাজলপরা চটুল নয়নে তন্বুশ্রী, পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরেই মীতাকে শুধায়, মীতুদি, ঐ সেই মাছধরা দারোগা সাহেব না?

মীতার পাশেই দাঁড়িয়েছিল বনশ্রী। দারোগার কথা উঠতেই সে, বান্ধবীর রক্তিম গালে মৃদু টোকা দিয়ে বলল, ডুবে-ডুবে জল খাচ্ছিস! ভেবেছিস—একাদশীর বাবাও টের পাবে না। তাই না?

মুখে আঙুল দিয়ে সলজ্জভাবে মীতা খুব আস্তে বলে ফেলল, এই—যাঃ! শুনতে পাবে।

সাপের হাঁচি বেদে বোঝে। বান্ধবীর মনশ্চাঞ্চল্য কিসের জন্য তা বনশ্রীর বুঝতে বেশী সময় লাগল না। সে শুধু আর একবার মীতাকে চিমটি কাটতেই তার ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে ধ্বনিত হ'ল, সেই পরিচিত অতি মিষ্টি উঃ শব্দটা। তারপরেই দু'জনের চোখে মুখে একই আনন্দের অভিব্যক্তি। দু,জনার অন্তরে হঠাৎ বিদ্যুতের ঝিলিকের মতই চমক দিয়ে গেল এক অজানা, অনাস্বাদিত গভীর অনুভূতির মধুর পরশ। অনুরাগে প্রকম্পিত তখন দুটি সুপ্ত মন। পরস্পর সমব্যথী যেন অনাহত ওদের সুন্দর প্রস্ফুটিত যৌবন ভারাক্রান্ত দুটি হৃদয়!

ঘরে চুপচাপ একলা বসে নলিনী বসু অনেক কিছুই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে তার মন চলে যায় গ্রাম ছেড়ে শহরে। যেখানে একই ভাড়াটে বাড়ির পাশাপাশি ঘরে, দুই বন্ধুর কৈশোর জীবনের তপ্তোজ্জ্বল দিন গুলি কেটেছে। সেই অতীত দিনের স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠতেই তাকে আঙুল গুণে হিসাব করে নিতে হয়। শরদিন্দু আর নলিনীর বয়সের তফাৎ কম নয়। প্রায় বছর দুই, তিন বটেই।

দু'জনের বয়সের তফাৎ যতই থাক না কেন, কিছু কাল একই বাড়িতে বাস করার ফলে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছিল। তারপর অবশ্য ওরা ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় পারিবারিক যোগাযোগ ছিল না। তা না থাকলেও দুই বন্ধুর বন্ধুত্ব আগেও যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। তবে ওদের জীবন ও মনে উল্লেখ-যোগ্য বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে!

পরিবর্তন হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ যুগ ক্রমশ বদলাচ্ছে। তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে মানুষের জীবন ধারাটাই হয়ত একদিন আমূল বদলে যাবে। তখন সব কিছুকেই মনে হবে অতীত ইতিহাস!

॥ পাঁচ ॥

অতীত ইতিহাস রোমন্থন করে বড় ক্লান্তি বোধ করছিল নলিনী বসু। একটা সিগারেট ধরাবার উদ্যোগ করতেই খুব ব্যস্ত হয়ে শরদিন্দু ঘরে এসে ঢুকল। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা তার দেহ-মন। হাস্যোজ্জ্বল ও যৌবনোদ্দীপ্ত সুন্দর মুখখানি।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই নলিনী বসু, শরদিন্দুকে আচমকা প্রশ্নটা করে বসল, আচ্ছা ভাই! আমরা যখন কলকাতার বাগবাজারে থাকতুম, তখনকার কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে?

হঠাৎ বন্ধুর প্রশ্নে প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেল শরদিন্দু। তারপর সে নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিল, তা কিছু মনে আছে বৈকি। কিন্তু কি ব্যাপার বলত? এতদিন পরে তোমার বাগবাজারের কথা মনে পড়ল কেন!

হাতের ঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়ে নলিনী বসু চেয়ারটায় হেলান দিয়ে খুব আলতো ভাবেই বলতে লাগল, আচ্ছা শরদিন্দু! তোমার বাগবাজারের সেই চারু পাগলার কথা মনে পড়ে? যে, রোজ সকাল বেলায় পাড়ার চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম বক্তৃতা দিত! কখনও রং-বেরং এর চক পেনসিল দিয়ে পাড়ার দেওয়ালে সুন্দর করে বিচিত্র সব মন্তব্য লিখত। আমরা স্কুলে যাওয়ার পথে সেই লেখাগুলো পড়ে অবাক হয়ে যেতাম! কোন কোন মন্তব্যের অর্থ বুঝতে না পারলেও, সুন্দর হাতের লেখার জন্য চারু পাগলাকে মাঝে মাঝে প্রশংসা করতাম। কোন কোনদিন তাকে একটা আধলা পয়সাও দিতাম। সে খুশী হয়ে বলত, খোকাবাবু তোমার জয় হোক। লেখাপড়া শিখে মানুষ হও। আমার মাথায় যত চুল তত বছর বেঁচে থেকে মা-বাবার দুঃখ দূর কর।

তখন আমরা চারু পাগলার কথাগুলো শুনে খুব আনন্দ পেতাম। তার মিষ্টি কথা বলার জন্য তাকে খুব ভালও লাগত, তাই না?

জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির কথা তুলতেই সহসা শরদিন্দুর সুন্দর

মুখখানি কেন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। দুঃখ-বেদনায় ভরা কৈশোরের তপোজ্জ্বল স্মৃতিচারণ করতে বসলে এখনই হয়ত তার দু'চোখ বেয়ে নেমে আসবে অবাঞ্ছিত অশ্রুধারা! তাই সে অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে, নলিনী! তোমার স্মরণ শক্তি দেখছি চমৎকার! সেই ছোটবেলায় দেখা চারু পাগলা সম্বন্ধে বেশ জলের মতন মুখস্থ বলে গেলে সব। আমার ভাই এতদিন পরে অত পরিষ্কার চারু পাগলাকে মনেই পড়ছিল না, তুমি এখন মনে করিয়ে দিলে তাই লোকটাকে মনে পড়ছে। নইলে তাকে ভুলেই গেছলাম।

শরদিন্দুর উত্তর শুনে ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠল নলিনীর মুখে। সে তির্যক ভঙ্গীতে বলে ফেলল, এত তাড়াতাড়ি তুমি ভুলে গেলেও আমি কিন্তু ছোটবেলার কথা কিছুই ভুলিনি! পরিষ্কার সব মনে আছে। খুব ময়লা শতছিন্ন একখানা কাপড় পরে চারুপাগলা, বোস পাড়া লেনের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তার গালভরা কুঁচ-কুঁচে দাড়ি আর মাথায় ঝাঁকড়া চুল ছিল। সকল সময়ে হাতে থাকত একটা মাটির পাত্র। চায়ের দোকানের সামনে গেলেই দোকানদাররা তাকে বিনা পয়সায় চা-দিত। সেই চা খেয়ে অনর্গল বকা-বকি করত। পাড়ার অনেককে আবার গালাগাল দিয়ে চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতেও শোনা যেত!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু সে ভাই ভীষণ মুখ খারাপ করত! অশ্লীল গালাগালও দিত।

: তা অবশ্য দিত, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কি ছিল জান? চারু পাগলা যাদের গালাগাল দিত। তাঁরা কিন্তু কেউ কোনদিন প্রতিবাদ করতে সাহস পেত না। বরং তাদের মধ্যে অনেকে চারুকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যত্ন করে পেট ভরে খেতে দিত।

চারু পাগলাকে যত্ন করে খাওয়াবার প্রসঙ্গ এসে পড়তেই নলিনী বসু, অল্প সময়ের জন্য থেমে যায়। পকেট থেকে একটা ওষুধ বার করে মুখে ফেলে দিয়ে জলের গ্লাসের অবশিষ্ট জলটুকুতে চুমুক দেয়। তারপর ধীরে ধীরে সিগারেট ধরিয়ে বলতে থাকে, শরদিন্দু! আমরা তখন ছোট ছিলাম। তাই হয়ত ওর পাগলামীর রহস্য বুঝতাম না। পাড়ার ছেলেরা যখন চারুর পিছনে লাগত, তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখতাম। কিন্তু ছেলেদের

আচরণ খারাপের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে দেখে. একজন মহিলা শুধু রুখে দাঁড়াত। সে কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলে ছেলেদের যেই বকতে আরম্ভ করত, অমনি সবাই পালিয়ে যেত। এই মহিলাকেও সবাই পাগলী বলত। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, জটাধারী মহিলাটিকে আমরা প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করে মন্দিরে শিব পূজা করতে দেখতাম। কত ছেলে-মেয়ে তাকে শৈলীদি বলে ডাকত। কেউ কেউ আবার শৈলী পাগলীও বলত। কিন্তু কেন যে ওরা পাগল হল, তা কেউ বলতে পারত না। এখন ওদের কথা মনে উদয় হলেই নানা প্রশ্ন অন্তরকে তোলপাড় করতে থাকে। ভাবি মানুষ কেন পাগল হয়!

এতক্ষণের গম্ভীর পরিবেশটাকে এবার বেশ হালকা করে দিল শরদিন্দু। সে এক ঝলক হাসির শব্দে ঘরটাকে কাঁপিয়ে তুলে বলল, এইরে তুমি এবার পাগলের পিছনে লেগেছ দেখছি। ওদের মধ্যে আবার কোন রকম রহস্যের সন্ধান পেলে নাকি?

: রহস্য! তা' রহস্য না থাকলে সমাজের সুস্থ মানুষ পাগল হবে কেন? মানুষ পাগল হয়ে জন্মায় না! জন্মাবার পর কোন না কোন কারণে তাঁরা পাগল হয়। যেমন আমাদের মেজবাবুর স্ত্রী। ভদ্রমহিলার বিয়ের পর দুটি সন্তান হয়েছে। দিব্বি সংসারী। দেখতে মন্দ নয়। শুনলাম, তিনি নাকি হঠাৎ পাগল হয়ে গেছেন। প্রায়ই কোয়ার্টারে ভীষণ চেঁচামেচি করেন। স্ত্রীর জন্য মেজবাবুর যত রাজ্যের অশান্তি। প্রতিবেশী পাগল হলে— !

বন্ধুর মনের প্রতিক্রিয়ার সূত্র বুঝতে পারল শরদিন্দু। নলিনীর মাথায় হঠাৎ পাগলের রহস্য চিন্তাটা এমনিতে জাগেনি। জেগেছে—মেজবাবুর স্ত্রীর চেঁচামেচি শুনে। তাই সে পরিহাসচ্ছলে বলে উঠল, দেখ বাপু, তুমি আবার পাগলের রহস্য উদ্ঘাটনের পাগলামী আরম্ভ ক'র না যেন।

শরদিন্দুর ছোট্ট টিপ্পনী শুনে অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল নলিনী বসু। সে হাসতে-হাসতেই বললে, কেন তোমার ভয় করছে নাকি! পাগলদের কথা চিন্তা করতে-করতে আমিও শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে না যাই! কি বল?

পাশের ঘরে বসে দুই বান্ধবী—পাগল কাহিনী শুনছিল। নলিনী দারোগার হাসির বহর দেখে—তন্বী সভয়ে জিজ্ঞেস করল, মীতুদি, পাগলরা ঠিক এই ভাবে হাসে। তাই না?

—এই যাঃ। ছোট বোনকে ধমক দিল বনশ্রী।

পাগল নিয়ে দুই বন্ধুর আলোচনা বোধহয় মীতার ভাল লাগছিল না। তাই বনশ্রীকে নিয়ে সে মায়ের কাছে রান্নাঘরে গেল। ওরা চলে যেতেই তনুশ্রী একলা বসে রইল না। সেও ভেতরে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কারণ পাগলদের উপর ওর ভীষণ ভয়। তাদের গল্প শুনতেও ভয় পায় সে। পাগল দেখলে আর কথাই নেই।

রান্না ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বনশ্রীর সঙ্গে মীতাকে কথা বলতে দেখে, সুমিত্রা দেবী—মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে তুই ওদের বসতে দিস্‌নি! এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিস কেন?

—এতক্ষণ আমরা ঘরে বসেই ছিলাম কাকিমা। এই মাত্র এখানে এলাম। জবাব দিল বনশ্রী।

রান্নার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন সুমিত্রা দেবী। তারই ফাঁকে তিনি মেয়েকে শুধান, হ্যাঁরে মীতু, ওদের একটু চা করে দে-না।

সুমিত্রা দেবীর কথায় সায় দিল তনুশ্রী। সে বলল, সত্যিই মীতুদি, একটু চা করলে মন্দ হয় না। চল আমিও তোমার সাথে হাত লাগাই।

তনুশ্রীর তাগিদেই যেন মীতা চা বানাতে গেল, এই রকম ভাবখানা দেখালেও আসলে তারও মন চাইছিল যে-কোন একটা অছিলায় একবার দাদার ঘরে যাওয়ার। কারণ ওদের আলোচনার সীমা এতক্ষণে কোথায় গিয়ে পৌঁছল, সেটা জানার জন্য তার প্রাণটা সত্যিই ছট্‌ফট্‌ করছিল। যেমন প্রেমে পড়া প্রেমিক-প্রেমিকারা স্বভাবতই করে থাকে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এক-নাগারে বক্‌ বক্‌ করে দুই বন্ধুরই গলা শুকিয়ে গেছল। তারা উভয়েই যখন এক পেয়ালা গরম চায়ের প্রয়োজন বোধ করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই মীতা আর বনশ্রী, চায়ের পাত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রতেই শরদিন্দু, মীতা ও তার বান্ধবীর সুব্যবস্থার তারিফ করে বললে, আঃ বাঁচলাম। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঠিক সময় বুঝেই চা এসেছে।

—চা-আসেনি। তোমাদের জন্য চা, আনা হয়েছে। দাদার ভুল শুধ্‌রে দিল মীতা।

: বাঃ বাবা! তুই আবার বাক্য-বিন্যাসে ভুল ধরে বসলি! নে—তাড়াতাড়ি চা-টাল দেখি। তারপর তোর ব্যাকরণ—!

মৃদু হেসে নলিনী জানতে চায়, মীতার ব্যাকরণ! সে আবার কি? ওকি স্কুলপাঠ্য বই লিখতে আরম্ভ করেছে নাকি?

বনশ্রী দারোগা মশাইর প্রশ্নের জবাব দেয়, স্কুল পাঠ্য বই লিখতে আরম্ভ করেনি। তবে দু'-একটা গল্প-টল্প লিখছে বোধ হয়। কিরে মীতা, তাই না? বান্ধবীর সঙ্গে চোখা-চোখি হওয়া মাত্র বনশ্রী মুখ টিপে হাসতে লাগল।

নলিনী বসুর সামনে এইভাবে মীতাকে অপ্রস্তুতে ফেলার জন্য মুখখানা তার হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। বনশ্রীর দিকে কটাক্ষ হেনে, মীতা-নিজের ঠোঁট নিজেই কামড়ায়। বোধহয় কিছু বলতে গিয়েও বাকসংযমীর পরিচয় দেয়।

শরদিন্দু ছোটবোনের অবস্থা বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, বুঝলে নলিনী, যিনি মীতার গল্প লেখার কথা বলছেন, তিনি আবার সবার অজ্ঞাতে কবিতা লেখেন।

—আরে তাই নাকি? সোল্লাসের সঙ্গে প্রশ্ন করে বসে নলিনী বসু। তারপর গরম চায়ের পেয়ালায় সশব্দে চুমুক দিয়ে, উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বলতে থাকে! কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। তবে—!

: তবে আবার কি? বন্ধুর কাছে জানতে চায় শরদিন্দু।

কাব্য-সাহিত্যের প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে এসে পড়তে হঠাৎ নলিনী বসু অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবে। সেই সুযোগে শরদিন্দু মীতাকে বলে, হ্যাঁরে, কলেজ ম্যাগাজিনে তোর যে গল্পটা ছাপা হয়েছে, সেটা এনে দেখানা ওঁকে। নলিনীও এক সময়ে গল্প-কবিতা লিখত।

স্বয়ং এবার হাসির পরিবেশ সৃষ্টি করে বনশ্রী। সে বেশ হালকা ভাবেই বলে ফেলে, পাগলদের নিয়ে গল্প লিখতেন নিশ্চয়ই! কারণ একটু আগে ওদের উপর ওঁর যে রকম অনুরাগ দেখছিলাম। তাতে—!

বনশ্রীর কথাটা লুফে নিল নলিনী বসু। সে চট্‌ করে যুতসই জবাবটা দিল, ঐ অনুরূপ শব্দটির ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে এর মধ্যে নিহিত আছে

মানুষের নানা রকম পাগলামী। যা' প্রয়োগ গুণে যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন, তাকে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যে বিশেষণে ভূষিত করবেন, শেষ পর্যন্ত তারও স্থূল অর্থ গিয়ে দাঁড়াবে ঐ বিশেষ শব্দটি।. অর্থাৎ কোন কিছুরই আধিক্য দেখলে সাধারণতঃ আমরা সবাই যা' বলে থাকি। সুতরাং—!

: এই নিয়ে গবেষণা হওয়া উচিৎ। ব্যঙ্গ স্বরেই মন্তব্য প্রকাশ করল মীতা। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ার কথা সে আদৌ ভাবেনি। কথার সূত্র ধরেই দারোগারা উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে এটাও তার মাথায় আসেনি।

ত্বরিৎ গোড়ার আলোচনার খেই পেয়ে গেল নলিনী বসু। মীতার মন্তব্যর সূত্র ধরেই সে তার আলোচ্য বিষয়টা আবার তুলে ধরল। দুই বন্ধু আর দুই বান্ধবীর যুক্তি তর্কের বহর দেখে, তনুশ্রী কিন্তু প্রমাদ গুণতে লাগল। আবার পাশের ঘরে একা বসে তখন সভয়ে সেই পাগল কাহিনী, একরকম বাধ্য হয়ে শোনা ছাড়া উপায় রইল না তার।

একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে নলিনী বসু গম্ভীর মেজাজে তার বক্তব্য সবার সামনে পেশ করল। সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে চলল, দেখ ভাই! প্রত্যেক মানুষের মনেই কিছুনা-কিছু পাগলামী লুকিয়ে আছে। যখন আমাদের কাছে সেটা অত্যধিক বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়, তখনই তাকে আমরা পাগল বলি। এই পাগলের আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন ধর—!

—অর্ধ পাগল, বদ্ধ পাগল আর উন্মাদ •এই তো? নলিনীর অসমাপ্ত উক্তিটাই যেন শরদিন্দু বলল, এই ভেবে সে কৃতিত্ব নিতে চায়। কিন্তু তা আর হয় না।

নলিনী বলে, ও তো অতি সাধারণ কথা। আমি অন্য রকম শ্রেণী-বিভাগ করেছি। অর্থাৎ এক ধরণের লোক আছেন, যাঁরা নিজেদের পাগলামীকে প্রগতিমূলক কাজ বলে প্রচার করেন। তাঁদের ধারণা, তাঁরা যা করছেন তার ফলে সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিপ্লব সামাজিক বিবর্তন আনবেই। অবশ্য এই চিন্তাধারা নিয়ে নবীন ও প্রবীনদের মধ্যে তীব্র মতভেদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অর্থাৎ আলোচ্য শ্রেণীর মূল্যায়ণ করতে হ'লে, একে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করতে হবে। যথা ১ নম্বর ধারার ক ও খ। এই ক ও খ-কে আপাততঃ মুলতুবি রেখে, এখন পরবর্তী শ্রেণীর কথায় আসা যাক। কারণ নবীন ও প্রবীনদের—!

দুই বান্ধবীর জড়তা ভেঙে গেছে। দেহ ও মনের আড়ষ্ট ভাবটাও নেই। তাই তারা দু'জনেই সতেজ কণ্ঠে একসঙ্গে বলে উঠল, নবীন ও প্রবীনদের সংঘাত চলছে, চলবে। কারণ প্রবীনরা, নবীনদের মতামতের মূল্য সহজে দিতে চান না। তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চিরকাল নবীনদের সর্ব বিষয়ে শোষণ করছেন, অথচ তাদের— !

—শ্রমের মর্যাদা এবং নিষ্ঠার স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। আজকের তরুণ-তরুণীদের ক্ষুব্ধ মনের প্রতিফলন প্রকাশ করে দিল শরদিন্দু। শুধু তাই নয়, সে তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের মতন আর একটি মন্তব্য রাখল, প্রবীনরা নিজেদের অজ্ঞতা স্বীকার না করে, নবীনদের উপর সেই দুর্নামের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান।

উত্তপ্ত আলোচনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করেই নলিনী বসু কিঞ্চিৎ থমকে দাঁড়ায়। সে অতি মধুর বাচনভঙ্গী প্রয়োগ করে বলে, আরে এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা গল্প বলি শোন।

সেদিন কোর্টে সাক্ষী দিয়ে সবে মাত্র থানায় ঢুকেছি। এমন সময়ে খবর এলো উকিল পাড়ায় ভীষণ সংঘর্ষ হচ্ছে। আমি ত্বরিৎ বেগে কয়েকজন আর্ম পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, কিছুক্ষণ আগে দু'দলে বেশ সংঘর্ষ হয়ে গেছে। পাড়ার মধ্যে তখনও উত্তেজনা রয়েছে। আমাদের উপস্থিতিতে লোকজন সরে গেল। দু'একজন দূরে দাঁড়িয়ে ঘটনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করছেন দেখে—তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার! কারা সংঘর্ষ বাঁধিয়ে ছিল বলতে পারেন? আর এমন কাণ্ড ঘটলই বা কেন?

আমার প্রশ্নের জবাব কেউ দিলেন না। এ—ওঁর মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগলেন। বুঝলাম, ভয়ে কেউ কিছু বলতে চাইছেন না। আমি তাঁদের অভয় দিয়ে বললাম, আপনারা কি কেউ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন?

তাঁদের সাফ জবাব, না মশাই। এই মাত্র আমরা এখানে এলাম! ঘটনার কিছুই জানি না। শুনছি দু'দলে মারামারি হয়েছে।

—আরে মশাই, মারামারি একলা হয় না। দু'দলেই হয়। সেই দু'দলটা কারা? চেনেন তাদের?

ঃ চিনি না।

—চিনেও না চেনার ভান দেখাল সবাই।

মীতা দারোগাগিরির উপর তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বলে, পুলিশের কাছে ঝামেলার ভয়ে কেউ কিছু বলতে চাইছিল না বোধহয়।

বনশ্রী, বান্ধবীর মন্তব্যের সমর্থন করল না। সে জানতে চাইল, কেন ঝামেলাটা কিসের? পুলিশ বাঘও নয়, ভাল্লুকও নয়। ঘটনার বিবরণ না দিলে তাঁরা তদন্ত করবেন কি করে!

নলিনী বসু, চোখের সামনে উদাহরণ দেখাবার সুযোগ পেয়ে তার সদ্‌-ব্যবহার করতে ছাড়ল না। সে শরদিন্দুকে উদ্দেশ্য করেই বলল, দেখলে ত মজাটা! দু'জন নবীনার দুই মত। এই মতদ্বৈধতার জন্যই গোলমাল বাঁধে। উকিল পাড়াতেও হয়েছিল তাই। এখানেও ঘটনার মূলে রয়েছে এক পাগলের পাগলামী।

পাশের ঘরে চুপ্‌চাপ্‌ একলা বসে গল্প শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল তনুশ্রী। তার প্রতি কারও নজর নেই দেখে সুমিত্রাদেবী এসে বললেন, হ্যাঁরে মীতু! তোরা সবাই গল্প করছিস্‌, আর মেয়েটা ও ঘরে যে ঘুমিয়ে পড়ল?

মায়ের কথায় লজ্জা পেল মীতা। সেই সঙ্গে শরদিন্দুও অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সত্যিই বেচারা বয়সে ছোট বলে, বড়দের আলোচনায় যোগ দিতে পারেনি। ওরাও তাকে উপেক্ষা করেই গল্পের আসর জমিয়ে তুলেছে! এটা কিন্তু সুমিত্রা দেবীর কাছে মোটেই ভাল লাগেনি। তিনি যেমন অতর্কিতে এসেছিলেন, তেমনি আবার চলে গেলেন।

সুমিত্রা দেবীর বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে নলিনী বসু নিজেদের আচরণে দুঃখ প্রকাশ করে। সে বলে, আমরা নবীন ও প্রবীনদের সংঘাত নিয়ে আলোচনা করছিলাম না শরদিন্দু! বিষয় ছিল বোধহয় নবীনদের প্রতি প্রবীনদের উপেক্ষা, তাই না?

বন্ধুর প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝতে পারে শরদিন্দু। তার মুখে আত্ম-সমালোচনার স্বর বেরিয়ে আসে, তুমি যা বলতে চাইছ নলিনী, তা' বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ আমরা অন্যের সমালোচনা করি। আত্ম-সমালোচনা—!

শরদিন্দুর স্বীকারোক্তি শুনে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চায় বনশ্রী। তার কৌশল ধরে ফেলল নলিনী বসু। সে একটু আক্রমনাত্মক ভঙ্গীতে বলে

ফেলে, এর পরেও আমাদের শুনতে হবে, নবীন ও প্রবীনদের সংঘাত চলছে—চলবে !

—উকিল পাড়ার ঘটনার গল্প কিন্তু শেষ হয়নি। ঝিমিয়ে পড়া আসরকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যই বোধহয় কথাটা বলল মীতা। সেই সঙ্গে দারোগার হাত থেকে বান্ধবীকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা কিনা, তা একমাত্র সেই জানে।

এবার হাত ঘড়িটার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চমকে উঠল নলিনী। কথায়-কথায় সে খেয়াল করেনি রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। কাজেই তাকে বাধ্য হয়েই বলতে হল, ও গল্প শেষ করতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে।

—সংক্ষেপে বল। ততক্ষণে মায়ের রান্নার খবরটা আমি একবার নিয়ে আসি।

শরদিন্দু চলে যেতেই মীতা সলজ্জভাবে নলিনী বসুকে বলে, আজ আমার জন্মদিন। আপনাকে প্রণাম করব।

: দাঁড়াও-দাঁড়াও! তোমার জন্মদিনের উপহারটার কথা আমি ভুলেই গেছি। কথাটা শেষ করে পকেটে হাত দিল নলিনী।

সে সুন্দর ছোট্ট বাক্সটির মধ্যে থেকে সোনার আংটিটি বার করে দেবার আগেই চট্ করে প্রণামটা সেরে নিল মীতা।

বনশ্রী হাসতে-হাসতে শুধাল, আশীর্বাদ করলেন না?

দু'জনেই মৃদুভাষিণী, সুহাসিনী-অনুরাগে রঞ্জিতা। ওদের জবাব দেবার সুযোগ পেল না নলিনী দারোগা। ঝড়ের বেগে শরদিন্দু এসে বলল, আর আধঘণ্টা ইত্যবসরে তুমি গল্পটা বলে ফেল ভাই। তনুশ্রী মাকে সাহায্য করছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব হয়ে যাবে।

শরদিন্দুর অনুপস্থিতিতে মীতাকে উপহার দেওয়ার ব্যাপারটা ঠিক যুক্তি সঙ্গত হয়েছে কিনা, তাই ভাবছিল বোধ হয় নলিনী বসু। বিবেকের দংশনে তার মনটা বড় চঞ্চল হয়েও পড়েছিল। কি ভাবে নিজের আচরণ সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হবে, তারই উপায় খুঁজছিল সে।

বনশ্রী ব্যাপারটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল। কারণ সে নিজেও ভদ্রলোককে অকারণ প্রশ্ন করে ফেলে, কেন যেন মনের মধ্যে একটা শঙ্কা অনুভব করছিল। মেয়েদের বিচিত্র মন! কখন যে, তারা কিরূপ ধরে

সে কথা স্বয়ং বিধাতা পুরুষও জানেন কিনা সন্দেহ। তার জন্যই হয়ত শাস্ত্রকারগণ বলে গেছেন, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্—!

পুরুষের ভাগ্যের কথা বলা যায় না। প্রবাদ বচনটি সম্পর্কে যে যাই বলুক, নলিনী বসু কিন্তু বলল অন্য রকম। শরদিন্দুকেই কথাটা সে কায়দা করে শুনিয়ে দিল, আরে আজ যে রবিবার এখানে সব দোকান পাট বন্ধ, তা আমার খেয়ালই ছিল না। মীতাকে একটা কিছু উপহার দেওয়ার জিনিস কিনতে গিয়ে দেখি বাজার বন্ধ। ভাগ্যিস্ নরেনবাবুর দোকানটার ভিতরে লোক ছিল! তা না হলে মুশকিলেই পড়ে যেতাম বুঝলে।

—নরেন স্যাকরার দোকান! মানে তুমি সোনার জিনিস! কি কাণ্ড দেখ দেখি! ছোটদের জন্মদিনে, বড়দের আশীর্বাদই ত যথেষ্ট। আবার উপহার-টুপহার কেন?

: কিছুই না সামান্য একটা আংটি। মীতা! দাদাকে দেখাওনা জিনিসটা।

বনশ্রী, বান্ধবীর চাঁপা ফুলের কুঁড়ির মতন আঙুলে আংটিটা পরিয়ে দিতেই মীতা, হাতখানা দাদার দিকে এগিয়ে দিল!

—বাঃ চমৎকার ডিজাইনের তো জিনিসটা! তোর হাতে মানিয়েছেও বেশ! নাঃ নলিনীর রুচি আছে একথা স্বীকার করতেই হবে!

এবার হালকা হল নলিনী বসুর মন। সে স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে হেসে বলতে লাগল, আসলে কি জান? সবই আমাদের পাগলামী। আমি আগেই বলেছি, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু পাগলামী লুকিয়ে থাকে। এটাকেও এক ধরণের—!

—তা যা বলেছ। উপহার বা যৌতুক দেওয়া-নেওয়ার রেওয়াজটা আসলে পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নিয়ে অনেক সময় অশান্তির সৃষ্টি হয়। কাজেই এ ব্যবস্থার সত্যিই পরিবর্তন হওয়া দরকার। আমার মতে কারও কাছ থেকে কিছু নেওয়াই উচিৎ নয়।

শরদিন্দুর উক্তি শুনে কি যেন বলতে যাচ্ছিল বনশ্রী। কিন্তু সে তার মনের কথা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারল না। শুধু ভাবে তাকে বোঝাতে হ'ল, ও কথা মুখে সবাই বলে। কাজে কেউ পালন করে না।

অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে মীতা বিরক্ত হয়ে বলে ফেলল, বেশ লোক আপনি! উকিল পাড়ার গল্পটা শেষ করবেন না?

বনশ্রী আর শরদিন্দু দু'জনে একসঙ্গে সমর্থন করল মীতাকে। তারা বলল, সত্যিই সেই গল্পটার কি হ'ল?

—গল্প! বার-বার বাধা পড়লে কি গল্প বলা যায়? সংক্ষিপ্ত জবাব নলিনীর।

: না, আমরা আর বাধা দেব না। গল্পটা শেষ হলেই—!

মীতার অসমাপ্ত কথাটার উপর জোর দিল শরদিন্দুও! সে বলল, গল্প শেষ হলেই আমরা খেতে যাব!

সবার অনুরোধেই নলিনী দারোগাকে গল্পটা বলতে আরম্ভ করতে হ'ল। সে প্রথমেই বলে নিল, দেখ ভাই! পুলিশি তদন্তের সূত্র বা রহস্য উদ্ঘাটন সম্বন্ধে কিন্তু আমাকে কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। ঘটনার বিবরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে সাহিত্যে রূপ দিলে, গল্পটা বোধ হয় ঠিক এই রকম দাঁড়াবে।

সাগ্রহে সকলে নলিনীর গল্প শুনতে লাগল।

রাস্তার একটা লাইট-পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে রোজই দাঁড়িয়ে থাকে পাগল লোকটা। রাতের স্তিমিত আলোর রেখা ভেদ করে তার করুণ দৃষ্টি গিয়ে পড়ে অপূর্বর নতুন বাড়িটার দিকে!

রিক্ত জীবনের বেদনায় লোক চক্ষুর অন্তরালে রোজই সে কাঁদে। উষ্ণ চোখের জলে বুকটা তার ভিজে যায়। মলিন শতছিন্ন কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে, আবার পাগল লোকটা সকরুণ দৃষ্টিতে বার বার দেখে আধুনিক সাজে সজ্জিত সুন্দর বাড়িটাকে। তারপর একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে আপন মনে বলতে আরম্ভ করে, আজ আমি পাগল! তাই তুমি আমাকে চিনতে চাওনা অপূর্ব গুহ। দেখা করতে গেলেই পাগল বলে ঘৃণা প্রকাশ কর। কিছু বলতে গেলে দারোয়ান ডেকে গলা ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বার করে দেওয়ার ভয় দেখাও—বিশ্বাস ঘাতক, শয়তান—!

ক্রোধ সামলাবার জন্যই বোধ হয় নিজের মনে দুঃখের হাসি-হাসে পাগলা অশোক। তারপর বলে, আজ কেউ বিশ্বাস করবেনা অপূর্ব গুহ, আমার অর্থ আত্মসাৎ করে তুমি বড়লোক হয়েছ।

ক্রুদ্ধস্বরে বলে, ওই আমাকে পাগল করে দিয়েছে। একদিন ও পথে-পথে ঘুরে বেড়াত, খেতেই পেত না। আমিই ওকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। বিশ্বাস করে ওর হাতে সব তুলে—!

হঠাৎ পেছনে গাড়ির হর্ন বেজে উঠতেই চমকে উঠল অশোক, চোখ ফিরিয়ে সে দেখল—অপূর্বই গাড়ি চালিয়ে গেটের ভিতর ঢুকল। তার বিলাসবহুল গাড়ি ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে জিঘাংসায়—মুহূর্তের জন্য অশোকের কোঠরাগত চোখ দুটো জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই অশ্রু-বন্যায় সেই আগুন নিভে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ হয়ে পড়ল তার পাগল মন।

ছেঁড়া মলিন জামার পকেট থেকে আধপোড়া বিড়িটা বার করে, পাশের পানের দোকানের জ্বলন্ত দড়িতে ধরিয়ে নেয় অশোক। ধোঁয়াটা গিলে ক্ষুধার্ত প্রাণকে বোধহয় সে সান্ত্বনা দেয়। তারপর ভাবে এই সেই অপূর্ব! একসঙ্গেই তাদের দু'জনের দুঃখময় কৈশোর জীবন কেটে গেছে। তপ্তোজ্জ্বল সেই স্মৃতি-বিজড়িত দিনগুলির কথা আজও— !

পাগল অশোক, হারানো স্মৃতি রোমন্থন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না—সব যেন মাথার মধ্যে ঘুর পাক খেয়ে যায়। তবু সে এলোমেলো চিন্তা রাশিগুলোকে এক জায়গায় গুছিয়ে আনতে চেষ্টা করতে থাকে। সেই ফাঁকে আধপোড়া বিড়িটার আগুন দুই আঙুলের মাঝখানে লাগতেই যন্ত্রণায় আঁতকে উঠে। বিড়িটা ফেলে দিয়ে পোড়া জায়গাটায় জিবের থুথু লাগাতে-লাগাতে বলে, একটু অন্যমনস্ক হতেই আঙুলটায় ছেঁকা লেগে গেল! যাক শালার বিড়ি আর খাব না।

সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়েনি পাগলা অশোকের। ক্ষুধার জ্বালায় সে ছটফট্ করছিল। ফুটপাতের তেলে ভাজার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতেই একজন তাকে কিছু খাবার কিনে দিয়ে বলল, কিরে এর সঙ্গে চাট্টি মুড়ি নিবি?

—মুড়ি! তা' দাওনা এক আনা কিনে। সকাল থেকে কিছু খাইনি। বড্ড খিদে পেয়েছে দাদা।

: এক আনা মুড়িতে কি হবে! সারাদিন খাসনি। দু'আনা কিনে নে। পাঁচুকে আমার নামে লিখে মুড়ি দিতে বল। কাল আমি দাম দিয়ে দেব।

পাঁচু, দুলালের কথা শুনেই বুঝতে পারল আজ মেজাজে রয়েছে সে। সন্ধ্যার সময় ও এদিকে বড় একটা আসে না। ব্যায়াম সমিতিতে থাকে। ওকে দেখলেই পাঁচুর ভয় লাগে, কারণ লোকে বলে মার-দাঙ্গার সম্ভাবনা থাকলেই দুলাল সেখানে ঘোরাঘুরি করে। বেপরোয়া হয়ে নাকি সোডার বোতল নয়ত বোমা ছোঁড়ে। মেরে রক্ত বন্যা বইয়ে দেয়। কেউ অন্যায় করছে শুনলে, দুলাল তাকে শায়েস্তা করে ছাড়ে। পাড়ার কেউ কিছু বলতে চায়না দুলালকে, বরং সকলেই বলিষ্ঠ এই ছেলেটিকে বেশ সমীহ করে চলে। দরকার হলে তার কথাও অভিভাবকরা শোনে। পাড়ার ছেলে-মেয়েরাও দুলালদার ভক্ত। সেও সকলকে খুব ভালবাসে। প্রতি-বেশীদের বিপদে-আপদে সেই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে। সাধ্যমত ছোট-বড় সকল শ্রেণীর মানুষের উপকার করতে চেষ্টা করে। তবু কেউ কেউ দুলাল সম্পর্কে নানা কথা বলে, যে যাই বলুক, পাড়ার যুব সম্প্রদায় তার নেতৃত্বেই চলে। পাগলা অশোককে দুলুদা ভালবাসে, কাজে কাজেই তার দেখাদেখি অন্যান্যরাও সাহায্য করে।

পাগল হলেও অকৃতজ্ঞ নয় অশোক। স্বেচ্ছায় পর পর কেউ দু'দিন পয়সা দিলে, তিন দিনের দিন তার কাছ থেকে সাহায্য নেয় না কখনও। অশোকের এই ব্যবহারের কথা যদি কোথাও আলোচনা করেন কেউ, তাহলেই উপস্থিত পাড়ার ছেলেরা বলে ওঠে—, জানেন লোকটা কে! একদিন দুলুদাকে ওর কথা শুধবেন। তিনি সব বলে দেবেন।

সেদিন পাড়ার দুলুদার দেওয়া মুড়ি-তেলেভাজা খেয়েই রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিল অশোক। রাস্তার ফুটপাতে এই ভাবেই তার এখন রাত কাটে। যাঁরা তার সম্পর্কে কিছু জানে না, একমাত্র তাঁরাই তাকে পাগল বলে উপেক্ষা করে।

উপেক্ষিত অশোক প্রতিদিনের মতই উকিল পাড়ার দুলালদের বাড়ির সামনের ফুটপাতে সেদিন ঘুমিয়েছিল। ভোরের হিমেল বাতাসের ঠাণ্ডায় হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে যেতেই সে, নিস্তব্ধ ফুটপাতের উপর উঠে বসে কি যেন বির বির করে বলতে লাগল, অস্পষ্ট তার সেই ভাষা।

ভোরের পথচারীরা পথ চলতে-চলতে হয়ত সহযাত্রীদের মধ্যে কাউকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা পাগলটা রোজ ঐখানে বসে বির বির করে কি বলে?

পাগল অনেক কথাই বলে। হয়ত সে ভোরের গাড়ির যাত্রীদের দেখে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কলকাতায় যাচ্ছ? মিলে কাজ কর নিশ্চয়ই! নইলে ভোরের গাড়িতে খাবারের কৌটো নিয়ে হন্ত দন্ত হয়ে এইভাবে ছুটতে হবে কেন।

খেটে-খাওয়া মানুষদের শহরের দিকে ছুটতে দেখলে অশোকের মনটা যেন কেমন হয়ে যায়। মুখের ভাবও তখন অন্য রূপ নেয়। দুঃখের হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁট দু'খানিতে। তারপরই আপন মনে সে বির বির করে বলতে থাকে, তোমরা সবাই ক'লকাতায় কাজ কর? তাত করবেই। ক'লকাতা শহর কাজেরই তো জায়গা। আমিও একদিন ক'লকাতায় থাকতুম। তোমাদের মতন কাজ করে খেতুম। আরও পাঁচজনকে—!

পাঁচজনের কথা মনে উদয় হতেই, অশোকের চোখের সামনে ছায়াছবির মতন ভেসে ওঠে তাদের সেই জন বিরল পাড়াটার দৃশ্য। অনেকদিন আগের কথা হলেও—আজও তার বেশ স্পষ্ট সব মনে আছে। দরকার হলে খুঁটিনাটি কয়েকটা ঘটনার গল্পও বলতে পারে। পাগল হলে কি হবে, অদ্ভুত তার স্মৃতি-শক্তি। একটু ভাবলেই একের পর এক দৃশ্য অশোকের মনে পড়ে। গড় গড় করে তখন সেই সব কথা আপন মনে বলে যায়।

ঘন বস্তীপূর্ণ পল্লীটার পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে একটা জরাজীর্ণ খাল। আর তার দু'পারে ছিল অনেকগুলো চুণ-শুরকির গোলা। কিছুটা এগোলেই বড় বড় কাঠের আড়ৎ, সামনে পিছনে কয়েকটা তেল কল, দেশলাই ও সাবানের কারখানা। কল-কারখানার দরিদ্র শ্রমিক এবং অল্প আয়ের মানুষরাই ছিল তখন সেই অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসী।

এই অধিবাসীদের মধ্যে অবাঙ্গালীর সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। তাদের কেউ হয়ত পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে কাঁচের রঙিন চুরি বিক্রি করত। কারও পেশা ছিল সাবান নয়ত বাসন ফেরি করা। অন্যান্য পেশার লোকেরও সেখানে অভাব ছিল না। এককথায় সেটা ছিল একটি বিচিত্র এলাকা, অতি বিচিত্র ছিল তার পরিবেশ!

সেদিন সমগ্র অঞ্চলটা খুঁজলে উড়ে ঠাকুর থেকে ঠিকে ঝি পর্যন্ত পাওয়া যেত। বিচিত্র ধরনের ছিল তাদের জীবনযাত্রার পথ! তার চাইতেও বিচিত্র ছিল অনেকের জীবন! প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার নানা উপাখ্যান

নিয়ে তখন তারাও পাড়ার যুবক-যুবতীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করত। কেচ্ছাও কম রটাত না। তবু তাদের জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম কোনদিন শুরু হ'ত না। খাটত খেত নইলে উপবাস করে দিন কাটাত। কেউ কারও ধার ধারত না।

একখানা হাত পাখার বাতাস পিছন থেকে গায়ে এসে লাগতেই দৃষ্টি ফেরাল নলিনী বসু। সে খেয়াল করেনি কখন শরদিন্দুর মা—ঘরের মধ্যে এসে বসেছেন। এতক্ষণ তিনিও বোধহয় তার গল্প শুনছিলেন। তাঁকে দেখে হাসতে-হাসতেই নলিনী বললে, আপনিও গল্প শুনছেন!

—কি করব বল? তোমরা সবাই গল্পে মশগুল হয়ে আছ। তাই আমিও রান্না-বান্নার পর এসে একটু বসলাম। গল্প শেষ হলেই সকলকে খেতে দেব।

মায়ের কথায় বিরক্ত প্রকাশ করে মীতা। সে বলে, উঃ মা! তুমি একটু চুপ করে বস। গল্পটা আগে শেষ করতে দাও।

শরদিন্দু নির্বাক। বনশ্রীও তাই। শুধু তনুশ্রী একটু উস্ খুস্ করছিল। তার দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা দেবী বলেন, তনুর বোধহয় খিদে পেয়েছে!

খিদের আর দোষ কি! সে ত আর গল্পের আকর্ষণে বসে থাকবে না। সময় হলেই তার তাগিদ দেওয়া আরম্ভ হবে। যতক্ষণ না সে শান্ত হচ্ছে ততক্ষণ—!

নলিনীর মুখের কথা হঠাৎ কেড়ে নিল তার অন্তরঙ্গ বন্ধু শরদিন্দু। সে আচমকা বন্ধুকে বলল, গল্পর গৌরচন্দ্রিকা করতেই তোমার অনেকটা সময় কেটে গেল। আসল উপাখ্যান এখনও অথৈ জলের তলায়। ওটা শেষ না করে তুমি যেতেও পারবে না। সুতরাং চল ডান হাতের পর্বটা সেরে এসে আবার বসা যাবে। নইলে বেশী রাত হয়ে গেলে মায়ের খুব কষ্ট হবে। সেই সকাল থেকে ওঁর খাটা-খাটুনি চলছে।

মায়ের কষ্টের কথা তুলতেই সকলে একবাক্যে ডান হাতের পর্ব সমাধার ইচ্ছা প্রকাশ করতে বাধ্য হ'ল। সুমিত্রা দেবী অতি আন্তরিকতার সঙ্গেই জানালেন, না-না আমার কোন কষ্ট হবে না। বরং খিদেয় তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, আমি সেই কথা ভাবছি! রাত প্রায় নটা হতে চলল বোধহয়।

—বোধহয় কেন! নটা বেজে কয়েক মিনিট হয়ে গেছে। হাত-ঘড়িটা দেখে জবাব দিল নলিনী বসু।

পরের কথায় নির্ভর করে না মীতার বান্ধবী, সঙ্গে সঙ্গে নিজের লেডিস ঘড়িটার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বনশ্রী। তারপর তনুশ্রীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে—সুমিত্রা দেবীকে বলে, গরমের দিনে অবশ্য রাত নটা তেমন কিছু নয়। দশটা পর্যন্ত আমরা পড়াশুনাই করি। তবে—!

: এর মধ্যে তবে-ঠবের দরকার নেই। নলিনী যে ভাবে গল্প ফেঁদেছে, তাতে ওর জাল গুটিয়ে আনতে বেশ সময় লাগবে। তারপর যদি প্রত্যেকটি চরিত্র বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করে তাহলে— !

শরদিন্দুর মন্তব্যের উপর এবার মৃদু আক্রমণ চালায় দারোগা মশাই। উদ্দেশ্য জনতার ছত্রভঙ্গ করা নয়, বোধহয় জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ। তাই ব্যঙ্গ স্বরে সে বলতে থাকে, কার চরিত্র, কে বিশ্লেষণ করবে ভাই? এ যুগে সবার চরিত্রই সমান। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে শুনেছি—কয়েকজন চরিত্রবান লোক এই দেশে জন্মেছিলেন। তাঁদের মূলধন করেই আমাদের দেশ ও সমাজ এখনও চলছে। মুষ্টিমেয় সেই ক'জন মনীষীর চরিত্র আলোচনা বা প্রচার করেও আমরা চরিত্রবান হতে পেরেছি কি! বরং আমাদের চরিত্র দিন দিন অদ্ভুত হয়ে উঠছে! কাজেই সেই সব অসাধারণ চরিত্রের বিশ্লেষণ না করাই ভাল। করলে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে।

কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করে বনশ্রী। সে দৃঢ় কণ্ঠে বলে, প্রতিবাদের ঝড় উঠবে কেন? চরিত্রবান লোক কি এখন সমাজে নেই! যেমন ধরুন—।

বনশ্রীর কথায় বাধা দিল নলিনী বসু। তাকে বলতে শোনা গেল, থাক দয়া করে ঐ নামগুলো আর বলবেন না। দেওয়ালেরও কান আছে। কে কোথা থেকে বলে বসবে, আমরা তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছি!

এরপর কিছু বলার চেষ্টা করছিল শরদিন্দু। তাকে ও বলতে দিল না তার বন্ধু। সে শুধু হতাশ হয়ে একটা কথাই বলে, শরদিন্দু! তোমার মনে আছে কিনা জানি না। আমার আজ চারু পাগলার একটি দেওয়ালের লেখার কথা মনে পড়ছে। সে বাগবাজারের এক বিখ্যাত বাড়ির গায়ে রঙিন চক-পেনসিল দিয়ে লিখেছিল, একতলার মানুষ আমরা। চিরকাল একতলায় পড়ে থাকব, উপরের তলার মানুষকে আরও উপরে তোলার জন্ম।

নলিনী বসুর উক্তি শুনে মীতা এবার মুখ খুলল। সে অতি ধীর স্থীর ভাবে জানতে চাইল, উপরের তলার লোকদের চরিত্র আপনি জানবেন কি করে, তাঁদের সঙ্গে না মিশলে?

—আমাদের সবার সঙ্গেই মিশতে হয়। সুতরাং সকলের কথাই আমরা জানি। তাছাড়া পুলিশ বিভাগ তো সমাজের দর্পণ। তাতে সকল স্তরের মানুষেরই ছায়া দেখা যায়। মনের গোপন তথ্য অর্থাৎ যা দিয়ে তোমরা চরিত্র বিচার কর, তাও নির্ভুলভাবে জানতে হলে তোমাকে ঐ বিভাগের শরণাপন্ন হতেই হবে। জাননা, গোয়েন্দারা সন্দেহজনক লোকদের অতীত, বর্তমান ঠিক জ্যোতিষীদের মতই বলতে পারে। তাদের এক কথা, কেউ ধোয়া তুলসী নয়।

সুমিত্রা দেবী আবার সকলকে তাগিদ দিতেই শরদিন্দু বলে, চল ভাই নলিনী। খেতে বসে কথা বলব আমরা। মা, বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওদের আবার— !

—ওদের কেন, খিদে বাপু আমারও পেয়েছে।

নলিনীর খিদে পেয়েছে শুনে, মীতা ও তার মা উঠে দাঁড়াল। শরদিন্দু তনুশ্রীকে বলল, চল ছোড়দি। আমরাই বা বসে থাকি কেন!

হঠাৎ নতুন সম্বোধনে তনুশ্রী চকচকিয়ে গেল। সে মৃদু হেসে বলল, ছোড়দি না হাতি। ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলোর আদর। এতক্ষণ— !

বিস্ময় প্রকাশ করল শরদিন্দু। সে হাসতে হাসতেই তনুশ্রীকে জিজ্ঞেস করল, চুপ করে গেলে কেন? এতক্ষণ কি—বল!

সেই ঠিক আগের মতন মেজাজে সে উত্তর দিল, জানিনা যান।

অভিমানিনীর প্রতি একটু অনুকম্পা দেখাতে যেতেই, শরদিন্দুকে আর একটি বাক্যবান সহ্য করতে হল, দিদিকে বলে দেব কিন্তু, তখন মজাটা টের পাবেন।

॥ ছয় ॥

মানুষের জীবন ও মন! কত যে বিচিত্র তার রূপ! ভাবতে বা বুঝতে গেলে বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমশ সীমার বাইরে চলে যায়। নিজের মনেই তখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগে। তার জবাব খুজে না পেলে, অন্তরে বিক্ষোভের ঝড় বইতে থাকে। চেনা-জানা মানুষ এবং তাদের চরিত্রের চুলচেরা বিচার করার ধৈর্য তখন কোথায় যেন হারিয়ে যায়। একান্ত প্রিয়জনের প্রতিও কটুক্তি বর্ষণ করতে জিহ্বা ক্ষনিকের জন্য দ্বিধা বোধ করে না সেই মুহূর্তে। তবু তাঁদের মনের কোনে গভীর অনুভূতি যে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে তারও একটা সৌন্দর্য আছে। যদিও সেই মনের গতি ও প্রকৃতির রূপান্তর ঘটে। যার ফলে প্রতিদিন সমাজ এবং সংসারে কত না অঘটনই যে ঘটছে তার হিসাব আর ক'জনা রাখে?

চলমান জীবনের প্রতি পদক্ষেপ—কালের কুটিল আবর্তনে, দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছে, দিনদিন তাই কেউ আর ফেলে আসা দিনের কথা ভাবে না। সবাই ভাবে শুধু ভবিষ্যতের কথা, যার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ। সেই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মানুষের কত চেষ্টা, কত রকম ফন্দি ফিকির, তার ইয়ত্তা নেই। ছল-চাতুরীরও সীমা পরিসীমা দেখিনা শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে—সেখানে সকলেই সমান, একই উদ্দেশ্য সাধনে সবাই ঋত্বিক। নর ও নারীর সেই একই প্রচেষ্টা। তফাৎ শুধু কৌশলের।

সুমিত্রাদেবী অতি কৌশলেই কথাটা পারলেন নলিনী বসুর কাছে। তিনি সস্নেহে তাকে বললেন, এবার বিয়ে থা করে সংসারী হও বাবা। এইভাবে আর কতদিন কাটাবে! শরদিন্দুরও বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা আছে আমার। মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই—!

মীতার মায়ের সামান্য কথাগুলিতে যেন সবার মনেই সহসা বিদ্যুতের ঝিলিক মেরে গেল। নীরবে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল এ-ওর সঙ্গে। কারও মুখে টু শব্দ নেই। নিস্তব্ধ আসর, ভোজনের গতি সকলেরই মন্থর।

জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ছোট্ট একটি ঢেঁকুর তুলল শরদিন্দু। তারপর

নলিনীর পাতের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, ওকে আর দু'চামচ পায়েস দাও মা। তুমি, তনুশ্রীকে—!

নামটা উচ্চারণ করতেই সে ফোঁস করে উঠল। বেশ বাঁকা ভাবেই তাকে বলতে শোনা গেল, আগে নিজের পাত সামলান, তারপর অন্যের পাতের দিকে নজর দেবেন।

—আমার পাতা দেখত, কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! আর তোমাদের! সব খেতে হবে, পাতে কিছু ফেলা চলবে না কিন্তু। নাও মুখ চালাও। দুর্মূল্যের বাজারে কোন জিনিস নষ্ট করা উচিত নয়।

শরদিন্দুর কথাতে দুই বোনই বোধ হয় লজ্জিত হল। তারা দু'জনেই পাতা পরিষ্কার করার দিকে নজর দিল। মীতার মা, বনশ্রীকে আর একবার পায়েস দেওয়ার চেষ্টা করতেই সে বাধা দিয়ে বলল, আর এক চামচও দেবেন না। খুব ভাল হয়েছে পায়েস, তাই অনেকটা খেয়েছি। আর খেতে পারব না।

তনুশ্রী তো পাতার উপর ঝুঁকে পড়ে বলে উঠল, মরে যাব কাকিমা। এত খেয়েছি যে, কি করে হেঁটে বাড়ি যাব তাই ভাবছি।'

—বাড়ি যাওয়ার দরকার কি। থেকে যাও এখানে। দিদি অমৃতর সঙ্গে চলে যাবে। দরকার হয় আমি না হয় এগিয়ে দিয়ে আসব।

শরদিন্দুর মন্তব্যের উত্তরে তনুশ্রী শুধু একটি শব্দ উচ্চারণ করল, হু—। তারপর দিদির দিকে তাকিয়ে রইল। বিহ্বলতায় ভরা তার কাজল পরা নয়ন দুটি!

বনশ্রী এবার মুখর হল। সে শরদিন্দুর বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, আপনি তাহলে কবে আমাদের নেমতন্ন খাওয়াচ্ছেন বলুন?

—নেমন্তন্ন!

: হ্যাঁ, আমরা সবাই যাব। অবশ্য—!

বনশ্রীকে কথাটা শেষ করতে দিল না মীতা। সে অন্যদিকে নলিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল। তাই সে পুরান কথারই আবার পুনরাবৃত্তি করল, উকিল পাড়ার রহস্য উদ্ঘাটনের গল্পটায় ধামা চাপা পড়ে গেল কিন্তু! বললে মীতা।

—কি আর করব বল? সত্যিই গল্পটা শেষ করতে পারলাম না।

অন্য একদিন এসে যদি পারি বলে যাব। অবশ্য একটানা গল্প বলা বড় সহজ মাঝখানে চ্ছেদ পড়লে—!

: চ্ছেদ পড়ার দরকার কি! গল্পটা আজ শেষ করেই যাওনা তুমি, সাড়ে দশটার মধ্যে থানায় ফিরলেই তোমার চলবে তো?

শরদিন্দুর শিশুসুলভ উক্তিতে হাসি পেল নলিনীর। সে বলল, তুমি যদি আমার মত দারোগাগিরি করতে তাহলে ঠ্যালা বুঝতে। জাননা কত ঝামেলা আমাদের! যে চাকরী, তাতে প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত। গল্প করার সময় নেই। সুযোগও পাইনা। নইলে শুধু গল্প বলা কেন। লিখতেও পারা যায়। আমাদের কাছে মালমশলার অভাব নেই। একটু সাজিয়ে লিখলেই হ'ল।

—তা একটু সময় সুযোগ করে নিয়ে লিখলেই পারেন। বাবার কাছে শুনেছি, থানা আর আদালত নাকি সমাজের দর্পণ। ওখানে নানা চরিত্রের প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃত সমাজের বাস্তব রূপ, আইন-আদালতের লোক এবং কর্মচারীরাই প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

বনশ্রীর উক্তি আর তার ছোট বোনের সমর্থন নলিনী বসুকে এবার বেশ বিচলিত করে তুলল। বাধ্য হয়েই তাকে জবাব খুঁজতে একটু চিন্তা করতে হয়। কারণ বক্তার পিতা একজন অবসর প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। দীর্ঘকাল জেলা জজ ছিলেন। তিনি জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন। তাঁর সমাজ ও সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অন্ত নেই। সুতরাং—।

নলিনীর চিন্তাস্রোতে বাধা দিলেন সুমিত্রাদেবী। তিনি বলে উঠলেন, অনেকদিন থেকে মীতা বলছে—একদিন তোমার কোয়ার্টার দেখতে যাবে। শরদিন্দু থাকতে-থাকতে একবার গেলে হয়না, বাবা?

—বেশ তো চলুন একদিন, কবে যাবেন বলুন? দয়ালঠাকুরকে বলে রাখব। রান্না-বান্না করে রাখবে।

: রান্না-বান্না করে রাখতে হবে কেন। আমরাই রেঁধে-বেড়ে খেয়ে আসব। শুধু ব্যবস্থা করে দিলেই হবে।

মীতার স্পষ্ট কথায় খুশী হ'ল নলিনী বসু। সে বললে, অতি উত্তম কথা। তাহলে কাল সকালেই তোমরা এস। নইলে শরদিন্দুকে আবার পাওয়া যাবে না। ওর ছুটি শেষ হয়ে এল!

দারোগা বাড়ির নিমন্ত্রণের সংবাদে আনন্দে উৎফুল্ল হ'ল উপস্থিত সকলেই। শরদিন্দু সোৎসাহে বলেই ফেলল, অনেক দিন কচ্ছিভোর মাংস খাইনি। কাল তুমি কিন্তু ভাই, তার ব্যবস্থা করবে। দয়াল ঠাকুরকে কিছু করতে হবে না। আমরাই সব করে নেব। কি বলিস মীতা?

দাদার বক্তব্য পুরোপুরি সমর্থন করতে পারল না মীতা। সে একবার বনশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ওরা দুই বোন যে আবার মাংস খায় না! তাছাড়া মা-সঙ্গে যাবেন! কাজেই—।

মীতা, মায়ের কথা বলতেই নলিনী বসুর মনে হঠাৎ একটা খটকা লাগল। কিন্তু ব্যাপারটা সে প্রকাশ করতে পারল না।

নলিনীর অব্যক্ত প্রশ্নটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই শরদিন্দু বললে, ওদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। নলিনীর বাসার মধ্যে একটা কাঁঠাল গাছ আছে। তাতে অনেক এ'চোড় হয়েছে। তাই দিয়ে নিরামিষ তরকারী হবে। সঙ্গে ডাল তো থাকবেই।

শরদিন্দুর একতরফা বক্তৃতায় এবার বাধা দিল নলিনী বসু। সে বলল, তোমরা যাবে আমার বাড়িতে, কাজেই অতিথিদের খাওয়ানোর দায়িত্ব গৃহস্বামীর উপর ছেড়ে দাও। তিনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। তবে অতিথিদের অনাদর হবে না এইটুকু জেনে রাখ।

—ব্যস্, ব্যস্। এই আশ্বাসটুকুই যথেষ্ট। মীতা তুই কাল ভোরেই কিন্তু ওদের বাড়ি গিয়ে বলে আসবি। সকাল সকাল আমরা নলিনীর ওখানে চলে যাব।

: মীতাকে আবার যেতে হবে কেন! আমরাই এখানে চলে আসব। বললে, বনশ্রী!

নলিনী বসু স-সংকোচে জানতে চাইল। আপনার বাবাকে কি আমি আজ বলে যাব?

: না, না তার দরকার হবে না। আমরাই বাবাকে বলব।

—দেখবেন, তিনি কিছু মনে করবেন না তো? বিস্ময় ভরা নলিনী বসুর প্রশ্ন।

: মনে করার কি আছে! তাছাড়া ঐ সব বিষয়ে বাবা অত্যন্ত

সামাজিক। কোনরকম সংস্কার তাঁর নেই। উদার মনোভাবের মানুষ উনি।

—তা সেদিন ওঁর সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পেরেছি। বড় ভাল লেগেছে আপনার বাবাকে। আর একদিন আসব। অভিজ্ঞ মানুষ, ওঁর কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

নাম করা একজন দারোগার মুখে পিতার প্রশংসা শুনে, দুই বোনের সুন্দর মুখাবয়বে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। দু'জোড়া চোখেও উজ্জ্বল জ্যোতির আলোয় উদ্ভাসিত আনন্দরেখা। নির্বাক দুটি প্রাণ। স্পন্দিত যৌবন ভারাক্রান্তা তাদের হৃদয়। ওষ্ঠে মৃদু মধুর হাসির স্পর্শ। অন্তরে কিসের যেন গভীর অনুভূতি।

মীতার চোখ মুখের ভাব হঠাৎ কেন যেন বদলে গেল। অন্তরে ঈর্ষা, বাইরে অন্য রূপ। কিন্তু বাক্যবিন্যাসে বান্ধবীর প্রতি গভীর অনুরাগ। তাই সে প্রথম জোয়ারের স্রোতের মতন এক নিঃশ্বাসে বলে গেল, তাহলে এই ঠিক রইল বনশ্রী। তোরা সকাল সাতটার মধ্যে তৈরী হয়ে আসবি। এখান থেকে সাইকেল রিক্সায় আমরা যাব।

—সাইকেল রিক্সায় কেন? আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব।

নলিনীর মুখে গাড়ির কথা শুনে তনুশ্রী চমকে উঠল। সে বলল, থানার জাল দেওয়া গাড়ি পাঠাবেন! আমি কিন্তু ঐ গাড়িতে যাব না!

তনুশ্রীর মন্তব্য শুনে হেসে ফেলল নলিনী দারোগা। হাসতে-হাসতেই সে জবাব দিল, ভয় নেই, থানার গাড়ি পাঠাব না। তবে জীপ গাড়িতে আপত্তি নেই তো?

বন্ধুর কথার পর তনুশ্রীর অবস্থা দেখে শরদিন্দু হাসিতে ফেটে পড়ল। ওর হাস্যরোলে চোখ পাকিয়ে তাকাল সেই দুরন্ত মেয়েটি। যে সব সময়েই শরদিন্দুর উপর খড়্গধারিণী, সুযোগ পেলেই বাক্যবাণে জর্জরিত করে ছাড়ে।

তনুশ্রীকে আর একবার চটিয়ে দেওয়ার জন্যই বোধহয় শরদিন্দু নলিনীকে বলল, তোমার সেই ব্যবসায়ী বন্ধুর ঝড়্-ঝড়ে জীপখানা পাঠাবে? ও জীপে চড়ে অতটা রাস্তা যেতে, ছোড়দির জিব বেরিয়ে যাবে কিন্তু! তার চেয়ে বরং অন্য কারও একখানা ভাল গাড়ির ব্যবস্থা যদি কর, তাহলে ভাল হয়। মানে পক্ষীরাজ—!

আবার ফোঁস করে উঠল মেয়েটি। হাত-মুখ নেড়ে বলতে লাগল, নিজে পক্ষীরাজে চড়ে উড়ে যাবার চেষ্টা করছেন, তাই অন্যান্য সকলকেও পক্ষীরাজে চড়াবার স্বপ্ন দেখছেন! সেটি হবেনা মশাই।

তনুশ্রীর বাচনভঙ্গীতে হাসির বন্যায় গা ভাসিয়ে দিল সবাই। নলিনী বসুও সেই ফাঁকে হাত ঘড়িটার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে ফেলল, আজ তাহলে উঠতে হয় শরদিন্দু! কাল তোমরা সকাল-সকালই যাওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু। তোমাদের জন্য আমি অপেক্ষা করব।

জ্যোৎস্নায় ভরা শূন্য নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে নলিনী বসু আজ অনেক কথাই ভাবছিল। তার মনে হচ্ছিল এই স্বচ্ছ নীলাকাশের বুকে টুকরো টুকরো মেঘরাশি সঞ্চিত হয়েই বর্ষা নামে। মেঘে-মেঘে সংঘাতের ফলে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। যার আলোর ঝিলিকে চোখ ঝলসে যায়! ভয় লাগে। হঠাৎ গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল থানার পেটা ঘড়ি ঢং, ঢং।

তন্দ্রায় চোখ জড়িয়ে আসে নলিনীর। আস্তে আস্তে সে ঘুমিয়ে পড়ে। অবচেতন মনের কামনা, বাসনা—স্বপ্ন হয়ে মুদিত নয়নের মধ্যে ভেসে ওঠে। সুখ নিদ্রা আরও যেন সুখময় করে তোলে। যার সুখানুভূতি রাতের গভীরতায় ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতম হয়ে উঠতে থাকে। তারই ফাঁকে কখন যে নলিনীর মুখ দিয়ে বোবা কান্না বেরিয়ে আসে তা' সে বুঝতেই পারে না। একটানা সেই বোবা কান্নার সুর। বড় করুণ তার ধ্বনি!

—দাদাবাবু! দাদাবাবু! দয়াল ঠাকুর প্রাণপণে ডাকতে থাকে। একবার সে গায়ে হাতও দেয় নলিনীর।

দয়াল ঠাকুরের চেঁচামেচিতেই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল নলিনী দারোগার। ধড়ফড় করে উঠে বসল সে। দু'হাতে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে জানতে চাইল, কি হয়েছে? অত চেঁচাচ্ছ কেন!

—বোবায় ধরেছিল আপনাকে! অনেকক্ষণ গোঁ গোঁ করছিলেন আপনি। ভয়ে আমি পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করেছি। কোন স্বপ্ন দেখে অমন করছিলেন বোধ হয়?

: স্বপ্ন! তা হবে হয়ত! আমায় তো কোনদিন বোবায় ধরেনা দয়াল! আজ এমন হল কেন?

—শোবার সময় কিছু ভাবতে, ভাবতে ঘুমিয়েছেন। তাই অমন হয়েছে। আমারও মাঝে-মাঝে অমন হয়।

: তোমারও এমন হয়! কেন তুমিও কিছু ভাব নাকি?

—তা' একটু-আধটু ভাবি বৈকি! সংসারী মানুষ তো।

: কি ভাব বল দেখি। সংসারের কথা ছাড়া অন্য কিছু তোমার ভাবনার কি আছে শুনি?

—কত কথা ভাবি, তার কি কোন ঠিক্ আছে! যেমন আজ আপনার ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে, অনেক কথাই ভাবছিলাম! ভাবছিলাম ঘরে যদি বৌদিমণি থাকতেন, তাহলে কি এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতে পারতেন! না-কি অসময়ে আপনাকে তিনি খাওয়া-দাওয়া করতে দিতেন।

দয়াল ঠাকুরের প্রাণের কথাটা শুনে হাসতে লাগল নলিনী বসু। একটু ঠাট্টা করেই সে দয়ালকে শোনাল, দাঁড়াও শিগ্গির-ই তোমার বৌদিমণিকে আনার ব্যবস্থা করছি। আপাততঃ কাল সকালেই তুমি হাটে গিয়ে ভাল মাছ, তরি-তরকারী কিনে আনবে। শরদিন্দুর মা, আর তিন দিদিমণি আসবেন। তাঁরা সারাদিন এখানে থাকবেন। সকলেই খাবেন। তাঁদের সকলকে তুমি আদর যত্ন করবে। বুঝলে, অতিথিদের যেন কোন রকম কষ্ট না হয়।

রাত পোহাতেই দয়ালকে হাটের টাকা দিয়ে বার বার নলিনী বসু বলে দিল, যে কোন ভাল মাছ একটা বড় দেখে আনবে! পাকা রুই না পেলে, বড় দুটো ইলিস এনো। তরকারী বুঝে কিনবে। আসার সময় মিষ্টি মহল থেকে একখানা দই, আর ভাল দু' তিন রকমের মিষ্টি নিয়ে আসবে। এই নাও ত্রিশটা টাকা। এতেই বোধহয় হয়ে যাবে। না হলে মিষ্টি মহলের দাম বাকি থাকবে, পরে আমি পাঠিয়ে দেব, বুঝলে?

—আজ্ঞে বুঝেছি।

: বেশী দেরী করবে না। সকাল সকাল ফিরেই উনুনে আগুন দিতে হবে। বারোটার মধ্যে সবাইকে খাওয়ান চাই কিন্তু।

দাদাবাবুর মেজাজ দেখে দয়ালঠাকুর বেশ হকচকিয়ে গেল। ব্যাপার কি! হঠাৎ এমন কোন অতিথি দল বেঁধে আসছেন, যাঁদের জন্য এত খরচ! এত খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। বেলা বারোটার মধ্যে আবার

তাঁদের খাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। তাহলে কি কাল রাতে দাদাবাবু যা' বলল তাই সত্যি! এতদিনে মত বদলাল! ঘরে লক্ষ্মী এলে আমি বাঁচি। দিন কয়েকের জন্ম এবার দেশ থেকে ঘুরে আসব। কতদিন দেশে যাই না! দিন কয়েক আগে ছেলেটাকে দিয়ে বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। বাড়ির সকলে কেমন আছে কে জানে! কেউ কোন চিঠি-পত্তর পর্যন্ত দিচ্ছে না। জিনিস পত্তরের যা দাম বেড়েছে, তাতে দু'বেলা খেতে পাচ্ছে কিনা তার ঠিক নেই!

আপন মনে আকাশ-পাতাল ভাবতে-ভাবতে দয়ালঠাকুর হাটে চলে যাওয়ার পর, নলিনীর খেয়াল হল ঘরের জিনিসগুলো এলোমেলো হয়ে আছে, ওরা আসার আগেই সব গুছিয়ে রাখা দরকার। দেখতে বড় খারাপ লাগছে। দেখে সেই দুরন্ত মেয়েটি কি বলে বসবে, তার ঠিক নেই! যা' সাংঘাতিক মেয়ে! মেয়ে নয়ত কাঁকড়া বিছে! হুল উঁচিয়েই থাকে সর্বক্ষণ।

দুরন্ত মেয়েটিকে নিয়েই সকলের যত রাজ্যের ভাবনা! জাঁদরেল দারোগা মশাইরও তাকেই ভয়। বড় ঠোঁট কাটা মেয়ে কিনা তাই। অবশ্য মীতাও কোন অংশে কম নয়!

কথা প্রসঙ্গে নলিনী বসুর মীতার চরিত্র মনে উদয় হতেই, গত রাতের বোবা কান্নার ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলল। কারণ যে স্বপ্ন দেখে কাণ্ডটা ঘটেছিল, তার নায়িকাতো সেই। মীতা এসে কথাগুলো না বললে, আমার মুখ দিয়ে অস্ফুট কান্নার শব্দ শোনা যেতনা। দয়ালকে ঘুম থেকে উঠে এসে আমাকে ডাকাডাকি করতেও হত না!

স্বপ্নটার কথা চিন্তা করছিল নলিনী দারোগা। বড় অদ্ভুত ঘটনা! তন্দ্রার ঘোরে সে দেখেছে, মীতা তাকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে বলল, ওদের দুই বোনের উপর এত দরদ কেন! কেন গাড়ি পাঠাতে রাজি হলেন? সাইকেল রিকসায় গেলে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত! ওরা জজসাহেবের মেয়ে বলে, দারোগা সাহেবের দরদটা যেন একটু বেশী মনে হচ্ছে। ও সব চলবেনা বলে দিচ্ছি। যদি বাড়াবাড়ি করতে দেখি, তা'হলে ভাল হবেনা বলে রাখছি।

মীতার বক্তব্য শেষ হতেই নলিনী দারোগা পিছন ফিরে দেখে, লণ্ঠন

হয়ে দরজার পাশে দাঁড়ান মীতার চোখে ঈর্ষার আগুন জ্বলছে। মুখখানা তার ঘন কাল মেঘে ঢাকা আকাশের মতন। মনে হয় এখনই শ্রাবণের ধারার মত দু' চোখ বেয়ে নেমে আসবে অশ্রু বন্যা! দমকা ঝড়ের আঘাতে ভেঙে পড়া পত্র পুষ্প শোভিত কদম্ব শাখার মতই তার ঐ যৌবন গর্বিতা দেহখানা, লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। তারপর কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদবে। সারাদিন উপবাস করে থাকবে।

তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েই মুখে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। তাকেই দয়ালঠাকুর বললে—বোবা কান্না। অর্থাৎ অপ্রকাশিত আর্তনাদ! হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠল নলিনী বসু। সে ভাবল ওসব কিছু নয়। আসলে মীতার চরিত্র পর্যালোচনা করতে গিয়েই তার এই চিত্তের আলোড়ন। অবশ্য মীতা-প্রভাব বিস্তারের যে চেষ্টা করে যাচ্ছে, তারও প্রতিক্রিয়া কিছুটা রয়েছে স্বপ্নের মধ্যে, কিন্তু জজসাহেবের মেয়েদের নিয়ে ওর এত দুর্ভাবনা কেন? ও কেনই বা স্বপ্নে বলল, ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে সে আত্মহত্যা—! চিন্তার গতি অন্য দিকে ঘুরে গেল নলিনী বসুর। ঝি এসে কাজ আরম্ভ করল। ঘরটা গোছাবার নির্দেশ দিয়ে সে সিগারেট ধরাল।

সিগারেটের ধোঁয়ার মতই মনের ভাবনাগুলো উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছিল নলিনী দারোগা। কিন্তু কিছুতেই সে তা' পারল না। আত্মহত্যা করার হুমকিতে মনটা বোধ হয় চঞ্চল হয়ে পড়েছিল, তাই চিন্তার গতি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। সহসা তার মনে পড়ে গেল একজন বিখ্যাত সমাজ-ও মনোবিজ্ঞানীর লেখা কয়েক পংক্তি মূল্যবান মন্তব্য,

মানুষ পাগল হয়। অনেকে আত্মহত্যাও করে! কিন্তু কেন মানুষ পাগল হয়, কেনই বা মানুষ আত্মহত্যা করে তা ভেবে দেখেছ। সন্ধান করেছ, কি কারণে তারা পাগল হল, কিংবা কেন সে আত্মহত্যা করল! এই দুটি বিষয়ে অনুসন্ধান করলে জানতে পারবে সমাজ ও মানুষের অনেক গোপন কথা। শুনতে প বে তাদের জীবন-কাহিনী। তখন কাঁদা অপেক্ষা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মূল রহস্য দূর করার চেষ্টা করতে পারলে একটা কাজের মত কাজ করা হবে। সমাজের তাতে উপকার ছাড়া অপকার হবে না।

যেমন মানুষের চিন্তা ও ভাবনার সঙ্গে ঘড়ির কাঁটার কোন সম্পর্ক নেই। যে যার আপন পথে মন্থর বেগে এগিয়ে চলে। কারও সময়ের অপেক্ষায়

তারা কেউ বসে থাকেনা! তাদের লক্ষ্য পথ নির্দিষ্ট নেই বলে, গতিরও কোন হেরফের হয় না। তেমনি সকাল থেকে নলিনী বসু নিত্য-নৈমিত্তিক কাজগুলো সারবার আগেই, দয়াল ঠাকুর তার হাটের কাজ সমাধা করে ফিরে এসেছে! আজ যেন সে অন্যান্য দিনের তুলনায় খুব তাড়াতাড়ি হাট সেরে ফিরেছে! বাড়ির ঝিরও তাই মনে হ'ল। সে বেশ ভাল ভাবে লক্ষ্য করল, আজ যেন ঠাকুর মশাইর কাজ করার উৎসাহটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। মনটাও আনন্দে ভরপুর।

ভোর থেকে জজসাহেবের বাড়িতেও একটা আনন্দের জোয়ার বইছিল। বিশেষ করে তনুশ্রী, দিদিকে ব্যস্ত করে তুলেছিল, তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ কর্ম সেরে নেওয়ার জন্য। কারণ দারোগা-সাহেবের গাড়ি আসার আগেই তাদের তৈরী হয়ে নিতে হবে। নইলে মীতুদি অসন্তুষ্ট হতে পারে। তাঁর দাদা আবার ভীষণ ব্যস্ত বাগীশ মানুষ! দিদি ওঁকে দেখলে কেমন যেন হয়ে পড়ে। নিজেকে সামলাতে গিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে ফেলে। তারপর মীতুদি থাকলে, দিদিকে আরও পাগল করে তোলে! বুঝিনা ওদের কাণ্ড! যত সব—।

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এবং প্রাচীন লোকায়ত দর্শনে উল্লেখ আছে, ভয় থেকেই মানব মনে সৃষ্টি হয়েছে ভক্তি। সেই ভক্তির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে কত লোক কত কথা বলেছেন তার ঠিক নেই! অলৌকিক তথ্য প্রচার করে অনেক ক্ষেত্রে ভক্তদের আকর্ষণ বৃদ্ধির কাহিনী সেকালেও যেমন জনসাধারণের মুখে মুখে ঘুরত, একালেও তার অভাব আছে বলে মনে হয় না। ঠিক তেমনি নলিনী দারোগার অতি কর্ম-কুশলতার নানা রোমাঞ্চকর গল্প মীতার কাছে শুনে-শুনে, বনশ্রীও তার ছোটবোনের একদিকে যেমন ভয় লাগে, তেমনি অপর দিকে লোকটির উপর বেশ কিছুটা ভক্তি এসেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ পেল মীতা, সকালে দুই বোনকে দেখেই।

গন্তব্যস্থল কিংবা দর্শক শ্রেণীর কথা চিন্তা করে, মেয়েদের সাজ-পোষাকের বৈচিত্র্য প্রাধান্য পায়, দুর্মুখ ব্যক্তিরা প্রায় হামেশাই একথা বলে থাকেন। মীতাও বান্ধবীকে এই ধরনেরই কিছু বলার জন্য বোধহয় ওৎ পেতে ছিল। কিন্তু বেচারাকে হতাশ হতে হল ওদের অতি সাধারণ

পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে। বরং বনশ্রী উল্‌টে মীতার রূপ সজ্জা লক্ষ্য করে বলল, 'সখি! কি আর বলিব তোরে। নয়নের কাজল—!'

মীতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরনের শাড়ির ভাঁজ ঠিক করে নিচ্ছিল। বনশ্রীর রসিকতায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, এই থাম। এখনই মা এসে পড়বে!

বান্ধবীর ধমকে বনশ্রীর মুখ সাময়িক বন্ধ হলেও মন গুণ গুণ করে উঠতে চাইল। মীতার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে কিছু বলার চেষ্টা করতেই, শরদিন্দু হাঁক ছাড়ল—মীতু তোদের হল? নলিনীর গাড়ি এসে গেছে। মাকে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে বল।

দারোগা সাহেবের গাড়ি এসেছে শুনেই তনুশ্রী চঞ্চল হয়ে পড়ল। জানলার ফাঁক দিয়ে বার কয়েক উঁকি দিতেও ছাড়ল না। সেই সঙ্গে সকলকে শুনিয়ে দিল, বেলা কিন্তু প্রায় ন'টা বাজল! রোদ বেশী উঠে গেলে ফুলগুলো শুকিয়ে যাবে।

জীবনের প্রথম যা কিছু ঘটে তার গভীরতা অনেক। তাই তনুশ্রীর চিত্ত চাঞ্চল্য বৃদ্ধির কারণ অনুমান করে, মীতার হঠাৎ কেন যেন সন্দেহ হল। ওর কথাবার্তা শুনে মনটাও কিঞ্চিৎ অন্য ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে চাইছিল। ভয় যে হচ্ছিল না তাও নয়। তনুশ্রীকে নলিনীর সঙ্গে নির্ভয়ে আলাপ করতে দেখে সুমিত্রা দেবীও প্রমাদ গুনেছিলেন। অবশ্য তার যথেষ্ট কারণ তিনি চিন্তা করছিলেন। মেয়েদের মনে অতি সহজেই যে চিন্তা এসে থাকে। মীতার মায়ের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটল না!

মীতার চাইতে তনুশ্রী সুন্দরী, বয়সও কম। চালাক-চতুর এবং আকর্ষণীয় দেহের গঠন। লেখাপড়ায় অতুলনীয়া। সুতরাং—!

থানায় অনেক কাজ জমে গেছে বড়বাবুর। তাই নলিনী বসু বাড়িতে অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন এর সুব্যবস্থা করে দিয়ে থানায় আসতেই, সহকর্মী অফিসাররা অভিবাদন জানিয়ে বলে গেল, স্যার, শুভস্য শীঘ্রম্। অশুভস্য কালহরণম্। দু' এক দিনের মধ্যেই তাহলে আমাদের ভোজটা হয়ে যাক। দেরী করে কাজ নেই!

সহকর্মীদের হঠাৎ এ' জাতীয় মন্তব্য প্রকাশে বড়বাবু বেশ হকচকিয়ে গেল। সে ভাবল, এই মাত্র তাঁর বাড়িতে অতিথিদের আসতে দেখে

বোধ হয় অফিসাররা একটা কিছু অনুমান করে নিয়েছেন! কারণ তাঁর বাসায় অতিথিদের এই ভাবে আগমন বড় দেখা যায় না। তার উপর সুসজ্জিতা তরুণী একজন নয়, তিন-তিন জন! দয়াল ঠাকুরকে ভোরে হাট করে আনতেও সকলে দেখেছেন। তাই হয়ত ব্যাপারটা সকলের গোলমেলে ঠেকছে! যাই হোক বিষয়টা পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্যই নলিনী বসু কিছু বলতে যাবে, এমন সময়ে সত্যেনবাবু এসে বললেন, স্যার, কাল গেজেটে খবরটা দেখে খুব খুশী হয়েছি। সময়টা সত্যিই আপনার এখন ভাল। প্রমোশন এবং মনের মতন বিভাগে বদলী, শুভগ্রহ অনুকূল না থাকলে কারও হতে পারে না! খবরটা পেয়ে সকলেই আনন্দিত। থানার সকলেই আপনার এই শুভ সংবাদে যেমন অভিভূত, তেমনি মনঃকষ্টে সবাই বিচলিত। সকলের মুখেই এককথা এমন বড়বাবু আমরা আর বোধ হয় পাবনা!

সত্যেন বাবু থামলেন। একবার নিজের হাতের রেখা গুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার কিছু বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বড়বাবুর মুখের দিকে চোখ পড়তেই চুপ করে গেলেন। কোন কথা বলতে পারলেন না।

ভদ্রলোকের কথা শুনে এবং হাবভাব দেখে নলিনী বসু মৃদু হেসে বলল, আপনি হাত দেখা, গ্রহের শুভাশুভ বিচার তাহলে বিশ্বাস করেন?

আজকাল জ্যোতিষী ও রত্ন-ধারণ খুব জনপ্রিয় হয়েছে। আসলে সবই বিশ্বাস—!

—বিশ্বাস একটু-আধটু করি বৈকি বড়বাবু। মানব-জীবনে গ্রহের প্রভাব আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই আপনার প্রমোশনের ব্যাপারটাই চিন্তা করে দেখুন। সার্ভিস রেকর্ড অনুযায়ী অনেক আগেই আপনার পদোন্নতি হওয়ার কথা! কিন্তু হতে পারে নি। অর্থাৎ এতদিন বোধ হয় গ্রহ অনুকূল ছিল না। এবার নিশ্চয়ই সময় ভাল এসেছে। দেখুন একসঙ্গে দুটো সুখবর পেলেন। আরও হয়ত শুভ যোগাযোগ ঘটবে। লটারীর টিকিট কিনুন, লেগে যেতে পারে স্যার।

: কার শুভ যোগাযোগ ঘটাচ্ছেন সত্যেন বাবু?

—আরে আপনি! কখন এলেন? বিস্ময় ভরা সত্যেন বাবুর প্রশ্ন বড়বাবুর বন্ধুর কাছে।

: এই কিছুক্ষণ আগে এসেছি আমরা।

শরদিন্দুর জবাবের শেষ বাক্যটিতে আরও বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেল সত্যেনবাবুর। তিনি আপন মনেই বলে ফেললেন, আমরা মানে! শুভ সংবাদ পেয়ে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন বোধ হয়? আমিও বড়বাবুকে এই মাত্র শুভেচ্ছা জানিয়ে বললাম, সময়টা আপনার খুব ভাল পড়েছে স্যার। দেখবেন এবার আরও শুভ যোগাযোগ ঘটবে!

সত্যেন বাবু অনর্গল অনেক কথাই বলে গেলেন। দুই বন্ধু কিন্তু নির্বাক। বিলম্বে আসায় শরদিন্দু তাঁর বক্তব্যের সঠিক মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে, নলিনী বসুর দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। বন্ধুর সংবাদ জানার আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে নলিনী হাসতে লাগল।

বড়বাবুর সুপরিচিত হাস্যধ্বনি শুনে পাশের ঘর থেকে টাউনবাবু এসে অভিবাদন জানিয়ে স্থীর ভাবে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন স্যার। আপনি রিসার্চ বুরোর ডি, আই, ও, হয়ে চলে যাচ্ছেন শুনে, টাউনের অনেক লোক আমাকে বলছিলেন, তাঁরা বিকেলে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে আসবেন।

এতক্ষণ পরে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হল শরদিন্দুর কাছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাই, মা এবং মীতাদের এখনই সুখবরটা দিয়ে আসি নলিনী। ওরা সংবাদটা পেয়ে খুব খুশী হবে।

পদোন্নতির সংবাদে নলিনী বসুও খুশী। তবে সে নব প্রবর্তিত রিসার্চ বুরোয় জেলা অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণের চিন্তায় মনে কেন যেন উদ্বেগ বোধ করছে। কারণ রাজ্যের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনশীল! তার উপর বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার এবং দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির চাপে সর্বত্র মানুষের মধ্যে রয়েছে একটা চাপা অসন্তোষ। বেকার সমস্যায় সকল স্তরের জনগণ ক্ষুব্ধ। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, আজ শিক্ষা, অর্থনৈতিক, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধিজনিত এবং রাজনৈতিক সমস্যা। যার ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নিত্য নতুন জটিল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্র। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থায় কঠোরতার চেষ্টা চলছে।

সাধারণ মানুষ এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করতে পারেনা। তাঁরা জীবন

ও জীবিকার সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত। তাঁদের সারা দেহ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। এই অশুভ অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। অথচ বাঁচার আ প্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সকলে। নিষ্ঠা, সততার কথা শুনতে কানে এখন পর্যন্ত লোকে কানে আঙুল দিচ্ছে না বটে, তবে মনে মনে হাসতে আরম্ভ করেছেন অনেকে, অল্পদিনের মধ্যে হয়ত তাঁরা ঐ নিয়ে পরিহাস আরম্ভ করবেন।

এ' অবস্থায় নব প্রবর্তিত রিসার্চ বুরোয় ডি. আই. ও,র দায়িত্ব গ্রহণ করে নলিনীর সুনামের ব্যাঘাত ঘটবে কিনা, এখন সেই চিন্তাই তাকে করতে হচ্ছে। কারণ পুলিশে চাকরী করলেও এখন পর্যন্ত তার মনটা অত্যন্ত সহজ, সরল রয়ে গেছে।

নলিনী বসু, অজাত শত্রু হতে পারেনি এখনও। সম্প্রতি শত্রু বৃদ্ধির পূর্বাভাষ পেয়ে সে কিছুটা বিব্রত বোধও করছে। সত্যেনবাবু যতই শুভ সময়ের কথা বলুন না কেন, অশুভ প্রভাবের চিন্তায় তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কারণ প্রবাদ আছে—'শনির দশা, রাহুর শেষ। প্রাণে না মারে ছাড়ায় দেশ'! এখন বোধ হয় নলিনীর সেই পর্যায় এসে পড়েছে। সদ্য এই পরিবর্তন কি তারই ইঙ্গিত বহন করে আনছে! না অন্য কিছু!

॥ সাত ॥

কর্মচঞ্চল আমাদের জীবন।

অনেক সময় ভুলে যাই, প্রায় সব কিছুর পিছনে ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিগত জীবনের একটা বিশেষ প্রভাব আছে। যেখানে প্রত্যেক মানুষের সুখ দুঃখ, ব্যথা, বেদনার অন্তরালে হাসি ও কান্না যেমন থাকে, তেমনি আনন্দ-অনুভূতির পরশে তাদের অন্তর কখন বিচলিত কখনও বা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কারণ স্পর্শকাতর আমাদের সকলের জীবন ও মন। উত্তেজনায় অহরহ তার রূপান্তর ঘটে।

উত্তেজনার অনন্ত রূপ!

কবিরা তাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, কত না কল্পনার জাল বুনে আনন্দ পেতে চান। সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন নতুন কিছু। অফুরন্ত শব্দ ভাণ্ডার থেকে শত শত শব্দ চয়ন, তারপর তাদের পর পর সাজিয়ে ছন্দের মাধুর্যে মন প্রাণ ভরিয়ে তোলেন ভাষার অপূর্ব সুষমায়। শুধু কাব্য কেন, সাহিত্য সৃষ্টিতেই বা তার ব্যতিক্রম কোথায়? তবু যুগ যন্ত্রণার প্রতি-বেদন নিয়ে আমরা যত্র তত্র হৈ চৈ করি। কিন্তু চিন্তা করিনা। সর্বদা স্বার্থের কথা ভাবি।

বন্ধুর ব্যক্তিগত দিনলিপির পৃষ্ঠা একের পর এক উল্টে যাচ্ছিল শরদিন্দু। লেখকের অনুপস্থিতিতে তার লেখা পড়তে ভালই লাগছিল বোধহয়।

আচমকা সে কোয়ার্টারের ভিতর ঢুকে হাঁক ছাড়ল দয়াল, রান্নার কত দূর কি হল?

—দয়াল এখন বাসায় নেই। অন্যমনস্ক ভাবে নলিনীর প্রশ্নের উত্তর দেয় শরদিন্দু।

: কোথায় গেল সে?

—মা, আর বনশ্রীদের নিয়ে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে পুজো দিতে গেছে।

শরদিন্দুব সংক্ষিপ্ত জবাব শুনে থমকে দাঁড়াল নলিনী। ফুলের সুবাস পেয়ে ঘরের চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে ছোট্ট প্রশ্নটি রাখল, একি! ঘর এমন সুন্দর ফুল দিয়ে সাজাল কে!

নলিনীর কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নটা কানে যেতেই হেসে ফেলল শরদিন্দু। তার প্রাণ খোলা এই হাসির উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। প্রকারান্তরে সে জানিয়ে দিল, জজসাহেব নিজে তাকে এই ফুল উপহার পাঠিয়েছেন।

এই মাত্র সর্বমঙ্গলার মন্দির থেকে সবাই ফিরে এল। মীতা এসেই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, ভিড়ে মন্দিরে ঢুকতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে। পুরোহিত ঠাকুর নমঃ নমঃ করে পূজো সেরে দিলেন। অঞ্জলির মন্ত্রটাও ভাল উচ্চারণ করতে পারলেন না। তিনি শুধু দক্ষিণার টাকা আদায়ের জন্যই ব্যস্ত। পূজোর দিকে মন নেই। ভক্তিও নেই। এর চেয়ে—!

মেয়েকে ধমকে উঠলেন সুমিত্রাদেবী। তিনি বললেন, পুরোহিতের মন্ত্রতে কি যায় আসেরে! মনে ভক্তি থাকলেই হল। জানিস না, ঠাকুর বলেছেন—ভক্তিতেই মুক্তি! হৃদয়ে ভক্তি থাকলে বিনা মন্ত্রে ডাকলেও দেবতা তুষ্ট হন। তাঁর শুভ আশীর্বাদেই আমরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারি। তাই তো সকাল-সন্ধ্যায় তেত্রিশ কোটি দেবতাকে স্মরণ করি।

—দেখ মা, তোমার ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তুষ্টকরা চাট্টিখানি কথা নয়। আপাততঃ মা, সর্বমঙ্গলাকে তুষ্ট করে যে প্রসাদ এনেছ তাই দাও। প্রসাদ না খেয়ে কিছু মুখে দিলে তুমি আবার চেঁচামেচি শুরু করবে। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। আগে প্রসাদ দাও দেখি, খাই।

: এঁ্যা, তোমরা এখন পর্যন্ত কিছু খাওনি! দয়াল, শিগ্‌গির ওদের জন্য কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা কর। কি আশ্চর্য! না খেয়ে আছে সবাই অথচ কোন ব্যবস্থা কর নি।

—ওনারা পূজো না দিয়ে কিছু খাবেন না যে! তাইতো তাড়াতাড়ি মন্দিরে নিয়ে গেছলাম।

: তা, বেশ করেছ। জলখাবার কি তৈরী করেছ দাও। শরদিন্দু তোমরা হাত মুখ ধুয়ে নাও।

নলিনী অসন্তুষ্ট হয়েছে বুঝতে পেরে, সুমিত্রাদেবী শান্ত গলায় বললেন, দয়ালকে অযথা বকছো কেন বাবা। আমরা বাড়ি থেকেই ঠিক করে এসেছি, আগে সর্বমঙ্গলার পুজো দেব, তারপর খাওয়া-দাওয়া।

: ঠাকুর দেবতাকে আমিও ভক্তি করি। তবে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে—।

—না না, এতে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হয়নি। আসলে কি জান বাবা,

উপবাসী না থাকলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না। স্থির চিত্তে ছাড়া কি দেবস্থানে যাওয়া যায়? মন চঞ্চল থাকলে ভক্তি আসে না।

মায়ের কথার উপর এবার শরদিন্দু ফস্ করে বলে ফেলল, পেটে খিদে থাকলে চিত্ত স্থির কি করে থাকবে বল। সে চঞ্চল হতে বাধ্য।

—তোর যত অনাসৃষ্টির কথা। নে, প্রসাদ আর আশীর্বাদ নে। নলিনী তুমিও নাও বাবা। তোমার কল্যাণে আলাদা পুজো দিয়ে এসেছি। অমন শুভ সংবাদ পেলাম, মাকে পুজো দেব না?

: শুধু পুজো নাকি। ষোল আনার ভোগ দিয়েও এসেছি। আমাদের সঙ্গে আপনি গেলে অঞ্জলি দিয়ে আসতে পারতেন। একদিন যাবেন। মাকে দর্শন করে আসবেন। শুনেছি খুব জাগ্রত দেবতা এই সর্বমঙ্গলা।

মীতা ও বনশ্রীর ভক্তিপূর্ণ কথা শুনে চুপ করে রইল নলিনী। শুধু একবার শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। কোমরের বেল্টটা খুলে রেখে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

সবার অলক্ষ্যে তনুশ্রী, কখন রান্না ঘরে চলে গেছে তা কেউ খেয়াল করেনি। দয়ালের জলখাবার দেওয়ার পর, সে চায়ের পেয়ালাগুলো এনে টেবিলে রাখতেই শরদিন্দু লাফিয়ে উঠল, একেই বলে কাজের মেয়ে। কখন চা-প্রয়োজন ঠিক খেয়াল রেখেছে। ধন্যবাদ দিতে হলে ওকেই দিতে হয়, কি বল নলিনী?

মীতা দাদার উচ্ছ্বাসে বিরক্ত হয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। সুমিত্রা দেবীর মুখখানাতে নেমে এল ঘন অন্ধকার। মা ও মেয়ের আকস্মিক পরিবর্তন নলিনী বন্ধুর দৃষ্টি এড়াতে পারল না। সে পরিবেশ বুঝেই অন্য প্রসঙ্গ তুলে অতিথিদের মনকে হালকা করে দিতে চাইল। কারণ নলিনী বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা যত সামান্যই হোক না কেন, জল ঘোলা না করে ছাড়বে না। তার ফল খুব একটা ভালও হবে না। হয়ত জজসাহেবের মেয়েদের কেন্দ্র করেই ওদের দুই পরিবারের দীর্ঘদিনের মিত্রতা ভেঙে যাবে। তিক্ততা সৃষ্টি হবে নলিনীর সঙ্গে। শরদিন্দুর কল্পনাকাশে ঝড় উঠবে। ভেঙে চুরমার হয়েও যেতে পারে বন্ধুর সাংসারিক জীবন। সে দৃশ্য ভাবতেও ভয় হচ্ছে নলিনীর।

ঘটনার গতি শরদিন্দুর অজ্ঞাতেই অন্য দিকে চলে গেছে। অতি

তুচ্ছ সাধারণ ব্যাপারটা যে, দুই বান্ধবীর মধ্যে এই ভাবে একটা মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে, তা' কিন্তু বিচক্ষণ পুলিশ অফিসার নলিনী বসু আগেই বুঝতে পেরেছিল। তাই সে কাজের অছিলায় আবার থানায় চলে গেল।

শরদিন্দু বন্ধুর লেখা দিনলিপির পৃষ্ঠা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে বলে উঠল, বাঃ খুব সুন্দর লিখেছে। বুঝলে মা, সেই উকিল পাড়ার গল্পটা কি চমৎকার নলিনী লিখেছে শুনবে ?

উকিল পাড়ার অসমাপ্ত কাহিনী শোনার আগ্রহ তখন সুমিত্রা দেবীর ছিল না। শরদিন্দু তা সত্বেও লেখাটা একমনে পড়ে শোনাতে লাগল, উদ্দেশ্য হয়ত মাকে শোনানোর অজুহাতে অন্য সকলকে শোনানো।

সংসার চালাবার জন্য অল্প বয়সেই সামান্য মূলধন নিয়ে প্রথম ব্যবসাটা আরম্ভ করেছিল অশোক! সে, কলকাতায় ফেরি করে সাবান বিক্রি করত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ছয় ঋতুর বার মাস তাকে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে সাবান বেচে ক্ষুধার অন্নের সংস্থান করতে হ'ত। দেশে বুড়ো বাপ-মার খরচ চালাত। মাস গেলে সে আয় নেহাৎ মন্দ ক'রত না।

সে, একদিন গ্রীষ্মের দারুণ নিদাঘে উত্তপ্ত পিচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছিল, চাই-ভাল গায়ে মাখা, কাপড় কাচা সাবান। চাই ভাল-ভাল সাবান। সাবান নেবেন,- সা—বা—ন।

অপরাহ্ন বেলায় এক বস্তীর শেষ প্রান্তের মাঠ কোঠা বাড়ি থেকে নারী কণ্ঠে ডাক এল, এই সাবানওয়ালা এ'দিকে এস।

অনেক আশা নিয়ে খরিদ্দারের ডাকে সেই বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল অশোক। হঠাৎ কত গুলো চেনা মুখ দেখে লজ্জায় নিজের চোখ দুটোকে ঘুরিয়ে নিতে হ'ল তাকে। তারপর সাবানের বাক্সগুলো খুলতে-খুলতেই বলল, কি সাবান দেব দিদিমনি!

তরুণী ক্রেতার রঙিন ঠোঁট দু'খানি মৃদু নড়ে, এক ঝলক হাসির শব্দ বেরিয়ে এল প্রথম, সেই হাসির পর বেশ তির্যক সুর মাখান আসে প্রশ্নটা।

—ভাল গায়ে মাখা সাবান আছে ?

মেয়েটিকে চিনতে পেরেছিল অশোক। তাই তার হাসি দেখে বিরক্ত হয়েছিল সে। চেনা কেউ যদি পেটের দায়ে ফেরিওয়ালার কাজ করে,

তাতে হাসবার কি আছে! সে তো করুণাভিক্ষা করতে আসেনি। এসেছে স্বাধীন ব্যবসা করতে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে এবার জানতে চাইল অশোক, কি রকম দামের সাবান দেখাব বলুন?

—একটু বেশী দামেরই দেখাওনা।

শেষ সম্বোধনটা অশোকের আত্মসম্মানে আঘাত করলেও, সে নীরবে সাবানের বাক্স গুলো পর পর খুলে দেখাতে লাগল। কারণ আজ পেটের দায়ে ভদ্রলোকের ছেলে সাবানের ফেরিওয়ালা। সম্মানের কথা চিন্তা করলে তার চলবেনা। তাছাড়া ব্যবসা করতে হলে চক্ষু লজ্জা ত্যাগ করতেই হবে। নইলে ব্যবসা করা যাবে না।

সাবানের বাক্স গুলো পর পর খুলে দেখাচ্ছিল অশোক। সেই সঙ্গে কোন সাবানের বৈশিষ্ট্য কি তাও বলে যাচ্ছিল। তার কথা শেষ হতেই উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণীটি, এক রকম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলে উঠল, এর চাইতে ভাল সাবান নেই!

—আজ্ঞে, এই গুলো সবই নামী এবং দামী সাবান!

: তা'হলেও দেশী কোম্পানীর সাবান যে! দেশীর চাইতে বিলিতি জিনিস অনেক ভাল, বিলিতি সাবান নেই?

কথাটা কানে যেতেই অশোক মুখ তুলে তাকাল। চোখে তার বিরক্ত এবং ঘৃণার ছাপ। মনে কিছুটা উত্তেজনার ভাব এসে পড়ায় চুপ করে বাক্স গুলো গুছিয়ে নিতে লাগল।

অশোকের নির্বাক আচরণে তরুণীর মনে হঠাৎ কিসের যেন একটা অনুভূতি জাগে। চঞ্চল আঁখি দুটিতে আরও চঞ্চলতা প্রকাশ পায়। ঠিক সেই মুহূর্তে বাতাসে সরে যাওয়া উন্নত বক্ষের কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে বলে. ঐ নিম সোপ এর দাম কত বললে যেন?

—চার আনা। অতি বিনয় সহকারেই দামটা জানায় অশোক।

: চার আনা! কেন কিছু কমে দেবে না?

—আজ্ঞে চার আনাই এর বাজার দর।

: বাজার দরে তোমার কাছ থেকে কিনব কেন! ফেরিওয়ালারা

বাজারের চাইতে কম দামেই সব জিনিস বিক্রি করে। ঠিক কততে সাবানটা দিতে পারবে বল?

—আজ্ঞে, আমার জিনিসের এক দাম। একদামেই সাবান বিক্রি করি।

বিদ্রুপাত্মক হাসির সঙ্গে মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বলে ফেলে, ফেরিওয়ালার জিনিসের আবার এক দাম হয় নাকি!

ঠিক বিষাক্ত তীরের মতই বাক্যবানটা এসে আঘাত করল অশোকের অন্তরে। তখনই সে কথাটার জবাব দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে ধীর কণ্ঠে বলল, দিদিমণি! এক কোম্পানীর জিনিস কি, দু' রকম দরে বিক্রি করা যায়?

অনেকটা সময় নষ্ট করাল মেয়েটি! এতক্ষণ অন্য পথে ঘুরলে অশোকের হয়ত কিছু বিক্রি হ'ত। পথ চলতে-চলতে কত কথাই যে বেচারার মনে হ'ল তার ঠিক নেই। বিশেষ করে ফেরিওয়ালাদের প্রতি কেন মানুষের এ'হেন ব্যবহার! সেই প্রশ্ন আজ যেন তাকে বড় ব্যাকুল করে তুলেছে। তবু সে ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ নিয়ে পথ চলে। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব উচ্চে তুলে হাঁক ছাড়ে। এমনি করেই দিনের পর দিন অশোক দেশী সাবান বিক্রি করে। স্বদেশী জিনিস বিক্রি করার দিকে তার ভীষণ ঝোঁক।

গল্পটা এই পর্যন্ত পড়ে হঠাৎ শরদিন্দু থামতেই, সুমিত্রা দেবী বলে উঠলেন, তারপর? তারপর?

ঠিক একই রকম উত্তেজিত প্রশ্ন অন্যান্য সকলের তা' বুঝতে পারল শরদিন্দু। তাই সে আবার সোৎসাহে পড়তে আরম্ভ করল, নলিনীর লেখা উকিল পাড়ার সেই আকর্ষণীয় গল্প। যার একমাত্র নায়ক, জীবন সংগ্রামের একজন বাঙালী সৈনিক—অশোক কুমার ভট্টাচার্য।

ভাগ্যের পরিহাসের কথাই আজ চিন্তা করছিল অশোক। এতদিন সে শুধু অন্ধকারের মধ্যেই ভাগ্যান্বেষণের পথ খুঁজে বেড়িয়েছে, কিন্তু পায়নি। অতি কষ্টে ফেরিওয়ালার কাজ করে কোন রকমে দু'বেলা দু'মুঠো ক্ষুধার অন্ন জুটিয়েছে। কায়ক্লেশে দিন কাটালেও তার ব্যবসায়ী মন উচ্চাকাঙ্খা ত্যাগ করেনি। কিন্তু কি করে সে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে! কে তাকে সাহায্য করবে! সমাজে তার স্থান কোথায়! কি-ই বা তার

জীবনের মূল্য? সেতো একজন ফেরিওয়ালা! অবহেলা ছাড়া মানুষের কাছ থেকে আজ পর্যন্ত সেতো কিছুই পায়নি!

কিছু না পাওয়ার দুঃখ অশোকের আদৌ নেই। জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করে সে দেখেছে। সমাজে মানুষের অবহেলাই তাকে আত্ম-সচেতন করে তুলেছে, সেই সচেতনতাকে মূলধন করেই সে এগিয়ে চলেছে জীবনের লক্ষ্যপথে। ব্যবসা করে তাকে বড় হতে হবে, এই তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

ফেরিওয়ালার গ্লানি জীবন থেকে মুছে ফেলার জন্যই একদিন সামান্য মূলধন নিয়ে ব্যবসাটা আরম্ভ করেছিল অশোক। তারপর দেখতে-দেখতে তার জীবনের মোড় ঘুরে গেছে। আজ আর সে রাস্তার অবহেলিত ফেরিওয়ালা নয়। সত্যিকারের একজন ব্যবসায়ী হয়েছে। যে সমাজে মাত্র কয়েক বছর আগে সে ছিল অবহেলিত, লাঞ্ছিত। সেই সমাজ সব দেখে শুনে তাকে মর্যাদার উচ্চ আসন দিতে এগিয়ে এসেছে। সকলের বাকচাতুর্যে-অশোক কখনও হেসেছে। কখনও বা লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে বলেছে, কি বিচিত্র এই পৃথিবী! কি বিস্ময়কর সেই পৃথিবীর মানুষগুলোর আচরণ ও জীবন রহস্য!

নাঃ জীবন রহস্যের কথা ভেবে আজ আর বৃথা সময় নষ্ট করতে চায় না অশোক। এখন সময়ের মূল্য তার কাছে অনেক। একটা হোসিয়ারী মিল তৈরী করার ইচ্ছা তার ছিল। তা' আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। ছোট্ট হলেও নিজে কারখানা করতে পেরেছে এটাই সব চাইতে আনন্দের বিষয়!

সেদিন সর্বমঙ্গলা হোসিয়ারী মিলের মেসিনগুলো চালু হবার পর অশোক ফিনিসিং ডিপার্টমেন্টে আসতেই; হেড কারিগর প্রথম তৈরী গেঞ্জির স্যাম্পেল এনে দেখিয়ে তাকে বলল, সুন্দর জিনিস হয়েছে। মনে হয় বাজারে ভাল চলবে! একজন এজেণ্টকে এজেন্সী দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। সেই দেখবেন বাজারে মাল কাটাবে। আপনাকে বিক্রির কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না।

হেড কারিগরের কথা শুনে অশোক মনে মনে হাসে।

অশোকের নিজের চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যে বেশ চালু হয়ে গেল সর্বমঙ্গলা

হোসিয়ারী মিল। অর্ডার সাপ্লাই দিতে এখন হেড কারিগর হিমসিম খায়। দুই সিপ্টে তাকে মেসিন চালাবার ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ ছোট কারখানা, কারিগরও বেশী নেই। অল্প লোক দিয়েই তাই কাজ সামলে নেওয়ার ব্যবস্থা করে, নিজের কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে অশোকের আস্থা অর্জনের জন্য একটু বেশী পরিশ্রম করতে হচ্ছে। অপূর্ব জানে এছাড়া তার ভবিষ্যৎ তৈরী করে নেওয়ার কোন উপায় নেই। লেখাপড়া সে বিশেষ শিখতে পারেনি ছোট বেলা থেকেই গেঞ্জির কলে কাজ করতে করতে হাতে-কলমে সমস্ত কিছু শিখেছে। তবেই না তাকে হেড-কারিগর হিসাবে সপ্তাহে অশোক ত্রিশ টাকা মাইনে দেয়। তাছাড়া বারতি কাজেরও আলাদা মজুরি পায় সে। সহকর্মীরা বলে, মালিকের মন জুগিয়ে চলতে পারলে অপূর্ব গুহের উন্নতি কে ঠেকায়!

অশোক লক্ষ্য করে, বেশ দরদ দিয়েই মিল চালায় তার হেড কারিগর অপূর্ব গুহ। মালিকের লাভ-লোকসান ছাড়াও মিল বড় করার দিকেও তার ঝোঁক কম নয়। এ' লাইনের রহস্য সে ভাল রকম জানে। সুদীর্ঘ কারিগর জীবনে তারই হাতে কত মিল হ'ল। কত মিল দেনার দায়ে ফেল পড়ে গেল। বাঙালীদের হাত থেকে শেষ পর্যন্ত মিল গুলো অবাঙালীরা নিয়ে নিল।

অপূর্বর কর্মনিষ্ঠা দেখে অশোক মুগ্ধ। তাই তাকে ভালবাসে এবং বিশ্বাসী আপন জনের মতই মনে করে। একদিন কথা প্রসঙ্গে অশোককে হঠাৎ বলতে শোনা গেল, অপূর্ব! আমি ভাবছি তোমাকে আমার কারখানার একজন অংশীদার করে নেব।

মালিকের কথা শুনে চমকে উঠল অপূর্ব। সে দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলল, অংশীদার হ'ব! আমার মূলধন কোথায়?

—সে তোমায় ভাবতে হবে না, আমি ব্যবস্থা করব! আরে মূলধন ছাড়াও যে কোন ব্যবসার অংশীদার হওয়া যায়। তার জন্য অবশ্য একটু বেশী খাটতে এবং কিছুটা দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তা' যদি পার তাহলে—!

মানব মন আশা-আকাঙ্খা নিয়েই বেঁচে থাকে। তাই বাঁচার তাগিদেই তাঁদের জীবিকার পথ স্থির করতে যেমন বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়,

তেমনি বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ যদি সুচিন্তিত না হয়, তাহলে যে কোন মুহূর্তে বিপর্যয় ঘটতে পারে এটা বোধ হয় অশোকের মাথায় আসেনি। সে নিজেকে দিয়েই জগৎটাকে সেদিন বিচার করেছিল। কারণ তার কর্মনিষ্ঠার প্রতি আস্থা ছিল, কিন্তু প্রতিটি মানুষের কর্ম জগতের বাইরেও যে একটা জগৎ আছে, এবং সেখানে নানা চরিত্রের লোক দিনরাত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ঘুরছে এটা বুঝতে তার বড় দেরী হয়ে গেছল। নইলে অশোক এমন মারাত্মক ভুল হঠাৎ করে বসবে কেন! সে ত অনায়াসেই মেইণ্ডিং ডিপার্টমেণ্ট যেমন ছিল ঠিক তেমনিই রাখতে পারত। আসলে অশোক, ফেরিওয়ালার প্রতি অবহেলাজনক উক্তি গুলি ভুলতে পারেনি। হয়ত সেই জন্যই মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়ে নিজের মহানুভবতার পরিচয় দিতে চেয়েছিল।

কারখানায় এত গুলো পুরুষ কারিগরের মধ্যে একজন মেয়ে কারিগর থাকলে কাজের ক্ষতি হবে, একথা কিন্তু অপূর্ব বার বার অশোককে বলেছিল! তার উত্তরে সে মুচকি হেসে তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছিল, আরে বাবা, ও মেইণ্ডিং ডিপার্টমেণ্টে রিপুর কাজ করবে। তাতে তোমার কাজের ক্ষতি হবে কেন? বরং তার উল্টো অর্থাৎ প্রোডাক্‌শন বেশী হবে বল। মেয়েটাকে দেখে সকলে খোশ মেজাজে কাজ করবে!

এরপর অপূর্ব গুহের আর কিছু বলার মতন ছিল না। সে আপন মনে শুধু একটি মাত্র কথা উচ্চারণ করেছিল, কল-কারখানার লাইনের লোক। মেয়ে-মানুষ দেখে মেজাজ ঠিক রাখতে পারলে হয়। মেয়েটাও আবার উল্টো বিপত্তি না ঘটায়!

॥ আট ॥

থানার কাজ কর্ম সেরে নলিনী বসু বাসায় ফিরে আসতেই শরদিন্দু প্রফুল্ল চিত্তে বলে উঠল, এতক্ষণ তোমার দিনলিপি থেকে উকিল পাড়ার কাহিনীটা সকলকে পড়ে শোনাচ্ছিলাম। এতো দেখছি রীতিমত নাটকীয় ব্যাপার! অশোক এবং অপূর্ব গুহের চরিত্র দুটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাঝে-মাঝে তুমি খুব চমৎকার মানসিক বিবর্তন ও তার প্রতিক্রিয়ার চিত্র তুলে ধরেছ। সত্যিই মানুষের জীবন অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ, বাহ্যিক রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হই বটে, কিন্তু সবার স্বরূপ বুঝতে পারি না। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতারিত হয়ে থাকি। সেই প্রতারণার জন্য কত নর-নারী যে সারাজীবন—!

বন্ধুর আবেগপূর্ণ কথায় বাধা দিল নলিনী বসু। সে বলল, ও সব আলোচনা এখন থাক। খাওয়া-দাওয়ার পর ধীরে সুস্থে ও সব করা যাবে। দাঁড়াও আগে দয়াল ঠাকুর অতিথি সেবার কত দূর কি করেছে তার খোঁজ নিই।

—ও সব কিছু তোমাকে দেখতে হবে না। মা রয়েছে কাজেই চিন্তার কোন কারণ নেই। তাছাড়া তোমার দয়াল ঠাকুর, অতিথি আপ্যায়নে অত্যন্ত যত্নশীল, ওর কাজের মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। তুমি এবার রাজকীয় পোষাক ছাড় দেখি। ঘামে ভিজে গেছে জামাটা! খুলে বাতাসে মেলে দাও শুকিয়ে যাক।

হ্যাঙ্গারে জামাটা খুলে রাখল নলিনী। তারপর পাখার বাতাসে গায়ের ঘাম শুকবার জন্য ইজিচেয়ারটায় বসতেই সুমিত্রা দেবী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার স্নান হয়নি? বিশ্রাম করে স্নানটা এবার সেরে নাও।

দয়াল ঠাকুর দরজার পাশে এসে দাঁড়াতেই নলিনী জানতে চাইল, তোমার রান্নার কাজ হয়ে গেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্নানের জল এনে দিই আপনাদের?

: স্নানের জল! থাক, আমি আর শরদিন্দু পুকুরে স্নান করে

আসছি। তুমি বরং ওনাদের জল তুলে দাও। এ' ঘর থেকে তেল সাবান নিয়ে যাও।

—ওনাদের সকলের স্নান-টান হয়ে গেছে।

: তাই নাকি! শরদিন্দু চল, আমরা তাহলে চট্ করে একটা ডুব দিয়ে আসি। নাও তেল মাখ। আমাদের জন্তই সকলে বসে রয়েছে বোধহয়।

তেল মাখতে-মাখতে শরদিন্দু বলে, ওঃ কতদিন পরে আমরা একসঙ্গে পুকুরে স্নান করতে যাচ্ছি বলত? সেই ছোটবেলায় দু'জনে রোজ সকালে গঙ্গায় স্নান করতে যেতাম! বিকেলে দেশবন্ধু পার্কে, বল খেলার পর পুকুরে সাঁতার কাটতাম, মনে আছে?

ছোটবেলার কথা তুলতেই নলিনী হেসে ফেলল। সে স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে বলতে লাগল, কৈশোরের স্মৃতি কেউ কোনদিন ভুলতে পারে! কারণ ঐ জীবনটাই যে সব চাইতে সুখের। সমাজ ও সংসারের জটিল সমস্যা তখন অন্তর স্পর্শ করে না। ভাবনাহীন কিশোর মন শুধু ছুটে বেড়ায় একটি সীমাবদ্ধ জগতের মধ্যে, যেখানে খেলা আর খেলা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কোন অভাব অনটন সেই অনাবিল আনন্দ মুখর দিন গুলিকে ম্লান করে দিতে পারে না। অসমাপ্ত কৈশোর আর অনাগত যৌবনের সন্ধিক্ষণ থেকেই শুরু হয় যত রাজ্যের ভাগ্য বিড়ম্বনা। তারই জের সামলে উঠতে হাঁফিয়ে যায় সকলে। যখন হাঁফ ছেড়ে মাথা খাড়া করে একটু দাঁড়াবার সুযোগ আসে, তখন প্রাণ প্রাচুর্য থাকে না। জীবন ও যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ থিতিয়ে আসে, মনের গতি অন্য খাতে বইতে থাকে। যার ফলে মানুষের যৌবনের বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী তিরিশের কোঠা পার হতে না হতেই বদলে যায়। আসলে কি জান শরদিন্দু, সকল বয়সেরই আলাদা এক একটা ধর্ম আছে। যেমন ধর, এইমাত্র তুমি আমাদের কিশোর জীবনের কথা বলছিলে। আচ্ছা আমরা এখন কি পারি সেই রকম বেপরোয়া হতে? তুমি কি পার, ছোটবেলার মতন সেই বাগবাজার থেকে বাগুইহাটী পায়ে হেঁটে গিয়ে মুখুজ্জ্যেদের বাগানে নারকেলি কুল খেয়ে আসতে?

বান্ধবীর দাদার ছোটবেলার কথা শুনে আঁতকে উঠল বনশ্রী। সে বিস্ময়

প্রকাশ করে বলে ফেলল, সেকি ! আপনারা বাগবাজার থেকে বাগুইহাটী পায়ে হেঁটে যেতেন কুল খাওয়ার জন্য ?

—হ্যাঁ যেতাম। এতে অবাক হওয়ার কি আছে ? জবাব দেয় শরদিন্দু।

বনশ্রী ও তার ছোট বোনের বিস্ময় ভাঙবার জন্যই নলিনী বলে, তখনও বেলগাছিয়া পর্যন্ত ট্রেন চলত। ওখানেই ছিল মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেল ষ্টেশন। রেলেও মাঝে মধ্যে আমরা যেতাম। তবে রাস্তাটা এতই নির্জন এবং মনোরম ছিল, তাতে রেলের চাইতে হেঁটে যেতেই আমাদের বেশী ভাল লাগত। ও রাস্তায় বাস সে সময় বিশেষ ছিল না। তাছাড়া বাগবাজার থেকে বাগুইহাটী খুব বেশী দূরত্বের পথ নয়। পায়ে হাঁটা পথের ব্যাখ্যা শেষ করেই নলিনী বসু তাকাল শরদিন্দুর দিকে।

পথের দূরত্বের কথা তুলতেই শরদিন্দু সোৎসাহে এবার বলে, আরে বাবা, বাগুইহাটীর কথা বাদ দাও ! আমরা বাগবাজার থেকে আলিপুরের চিড়িয়াখানা, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, এমন কি বালি ব্রীজ পার হয়ে বেলুড় মঠ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গেছি। হাঁটাতে আমাদের ক্লান্তি ছিল না। রবিবার কিংবা কোন ছুটির দিন পেলেই ব্যস। আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়তাম। প্রায়ই যেতাম হাওড়ার ব্রীজের উপর বেড়াতে। ভারী মজা লাগত বড় বড় মালবাহী জাহাজগুলির মধ্যে ক্রেন দিয়ে মাল তোলার দৃশ্য দেখতে।

শরদিন্দুর মুখে হাওড়ার ব্রীজে বেড়াবার কথা শুনে তনুশ্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, সত্যিই আপনি হাওড়ার পুলে প্রায়ই বেড়াতে যেতেন ?

—কেন বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?

তনুশ্রীর অহেতুক প্রশ্নটা কানে যেতেই মীতা মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল। তাই সে গম্ভীর মেজাজে বলল, দাদা, কটা বাজে জান ? অবেলায় পুকুরে স্নান করলে শরীর খারাপ হবেনা তোমাদের ? গল্প এখন থাক। স্নান করতে যাও।

সুমিত্রাদেবীও এবার মেয়েকে সমর্থন করতে এগোলেন, হ্যাঁরে, অনেক দিন তো পুকুরে স্নান করিস্ না ! আর দেরী করছিস কেন তোরা ?

মা ও বোনের তাগিদে দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি স্নান সেরে আসতেই সুমিত্রা দেবী, মীতাকে খাওয়ার জায়গা করে দিতে বললেন। বনশ্রী ও তনুশ্রী

তাকে পরিবেশনে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, মীতার মা বলে উঠলেন, তোমরাও দুই বোনে বসে পড়। মীতা আর দয়াল ঠাকুরই পরিবেশন করে দিতে পারবে। অথবা তোমরা আবার হাত লাগাবে কেন!

মীতা আর সুমিত্রাদেবীর কথাবার্তার ধরণ যেন কেমন-কেমন লাগছিল বনশ্রীর। দুই বোন বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারল, তাদের আড়ালে রাখার চেষ্টা করছেন সুমিত্রাদেবী। ব্যাপারটা ঠিক তাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। তাই ওদের কথা বড় খারাপ লাগল।

দিদির মনের ভাবটা বুঝতে পেরে তনুশ্রী নিজেকে অনেকটা সামলে নিল। কথাবার্তাও বলতে লাগল খুব হিসেব করে। যে উৎসাহ-নিয়ে দুই বোন বেড়াতে এসেছিল, তা যেন কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে ওদের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে।

ব্যাপারটা অনেকক্ষণ যাবৎ লক্ষ্য করছিল নলিনী বসু। শরদিন্দুর মা, এবং বোনের ব্যবহার তারও আদৌ ভাল লাগছিল না। মনে মনে বিরক্ত হলেও সে কিছু বলতে পারছিল না। শুধু ওদের চলে যাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত ধৈর্য ধরে সে অপেক্ষা করার চেষ্টা করছিল। কারণ তার বাসায় বসে অপ্রীতিকর কোন ঘটনার সূচনা হোক ওদের মধ্যে, এটা তার কাম্য নয়। গৃহস্বামীর উপস্থিতিতে কোন অতিথি অপমানিত হওয়া মানেই গৃহকর্তার অপমান। এটাই তার ধারণা।

শরদিন্দুর কিন্তু কোনদিকেই খেয়াল নেই। সে ঠিক আগের মতই একটার পর একটা বিষয় নিয়ে নলিনীর সঙ্গে আলোচনা করে যাচ্ছে। তার মুখ্য আলোচ্য বিষয়ই হল, অশোক আর অপূর্ব গুহর চরিত্র। সেই সঙ্গে কৌতূহল, কাহিনীর শেষ পরিণতি জানার জন্য। তাই সে বন্ধুর দিনলিপির মধ্যে সর্বক্ষণ ডুবে ছিল, আর ভাবছিল জীবনটাই—হ্যাঁ, একটা রঙ্গমঞ্চ।

কেন যেন নলিনীর মনটা বড় অস্থির হয়ে পড়েছিল। অসহায় ভাব ফুটে উঠেছিল তার চোখে মুখে। হঠাৎ তনুশ্রীকে সুসজ্জিতা দেখে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার! এখনই যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছ দেখছি?

—হ্যাঁ, একটু সকাল-সকালই আমাদের ফিরতে হবে। বাবাকে একলা বাড়িতে রেখে এসেছি। দিদি আর আমি রিক্সায় চলে যাওয়ার কথা ভাবছি। মীতুদিয়া সন্ধ্যার পর যাবেন বোধ হয়।

: সেকি! তোমরা আগে যাবে কেন? বিস্ময়ভরা প্রশ্ন শরদিন্দুর।

—আপনাদের যেতে একটু দেরী হবে মীতা বলছিল। আমরা অতক্ষণ থাকলে বাবার অসুবিধা হবে, তাই আগে চলে যাচ্ছি। জবাব দিল বনশ্রী।

: মীতা কোথায়?

—মাসিমার সঙ্গে পুকুরে গেছে। ফিরতে দেরী হবে বলে গেল।

: আমরা এক সঙ্গে এসেছি, আবার এক সাথেই যাব এই তো ঠিক ছিল! হঠাৎ মত বদলালে কেন?

—আগে মীতুদি বলেনি যে, মাসিমা সর্বমঙ্গলা মন্দিরের সন্ধ্যারতি দেখে যাবেন! উত্তর দেয় তনুশ্রী।

নলিনী বসু এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার সে মুখ খুলল, ঠিক আছে, তোমাদের রিক্সায় যেতে হবে না। গাড়ি ডেকে দিচ্ছি, দয়াল গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

গৃহস্বামীর সিদ্ধান্তের পর ওরা আর কেউ কিছু বলতে পারল না। গাড়িতেই দয়ালের সঙ্গে দুই বোন চলে গেল। যাবার সময় তনুশ্রী, নলিনী বসুকে বলে গেল, এখান থেকে বদলি হয়ে যাবার আগে আর একদিন মাছ ধরতে যাবেন। নিমন্ত্রণ রইল। সত্যিই যাবেন কিন্তু।

দুই বোন শরদিন্দুকে কিছু না বলে যাওয়ায়, তার হুঁস্ হল। বন্ধুর লেখা দিনলিপির খাতাখানা খোলা অবস্থায় বিছানায় ফেলে রেখে উঠে দাঁড়াতেই নলিনী এসে বলল, ওরা চলে গেল। তোমাদের সঙ্গে গেল না, এটা কিন্তু আমার ভাল ঠেকছে না। নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে, যার জন্য ওরা চলে গেল।

—কি জানি ওদের কি হল! অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তরটা দিলে শরদিন্দু।

বন্ধুর ঔদাসীন্যর জন্যই তার মা ও বোন, যে কাণ্ডটা করে বসেছে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল নলিনী। সে খুব আক্ষেপের সঙ্গে বলে গেল, এ' রকম একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে, তা' আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু সেটা যে আমার এখানে বসেই ঘটবে— !

—অপ্রীতিকর ঘটনা মানে! আঁত্‌কে উঠল—শরদিন্দু।

: মানে অতি সহজ। মেয়েলি ব্যাপার! মীতার ভুলের জন্যই এটা হয়েছে। আমার ধারণা ছিল ও খুব বুদ্ধিমতী। আসলে তা' নয়, ভীষণ

বোকা। নইলে সামান্য ব্যাপারকে এমন জটিল করে তুলবে কেন? এখন তুমি পস্তাও! তোমার মাও কাজটা ভাল করেননি। বেশ গুরুত্ব দিয়েই কথা কটা বন্ধুকে শোনাল নলিনী।

নলিনী বসুর বিরক্তপূর্ণ কথাগুলো শুনে শরদিন্দুর ধ্যান ভাঙল। সে জানতে চাইল, কি হয়েছে একটু খুলে বল দেখি! আমি তন্ময় হয়ে তোমার লেখা পড়ছিলাম। কিছু খেয়াল করিনি ভাই!

: তা' যে করনি সেতো বুঝতেই পারছি। তুমি উকিল পাড়ার নাটকীয় ব্যাপারের রহস্য জানার জন্য এতেই ব্যস্ত ছিলে; যার ফলে আর এক নাটকের সৃষ্টি করে ফেললে! জজসাহেব যদি সব শোনেন, তাহলে তিনি কি ভাববেন, আমি এখন সেই চিন্তা করছি।

অথৈ জলের তলায় পড়ে গেল শরদিন্দু। সে ঘটনাটা জানার আগ্রহ প্রকাশ করতেই নলিনী বসু আবার বলতে লাগল, ওরা দুই বোন অসন্তুষ্ট হয়েছে তাই চলে গেল। এখন দেখ এর জের কত দূর গড়ায়।

—ওরা কার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল? ভীত কণ্ঠের আওয়াজ শরদিন্দুর।

: খুব সম্ভব মীতার উপর অসন্তুষ্ট হয়েই চলে গেছে। তোমার মায়ের কথাবার্তাও বোধ হয় ওদের ভাল লাগেনি। সমস্ত ব্যাপারটাই খুব খারাপ লাগছে আমার, কারণ সকলকেই আমি নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছি। সুতরাং—!

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। বিষয়টা আমি আগে বুঝে নিই। তারপর যা হয় ব্যবস্থা করছি।

: তুমি এর ব্যবস্থা কি করবে! জল খুব ঘোলা হয়ে গেছে।

—কেন! ব্যবস্থা করতে না পারার কি হয়েছে!

: মেয়েদের আত্মসম্মানের ব্যাপার। ওরা যদি মীতা এবং তোমার মায়ের ব্যবহারে অপমান বোধ করে থাকে, তাহলে তার তুমি ব্যবস্থা কি করবে? মা ও বোনের হয়ে—!

—হ্যাঁ, ক্ষমা চাইতে যাব। দরকার হলে—!

—তার ফল ভাল হবে কি! পারিবারিক অশান্তি দেখা দেবে না! তাছাড়া তোমার মা ও মীতা বোধহয় ওদের ভুল বুঝেছে। ওতেই গোলমালটা বেঁধেছে।

আরও গভীর চিন্তায় পড়ে গেল শরদিন্দু। এক আনন্দমুখর পরিবেশ থেকে আর এক অস্বস্তিকর আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে, এটা তার কাছে সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। কারণ প্রীতির বন্ধন সামান্য এক মুহূর্তের ভুলে শিথিল হয়ে যায়, যার ফলে বিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটে, এত সূক্ষ্ম চিন্তা করাব সুযোগ সে কোন দিন পায়নি। হয়ত সেই কারণে— !

বান্ধবীর এ'হেন আচরণের কারণ বুঝতে পেরে বনশ্রী মোটেই বিস্মিত হয়নি। সে জানে মেয়েদের মন। কিসের ঈর্ষায় তারা চঞ্চল হয়ে পড়ে, তাও তার অজানা নয়। তবে মীতার কাছ থেকে এটা সে আশা করেনি। ওর সম্পর্কে বনশ্রীর ধারণা অন্য রকম ছিল। সেই ধারণা আজ বদলে গেছে। এত হীন মনোবৃত্তি ওর!

তনুশ্রী, তার বান্ধবীর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে! ছিঃ ছিঃ এটা মীতা ভাবল কি করে! মাসিমাই বা ওকে ভুল বুঝতে গেলেন কেন? ও তো কোন রকম অশালীন আচরণ করেনি নলিনী বাবুর সঙ্গে! ওকে তো মীতাও ভাল রকম জানে। ও যে একটু বেশী চঞ্চল তাও ওরা সবাই জানে। তাহলে—।

জানা-অজানার প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা এখানে আত্মসম্মানের। সুতরাং বনশ্রীর বান্ধবী প্রীতি সম্পর্কে মনোভাবটা হঠাৎ যেন কঠোর হয়ে ওঠে। সেই কঠোরতার সীমা নির্ধারণ করার আগেই তারা বাড়ি পৌঁছে গেল।

দুই বোন গাড়ি থেকে নামার পূর্বেই চালক ও দয়াল ঠাকুরকে তারা বলে, তোমরা কিন্তু একটু চা খেয়ে যাবে।

—আবার চা কেন দিদিমণি! বিনীত প্রশ্ন দয়াল ও গাড়ি চালকের।

: সারাদিন খেটেছ আমাদের জন্য, এক কাপ চা ভাল করে খাওয়ার ফুরসৎ পাওনি। এখনই গিয়ে তো আবার দাদাবাবুর হুকুম খাটবে। চা খাওয়ার হয়ত সময়ই পাবে না! তাই বলছিলাম— !

গাড়ির প্রৌঢ় চালক বিনা দ্বিধায় তখন বলে উঠল, ওঁরা বলছেন যখন, তখন এস দয়াল ঠাকুর এক কাপ চা না হয় খেয়েই যাই।

বিকেলবেলায় প্রমথবাবুর ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় রোজই এক ঝলক সূর্যের রক্তিম আলো এসে পড়ে। জানলার কাঁচের আবরণ ভেদ করে তারই তির্যক রশ্মি যখন টেবিলের উপর কিছুক্ষণের জন্য ঝিলিক দিয়ে

যায়, ঠিক তখনই প্রমথবাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রতিদিন চাঁপা ফুল গাছটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন।

মেয়েরা বলে, বাবা সূর্যাস্ত দেখতে ভালবাসেন। তাই ওখানে রোজ দাঁড়িয়ে থাকেন। স্নিগ্ধ আলোকের শেষ রশ্মিটুকু দেখার জন্য ওঁর কি ভীষণ ব্যাকুলতা! মেঘে ঢাকা আকাশ দেখলে তাঁর সেই ব্যাকুলতা যেন আরও বেড়ে যায়!

বাড়ির পুরাতন পরিচারক অমৃত কিন্তু অন্য কথা বলে। অবশ্য তার কথা বাইরে প্রকাশ পায় না। একমাত্র সে নিজেই বক্তা এবং শ্রোতা সুতরাং—!

কর্তার মনের অনেক খবরই অমৃত জানে। বিশেষ করে ঐ চাঁপা গাছটার দিকে তিনি অমন করে কেন তাকিয়ে থাকেন। ওঁর ঐ ব্যাকুল চাহনির কথা ভাবলেই অমৃতর খুব দুঃখ হয়। এমনকি চোখের জলও গড়িয়ে পড়ে। তবু কাউকে কোন কথা বলে না। বাবুর বারণ আছে। তাঁকে ঠিক ঐ সময় বারান্দায় এসে দাঁড়াতে দেখলেই সে গাছের পরিচর্যা করে, গোড়ায় বালতী-বালতী জল ঢালে। ডালে ফুল থাকলে তুলে কর্তার টেবিলে সাজিয়ে রেখে যায়।

অমৃতের নানা কাজের মধ্যে এটা কিন্তু একটা বিশেষ দায়িত্ব পূর্ণ কাজ। এই কাজ তাকে গিন্নী-মা বেঁচে থাকতে আজ পর্যন্ত যথারীতি করে আসতে হচ্ছে। বরাবর করতেও হবে। তার প্রতি মায়ের এই হল শেষ নির্দেশ।

—তোমরা ফিরে এলে দিদিমনি? তবে যে কর্তা আমায় বললেন, ও-বাড়ি থেকে তোমাদের নিয়ে আসতে হবে! আমি তাইতো তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ও-বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

: ও-বাড়ি তোমাকে আর যেতে হবে না। এখন ভেতরে চল দেখি, দরকার আছে।

দিদিমনিদের কণ্ঠস্বরে আকস্মিক চাপা অসন্তোষ ভাব লক্ষ্য করে—অমৃত, প্রমাদ গুণতে লাগল। পিছু-পিছু গিয়ে সে বড় দিদিমনির ঘরের সামনে দাঁড়ান মাত্রই বনশ্রী হুকুম করল, এখনই বাদলের দোকান থেকে গরম সিঙ্গাড়া আর দু'টো করে মিষ্টি নিয়ে এস। গাড়িতে যারা বসে আছে ওদের চা, জলখাবার দেব। তুমি যাওয়ার আগে ড্রাইভার আর তার

সঙ্গীকে বৈঠকখানায় ডেকে এনে বসাও। আমি চায়ের জল চাপিয়ে দিচ্ছি।

—যে আজ্ঞে। আমি এখনই ওদের ডেকে বৈঠকখানায় বসাচ্ছি।

মেয়েদের গলার আওয়াজ পেয়ে, প্রমথবাবু নীচে নেমে এলেন। তনুশ্রীকে চা তৈরী করতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এসেই কার জন্ম চা করছিস মা? অমৃতকে কোথায় পাঠালি!

—নলিনীবাবুর ড্রাইভার আর তাঁর সঙ্গীকে চা খেয়ে যাওয়ার কথা বলেছি। তাই অমৃতকে একটু মিষ্টি আনতে পাঠিয়েছি। বাবার প্রশ্নের উত্তর দিল বনশ্রী।

: তাঁরা কোথায়? গাড়িতেই বসে আছেন নাকি!

—না। বৈঠকখানায় বসিয়েছি। অমৃত এলেই চা, জলখাবার দেব।

এক পা, দু'পা করে বৈঠকথানার দিকে এগিয়ে গেলেন প্রমথবাবু। তাঁকে দেখেই চমকে উঠল গাড়ির ড্রাইভার প্রৌঢ় কাশীনাথ। সে তাড়াতাড়ি কাছে এসে পায়ের ধুলা নিয়ে বললে, আমায় চিনতে পারছেন হুজুর? আমি কাশীনাথ।

—কাশীনাথ! নামটা চেনা-চেনা লাগছে বটে! তোমায় কোথায় দেখেছি বলত? কার ছেলে তুমি!

: আজ্ঞে—আমি আপনার আর্দালী, রতনলালের বড় ছেলে।

—তুমি রতনের ছেলে! এর মধ্যে এতো বুড়োটে হয়ে গেছ? বয়স কত হল? তোমার জন্ম তো আমাদের বাসাতেই হয়েছিল।

: আজ্ঞে, আমার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ হতে চলল।

—কিন্তু চেহারাটা যে পঞ্চাশের মতন করেছ! রতন তো এই বয়সে বুড়িয়ে গেছল না! বেশ শক্ত সমর্থ ছিল।

: হুজুর, বাবার স্বাস্থ্য যে খুব ভাল ছিল। আমি পেটের রোগে ভুগে-ভুগে, খুব তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেছি।

—পেটের রোগ! তা'হলেই হয়েছে। ভাল চিকিৎসা করাও। ভাল হয়ে যাবে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়স আবার বয়স নাকি। এখনও ছেলেমানুষ বলা যায়। ভাল চিকিৎসা কর।

: ভাল চিকিৎসা করানর সাধ্য কি আমাদের আছে হুজুর! জিনিস-

পত্তরের যা দাম, তাতে সংসার চালানই দায় হয়ে পড়েছে। ওষুধ কিনে খাওয়ার— !

—হুঁ, কথাটা ঠিকই বটে। আরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো—বসো। রতনের ছেলে কাশীনাথ তুমি। তোমার বাবা সারাটা জীবনতো আমার সঙ্গেই কাটিয়েছে। অবসর গ্রহণের পর আর বেশীদিন তাকে পেনসনের টাকা ভোগ করতে হল না। হঠাৎ শুনলাম মারা গেছে। মরার বয়স তার হয়েছিল না। কি হয়েছিল রতনের?

: বাবার মরার বয়স! তা অবশ্য হয়েছিল না। তবে ও রোগের চিকিৎসা করান যে কঠিন ব্যাপার। চিকিৎসা করিয়েও সুফল পাওয়া যায় না! শেষ পর্যন্ত খুব কষ্ট পেয়েই বাবা মারা গেছেন। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচান গেল না। একবার ক্যান্সার হলে— !

—এঁ্যা! রতনের ক্যান্সার হয়েছিল?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়েছিল! রোগ ধরা পড়ার অল্প দিনের মধ্যেই তিনি বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। যত দিন বেঁচে ছিলেন খুব যন্ত্রণা ভোগ করে গেছেন।

রতনের মৃত্যুর বিবরণ শুনে প্রমথবাবুর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কারণ তিনি তাকে বড় ভালবাসতেন। অঁতি অল্প বয়সেই সে প্রমথবাবুর কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তার সেই আশ্রয় নেওয়ার ঘটনার পেছনে ছিল এক করুণ ইতিহাস।

সে ইতিহাস হয়ত কাশীনাথ জানে না। না জানারই কথা, কারণ কোন পিতা-মাতা, সন্তানের কাছে তাঁদের অতীত জীবনের গোপন ইতিহাস প্রকাশ করেন না। ভয় পান, পাছে সন্তান তার পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে! এই ভয়ের কি কোন ভিত্তি আছে? তার চেয়ে বরং সময় ও সুযোগ মত সন্তানদের সব খোলাখুলি ভাবে বলা ভাল নয় কি। যাতে সন্তানরা সমাজ ও পরিবার সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানতে পারে। যে সমাজে এবং পরিবারে তাদের বাস করতে হবে, তার অতীত ইতিহাস জানা থাকলে, তারা ভবিষ্যৎ জীবনের চলার সঠিক পথ খুঁজে নিতে পারবে। কোন ঘাত-প্রতিঘাতে বিচলিত হবে না। সাবধানে থাকতে

চেষ্টা করবে। প্রয়োজন হলে নিন্দাকারীদের অহেতুক নিন্দা প্রচারের প্রতিবাদ করতে পারবে।

কিন্তু অতি প্রগতিশীল, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন ব্যক্তিই বোধহয় এই মতবাদকে সমর্থন করবেন না। মুখে তাঁরা যতই প্রগতির কথা বলুন না কেন, জীবনের গোপন দিকটা চিরদিন গোপনই রেখে যাবেন। তা' প্রকাশ করার সৎ সাহস তাঁদের কোন দিনই হবে না। নানা ফন্দি ফিকিরে বরং নিজেদের কুকর্ম চাপা দিয়ে মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করবেন। আধিপত্য বজায় রাখবেন ছোট বড় সবার উপর। কেউ গোপন তথ্য ফাঁস করে দিলে উচ্চ কণ্ঠে তার প্রতিবাদ জানাবেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচার করে আলোড়ন সৃষ্টি করবেন। এই হল বাস্তব সামাজিক চিত্র। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিত্য নতুন ঘটনার অন্ত নেই।

রতনের বেলায় ঘটেছিল এর উল্টোটা। বেচারা পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে যখন অসহায় হয়ে পড়েছিল। অনাহারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে দিন কাটাচ্ছিল, তখন তারই নিকট-আত্মীয়রা রতনের পৈত্রিক ভিটাটুকু নামমাত্র মূল্যে কিনে নিয়েছিল। যে কদিন টাকা কটা তার হাতে ছিল, সেই কয়দিন তাকে এক জ্ঞাতি আশ্রয়ও দিয়েছিল। তারপর টাকা ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ্যে জুটতে আরম্ভ করল লাঞ্ছনা। শেষ পর্যন্ত 'আশ্রয়দাতার বাল-বিধবা কন্যার সঙ্গে অবৈধ প্রণয় ও মেলামেশার অপবাদ দিয়ে বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল!

সেদিন মিথ্যা অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে অসহায় রতনকে পথে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেও কোন ফল পাওয়ার উপায় ছিল না। স্বাস্থ্যবান অল্প শিক্ষিত তরুণ বয়সের ছেলেকে কেউ ভিক্ষাও দিতে চাইত না। বরং সকলে তাকে গতর খাটিয়ে খাওয়ার উপদেশ দিত। কারণ সে একজন অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ। তুই ছাড়া তাকে কেউ তুমি সম্বোধন করত না।

গতর খাটিয়েই খেতে চাইত রতন। গৃহস্থের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে জ্বালানির কাঠ চেলা করে দেওয়ার বিনিময়ে আহার এবং দৈনিক চার আনা মজুরি সংগ্রহ করতে তাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হ'ত। যেদিন তার কাজ

জুটত না সেদিন হাটে-বাজারে মোট বইতে হ'ত। তাতে তার খোরাকীর পয়সাও ঠিকমত উঠত না। দিনকাল তখন এতই মন্দা ছিল।

টাকা পয়সার লেন-দেনে মন্দা থাকলেও, জিনিসপত্তর তখন খুবই সস্তা ছিল। তবু দিন মজুরদের কষ্টের অন্ত ছিল না। তাই জীবিকার সন্ধানে রতনকে দেশান্তরে আসতে হয়েছিল।

প্রথমে কিছুদিন সে এক হোটেলে চাকরের এবং তারপর বিড়ির কারখানায় মজুরের কাজ করার পর, বছরখানেক বাদে কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে যখন চিকিৎসার জন্য সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করছিল, তখন পাশের বাড়ির মহকুমা শাসকের স্ত্রী তাকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর দয়াতেই রতন রোগমুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

মহকুমা শাসক প্রমথবাবুই একদিন রতনকে নিজের আদালতে পিওন পদের চাকরীটা দিয়েছিলেন। রতন থাকত কিন্তু তাঁরই বাড়িতে। প্রমথবাবুর স্ত্রীকে মা, বলে ডাকত। বাবা বলত কর্তাকে। রতনের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে আর্দালী করে নিয়েছিলেন। বেতন দিতেন সরকারী ব্যবস্থামত মাত্র কুড়ি টাকা।

রতন সরকারী চাকরী পাওয়ার পর আত্মীয়-স্বজনরা এসে তাকে বিয়ে-থা করে, সংসারী হতে পরামর্শ দিতে লাগল। যে-জ্ঞাতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে রতনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তিনিই নিজের শ্যালক কন্যার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

রতন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলল, আপনার ব্যবহার আমি ভুলিনি। সুতরাং আপনাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক হতে পারে না। তাছাড়া আপনার শালার মেয়ের সঙ্গে— !

প্রমথবাবুর স্ত্রী, রতনের দৃঢ় মনোভাবের কথা শুনে অবাক হয়ে গেছলেন। তিনিই শেষ পর্যন্ত এক গরীবের মেয়ের সঙ্গে রতনের বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করে দিয়েছিলেন। যতদিন রতন প্রমথবাবুর আর্দালীর কাজ করেছে, ততদিন সে ওঁদের বাবা-মায়ের মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে গেছে।

প্রমথবাবু জেলা জজ হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে। দশ বছর

পর তিনি অবসর গ্রহণ করে স্বগ্রামে চলে এসেছেন। তারপর থেকেই রতনের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি। তাহলেও তিনি আজও আর্দালী দীর্ঘদেহী রতনকে ভুলতে পারেন নি। ভুলতে পারেননি তার আনুগত্যের কথা।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে কাশীনাথ উঠে দাঁড়াল। আবার পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিল বৃদ্ধ প্রমথবাবুর। তারপর ধীর কণ্ঠে সে বলল, কতদিন পর আপনার দর্শন পেলাম! দিদিমনিদের পৌঁছে দিতে না এলে, আমি তো জানতেই পারতাম না যে, আপনারা এখন গ্রামেই রয়েছেন। তাছাড়া আমি দিদিমনিদের চিনতাম না।

উদাস নয়নে কাশীনাথের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে ছিলেন প্রমথবাবু। বনশ্রী এসে ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, ওরে কাশীনাথ আমার আর্দালী রতনের ছেলে। নলিনীবাবুর ড্রাইভার। আমি ওকে চিনতে পারিনি। ও আমায় ঠিক চিনতে পেরেছে। রতনের মৃত্যুর কথা সবই কাশীনাথের মুখে শুনলাম। বড় কষ্ট পেয়ে নাকি সে মরেছে।

কথা কটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রমথ বাবুর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল। চোখ দু'টিও ছল ছল করে উঠল।

সামান্য একজন আর্দালীর প্রতি বাবার গভীর ভালবাসার পরিচয় পেয়ে বনশ্রী, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তনুশ্রী এসে সামনে দাঁড়াতেই তাকে সে বলল, বাবার ঘরে অমেত্যকে আলো দিতে বল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

॥ নয় ॥

দয়ালের মুখে তনুশ্রীদের বাড়ি চলে যাওয়ার কথা শুনেই কৃত্রিম রাগে ফেটে পড়লেন সুমিত্রা দেবী। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মেয়েকে বললেন, ওরা এমন কাণ্ড করবে আমি তোকে বলিনি? বড্ড বেহায়া মেয়ে ঐ তনুশ্রী। চাল-চলন কেমন তর দেখিস্‌নি! লজ্জা সরম বলে কোন জিনিস আছে মেয়েটার? সব সময়েই কেবল বেলেল্লাপনা! নলিনীর সঙ্গে সেদিন থেকে গায়ে পড়ে কথা বলার চেষ্টা করছে দেখেই বুঝেছি। তাই আমি তোকে—!

মীতা, মায়ের অসংযত সংলাপে প্রথম কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও, প্রকারান্তরে মাকেই সমর্থন করছে দেখে, দয়াল ঠাকুর অবাক হয়ে গেল। কারণ তার ধারণা এরা লেখাপড়া জানা মেয়ে, সেকেলে মানুষের মতন চাল-চলন এবং কথাবার্তা বলবে কেন? তনুশ্রী দিদিমণিকে বেহায়া বলার মত কোন যুক্তি খুঁজে পায়না সে। বেশ সুন্দর চালাক-চতুর মেয়েটি। কখন তার মধ্যে বেলেল্লাপনা দেখলেন উনি? মনের কথা মনেই চাপা রইল দয়ালের। সারাদিন দুই-বোনকে যেমন দেখেছে, ঠিক সেই রকমই দেখে এল বাড়িতে। কত ভদ্র ব্যবহার! অত বড় একজন মানুষের মেয়ে বলে, এতটুকু অহঙ্কার নেই কারও। দেখতেও দুই-বোন যেন ঠিক লক্ষ্মী আর সরস্বতী!

হুঁ, যাকে দেখতে নারি, তাঁর চলন বাঁকা। আপন মনে কথাটা উচ্চারণ করতে করতে নিজের কাজে চলে গেল দয়াল ঠাকুর। সামান্য ঐ একটা কথাতেই সুমিত্রা দেবীর উপর ভক্তি চটে গেছে তার।

বেচারার ভক্তি চটবারই কথা। কারণ সেই এসে অবধি এমন ব্যবহার করছেন, যেন নলিনী বসু ওঁর ঘর জামাই। মেয়েটিও হয়েছে তেমনি। কথার ধাঁচটা দেখনা। ভাবটা যেন উনিই এ'বাড়ির গিন্নী। সকাল থেকে খালি একটার পর একটা হুকুম করেই যাচ্ছেন।

শরদিন্দুবাবুর-মা ও বোন, তাঁরই মতন হবে এটাই বোধ করি আশা করেছিল দয়ালঠাকুর, কিন্তু সারাদিন ওদের ব্যবহারে বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে

উঠেছে সে। কখন যে ওঁরা বাড়ি যাবেন তাই এখন ভাবনা তার। সুমিত্রা দেবীর হাব ভাব দেখে ক্রমশ বিরক্ত হচ্ছেন দাদাবাবুও। তা' বুঝতে পেরেই তাড়াতাড়ি দয়াল ঠাকুর, সকলকে চা, জলখাবার খাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছিল। তার কাজে বাধা দিয়ে মীতার মা বললেন, ঠাকুর, তুমি চিড়ে ভেজনা। নলিনী চিড়ের পোলাও ভালবাসে। মীতাকে তাই করে দিতে বলেছি। একটু ঘি আর গরম মশলা এনে দাও।

সুমিত্রা দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাগটা সামলে নিল দয়াল। ভ'াড়ার ঘরে গিয়ে গজ্ গজ্ করতে লাগল সে, যত সব ইয়ে! গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

শরদিন্দুকে নিয়ে খুব ফ্যাসাদেই পড়ে গেছে নলিনী বসু। সে অবুঝের মতন প্রশ্ন করে তাকে আরও বিব্রত করে তুলেছে। বন্ধুকে সে কিছুতেই বোঝাতে পারছিল না ব্যাপারটা। তাই নলিনীকে বিরক্ত হয়েই বলতে হল, অত সহজ সরল মনে কর কেন সবাইকে। জগৎটাকে যত সহজ ভাবছ, তভটা সহজ কিন্তু নয়। কুটীল চক্রই দিন দিন তাকে জটিল থেকে আরও জটিলতর করে তুলছে। এতক্ষণ উকিল পাড়ার দিনলিপি পড়েও তা' তুমি বুঝতে পারলে না?

—বুঝতে আমি পেরেছি ভাই। তবে একটা কথা কি জান? তোমার ঐ অশোকের মতই আমাকেও বলতে হয়, 'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে আর ভয় কি?'

: অশোকের কথার সঙ্গে এর তুলনা করছ কেন? তার ব্যাপার হচ্ছে অন্য রকম। এখানে ঐ ঘটনার সঙ্গে—।

—আরে বাবা, দু'টি ঘটনার মূলেই সেই নারী।

দুই বন্ধুর উত্তপ্ত আলোচনায় হঠাৎ বাধা দিল এসে কাশীনাথ। সে জানতে চাইল, ওনাদের কটায় দিয়ে আসতে হবে স্যার?

—কেন। তোমার বাড়ি যাওয়ার সময় হয়ে গেছে?

: আজ্ঞে, আমাকে একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। ওনাদের যাওয়ার দেরী থাকলে আমি ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ডাক্তারখানা থেকে ঘুরে আসতাম।

ড্রাইভারের কথা শুনে নলিনী বসু ও শরদিন্দু বাবু দু'জনেই হাত ঘড়ির

দিকে তাকাল। কথায় কথায় রাত প্রায় আটটা বাজতে চলল, সেদিকে খেয়াল নেই কারও। ব্যস্ত হয়ে দু'জনেই বলে উঠল, এঁ্যা—রাত আটটা হয়ে গেল।

—এখনই তাহলে কাশীনাথ আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক, কি বল নলিনী?

: হাঁ্যা, আর বেশী রাত করে লাভ নেই। আমার আবার নাইট্-ডিউটি আছে।

—তোমার নাইট-ডিউটি আছে। আমাকে কাল রাত্রের গাড়িতে যাওয়ার জন্ম তৈরী হতে হবে। আজ তাহলে আমরা চলি?

: পৌঁছ সংবাদ দিও।

—চিঠি দেব কোন ঠিকানায়? তুমি তো শীঘ্রি এখান থেকে চলে যাচ্ছ।

: আরে এখান থেকে যেতে আমার এখনও অনেক দেরী আছে। অর্ডার আসবে, তারপর নতুন অফিসারকে চার্জ বুঝিয়ে দেওয়ার পর যাওয়ার গল্প। ততদিনে তুমি অনায়াসে এখানে চিঠি দিতে পারবে।

ওরা চলে যাওয়ার পর ঝি, চাকরের মুখে-মুখে গল্পটা বেশ জমে উঠতে লাগল। সর্বত্র যেমন বাড়ির ঝি-চাকররা ঘরের খবর ফাঁস করে থাকে, এ'ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। যে যেমন পারল রসিয়ে রসিয়ে আপন জনদের কাছে ঘটনাটা বলতে আরম্ভ ক'রল। তিলকে তাল করতেও ছাড়ল না।

দয়াল ঠাকুর, কাশীনাথকে সেদিন স্পষ্ট বলেই ফেলল, দাদাবাবুকে ভাল মানুষ পেয়ে মেয়েটাকে ঘাড়ে গছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন উনি। এমন পাত্র পাওয়া কি সহজ কথা! ভাগ্যিস্ দাদাবাবুকে বদলী করে দিল, নইলে—।

—নইলে কি হ'ত?

: কি হ'ত, তা আবার ভেঙ্গে বলতে হবে! চিনে জেঁাকএর মতন মা ও মেয়ে, সারাদিন কেমন পিছনে লেগেছিল তা তো দেখনি। দেখলে মতলবটা তুমি বুঝতে পারতে। উনি ফাঁদ পাতা মেয়ে-মানুষ, তা আমি একদিনেই ধরে ফেলেছি।

দয়ালঠাকুরের মন্তব্য শুনে খুব হাসি পেল কাশীনাথের। সে শুধু দু'টি

কথাই বলল, এতদিনেও তুমি দাদাবাবুকে চিনলে না হে? লোকে বলে, নলিনী দারোগার সঙ্গে চালাকি করার ক্ষমতা কারও নেই।

: সে কথা মিথ্যে নয়।

—তাহলে তুমি অযথা ভাবছ কেন? উনি সব বুঝতে নিশ্চয় পেরেছেন। দেখলে না, যাওয়ার সময় ওনারা কত কথা বললেন, উনি একটারও পরিষ্কার উত্তর দিতে চাইলেন না। শরদিন্দু বাবুকে শুধু বললেন, এই নিয়ে কোন হৈ চৈ করতে যেওনা। উত্তেজনাটা কমতে দাও।

ব্যাপারটা যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই রকম বিশ্রী রূপ ধারণ করবে, তা আত্মভোলা শরদিন্দু বুঝতেই পারেনি। মীতার কান্নাকাটিতেই যত সব গোলমাল বাঁধাল। সে বাড়িতে এসেই দাদাকে বলল, তোমার জন্যই আজ আমাকে অপমান করতে সাহস পেল বনশ্রী। এ' বুঝলে আমি ওদের সঙ্গে কিছুতেই যেতাম না।

—কেন কি হয়েছে! ওরা কখন তোকে অপমান করল!

: আহা, তুমি যেন কিছুই দেখনি! তুমিই ওকে উৎসাহ দিয়ে এই কাণ্ড—!

মুখের কথা শেষ করতে পারল না মীতা। আবার সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। অভিমান করে দ্রুত দাদার সামনে থেকে পাশের ঘরে চলে গেল।

মেয়ের কান্নার আওয়াজ পেয়ে সুমিত্রা দেবী আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি ছেলেকে এসে বললেন, হ্যাঁরে! তুই তো ছেলে মানুষ না। নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। সব জেনে শুনেও ওদের সামনে মীতুকে ছোট করতে গেলি কেন? মেয়েটা এখন কেঁদে মরছে! তুই কাল বাড়ি থেকে চলে যাবি। তারপর যদি তোর বোন—!

মায়ের কথায় বাধা দিল শরদিন্দু। সে বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, কি বলছ তুমি! আমার বোন, হ্যাঁ—কি হয়েছে তাতে! মীতুর কান্নাকাটি করার মতন কেউ কিছু বলেনি ত! তোমাদের ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

ছেলের মেজাজ দেখে এবার গলার স্বর বদলান সুমিত্রা দেবী। তিনি শান্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা তুই বোনকে নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছিস্। সেখানে গিয়ে একটা লেখা পড়ে সারা দিনটা কাটিয়ে

দিলি। শুধু তাই নয়, লেখার সমালোচনায় এতই ব্যস্ত হয়ে পড়লি নলিনীকে কারও সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বলতে দিলি না। যতটুকু ফাঁক পেয়েছিস্ তনুশ্রীর প্রশংসা করেছিস্। আর মেয়েটাও তেমনি। হাঁ করে বসে তোদের গল্প শুনেছে। আর তোর বোন মুখ কালো করে আমার কাছে বসে রয়েছে। তাতে তোর বোনকে অবহেলা করা হয়নি? ও বড় হয়েছে, মান সম্মান বোধ কি ওর নেই? তাছাড়া তুই নলিনীর সামনে বার বার তনুশ্রীর প্রশংসাই বা করছিলি কেন? তাতে মীতুর মনে আঘাত লাগেনি!

চুপ করে মায়ের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল শরদিন্দু। আর সে ভাবছিল, মীতার এতদিনের অন্তরঙ্গ বান্ধবী ওরা! তাদের প্রশংসা শুনে মীতার মনে আঘাত লাগবে কেন? কেনই বা তাতে ও অপমান বোধ করবে।

অনেক চিন্তা করেও প্রশ্নটার জবাব খুঁজে পেল না শরদিন্দু। বিস্ময় ভরা প্রশ্ন তার অন্তরের মধ্যে শুধু কিছুক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে, একটা গভীর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে—মনটাকে ভারাক্রান্ত করল। যার ফলে সমস্ত চিন্তা-ভাবনার গতিপথ নিমেষে বদলে গেল। এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের জন্য দায়ী, না—থাক কারও উপর শরদিন্দু দোষ চাপিয়ে দিয়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে না। বরং সাংসারিক শান্তি বজায় রাখার চেষ্টাই সে করবে।

সারাদিন পর একটু বিশ্রাম করার সুযোগ খুঁজছিল নলিনী বসু। কারণ শরীরটা হঠাৎ কেন যেন সে অত্যন্ত খারাপ বোধ করছিল, মাথার যন্ত্রণায় বেশ কাতর হয়েও পড়েছিল। তাই আর থানায় না গিয়ে বাসায় টাউন বাবুকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বলে দিল, খুব জরুরী ব্যাপার ছাড়া আজ যেন কেউ এসে আমাকে বিরক্ত না করে। আমার শরীরটা ভাল নয়। বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

—না স্যার, আপনাকে কেউ বিরক্ত যাতে না করতে পারে—তার ব্যবস্থা করছি। আপনি বিশ্রাম করুন। দরকার হলেই আমাকে ডাকবেন, আমিই না হয় আজ নাইট ডিউটিতে থাকব।

: আমার বদলে আপনি নাইট ডিউটি দেবেন! কেন? মেজবাবুর কি হল!

—মেজবাবু তো এখনও থানায় ফেরেন নি স্যার। তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে—।

: ওঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, সকালে মেজবাবু স্ত্রীকে নিয়ে ক'লকাতায় গেছেন। কিন্তু এতক্ষণে তো তাঁর ফিরে আসার কথা। ঠিক আছে, উনি না আসা পর্যন্ত আপনি থানায় থাকুন। মেজবাবু এলে আপনি চেক-পোষ্টের ডিউটিতে চলে যাবেন। দেখবেন কোন গোলমাল হয় না যেন। আজ কিন্তু ডি, এস, পি, ট্রাফিক মোবাইল চেকিংয়ে আসবেন। সঙ্গে অ্যাডিসনাল এস, পি, সাহেবও থাকতে পারেন।

—আচ্ছা স্যার। আমি এখনই একবার চেকপোষ্ট দেখে আসছি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব। কোন অসুবিধা হবে না।

টাউন বাবু চলে যেতেই নলিনী দারোগা দয়ালঠাকুরকে এককাপ চা করে দিতে বলল। তারপর শরদিন্দুর ওলোট-পালোট করা ডায়েরীর খাতাটা গুছিয়ে রাখতে গিয়ে হঠাৎ নজর পড়ল তারই লেখা একটি পৃষ্ঠার উপর। সেটি দেখে বিস্মৃত প্রায় জীবনের একটি অধ্যায় তার মনে পড়ে গেল। শুধু তাই নয় পৃষ্ঠাটি সহসা যেন নতুন আলোকপাত করল নলিনী বসুর স্মৃতি সমুদ্রে। খুব আগ্রহ-সহকারেই সে পড়তে আরম্ভ করল—বেশ কিছুদিন আগে নিজের লেখা ডায়েরীটা। কতগুলো কথা আজ তার কাছে বড় বাস্তব বলে মনে হচ্ছিল।

নর ও নারী। একের প্রতি আর এক জাতির আকর্ষণ আদি অনন্ত কালের। অন্তরের সুপ্ত চেতনা ও কামনার যখন বিকাশ ঘটে এবং প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তির যেদিন প্রথম উন্মেষ দেখা দেয়—মানব দেহে ও মনে, তখনই উভয় জাতির মধ্যে একটা প্রচণ্ড উন্মাদনা জাগে। যার ফলে সদ্য বিকশিত প্রাণ নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষায় পল্লবিত হয়ে ক্রমশঃ অশান্ত আর চঞ্চল হয়ে উঠে। সেই চঞ্চলতার বহিঃপ্রকাশ প্রেমে, তার চরম পরিণতি মিলনে। কিন্তু ব্যর্থ প্রেম বা বিচ্ছেদের শেষ পরিণতি।

কাব্যে ব্যর্থ প্রেম বিরহ সৃষ্টি করে। আর সাহিত্যে ও বাস্তব জীবনে ব্যর্থ প্রেম জিঘাংসার প্ররোচনা দেয়! অপরাধ-বিজ্ঞানে ধারা উপধারার পথ বাতলায়। কাম ক্রোধাদি জয়ী সন্ন্যাসীগণ বলেন, "সবই মিথ্যা মায়া, সেই মায়া, মানব চিত্তকে বিভ্রান্ত করে। অধর্মের পথে নিয়ে যায়।"

যে যাই বলুক, বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। সুতরাং বলতে কোন বাধা নেই—

যৌবনোচিত স্বপ্ন, আশা এবং আকাঙ্খার, প্রেম ও বিরহের অন্তরালে একটিই মাত্র প্রবণতা লুকিয়ে থাকে। যার নানা ব্যাখ্যা শোনা যায়। মেঠো কথায় অশিক্ষিতরা তাকেই বলে, "দেবতার বেলায় লীলা খেলা, মানুষের বেলায় পাপের মেলা!" পাপ-পুণ্যের কথায় না গিয়ে সহজ কথা বলা যাক, প্রতিটি মানব মনের নিভৃত কোণে কিছু না কিছু ঘৃণ্য অপরাধের ইতিহাস লেখা থাকে। সেই ইতিহাস চিরকালই একান্ত গোপনীয়। হয়ত তার—! না থাক, অন্য প্রসঙ্গের দরকার নেই। যাঁরা নিজেদের জীবন-ইতিহাস গোপন রেখে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চান—করুন। স্বাভাবিক্ ভাবে চলতে চান—চলুন। নতুন করে বাঁচতে চান—বাঁচুন, আমাদের তাতে কোন ক্ষতি নেই। তবে একটা কথা তাঁদের শুধাই—অতীতকে ভুলে গিয়ে, বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনা জগতে বিরাজ করার আনন্দে ঘুরে বেড়িয়ে তাঁরা কি সত্যিকারের শান্তি পান?

প্রশ্নটা শুনে হয়ত অনেকের অন্তরের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসবে চাপা ছোট্ট একটি বেদনা মিশ্রিত নিঃশ্বাস! তবু তাঁরা মনের কথা গোপন রাখার জন্যই হাসবেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে দু'ফোটা চোখের জল ফেলে কবির ভাষায় বলতে চেষ্টা হয়ত করবেন—"যাহা চাই, তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই, তাহা চাই না।" কিন্তু—!

ঐ কিন্তুতেই—ভাবনার গতি থমকে দাঁড়াল নলিনী বসুর। রাত্রির নিস্তব্ধতার সঙ্গে, সঙ্গে তার চিন্তাস্রোত ক্রমশঃ মনের মধ্যে ভরা ভাদরের নদীর উত্তাল তরঙ্গের মতই অশান্ত হয়ে উঠল! তারই অসংযত ফেনিল জলোচ্ছ্বাসের মাঝে সে যেন পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিল, কতগুলি চতুর—লোভী, ছলনাময়ী নর-নারীর প্রতিচ্ছবি। চকিত দৃষ্টে তাদের অসহায় মনে হলেও আসলে তারা সহায়হীন নয়। দরিদ্রের বেশে ঘুরলেও অর্থের অভাব তাদের নেই। সৎ পথে অর্জিত অর্থ বলে কোন জিনিস আছে, একথা শুনলে তারা পিশাচের মতন হেসে উঠে। অসৎ পথেই উপার্জন করা ওদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য পথ। সেই পথেই—! হ্যাঁ, তাদের প্রচুর অর্থ আসে। অন্ধকার নেপথ্যে চলে তাদের কাজ। প্রকাশ্যেই তারা বলে, আরে মশাই দুনিয়াটা গোল।

এই গোলক বিহারীদের জীবন দর্পণ স্বচ্ছ নয়। দেহের শিরা, প্রতিটি

অস্থি—মসিলিপ্ত। কাজেই দৈনন্দিন জীবনের অসংলগ্ন মুহূর্তের প্রতিবিম্ব দেখার চেষ্টা তারা করেনা। বরং নিত্য নতুন অভিনয়ের চেষ্টা করে। কারণ এই হয়ত তাদের জীবন, নয়ত যৌবন স্ফূর্তির—ক্ষণ চেতনার উন্মত্ততা। সে দৃশ্য যদিও বেশীক্ষণ দৃষ্টিপথে ধরে রাখতে পারল না নলিনী বসু। তবু তাকে এর রহস্য উদ্ঘাটনের চিন্তায় মগ্ন হতে হয়, যেমন প্রতিদিন—!

প্রত্যেক পুলিশ অফিসার, থানায় এজাহারকারীদের যেমন সন্দেহের চোখে দেখতে অভ্যস্ত, তেমনি রহস্যাবৃত সমাজের প্রতিটি মানুষকেই রহস্যপূর্ণ মনে করে থাকেন তাঁরা। নলিনী বসুও এর ব্যতিক্রম নয়। সেও অনেক লোককে সন্দেহজনক মনে করে, তথাপি নর ও নারীকে সে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা করে, ভালও বাসে। কারণ মানুষ বলতে তার কাছে এই দু'টি জাতি চিরন্তন সত্য। তাঁদের শুধু শ্রেণী বিভাগ করতে যা একটু সময় লাগে। তারপর নির্দিষ্ট চরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করতে বসে—ডায়েরীর পৃষ্ঠায় আর দৃষ্টি রাখতে পারল না নলিনী দারোগা, ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সারাদিনের ক্লান্তিতে দয়াল ঠাকুরও ঘুমিয়ে পড়েছিল। থানার পেটা ঘণ্টায় রাত এগারটা বাজতেই ধড়মড় করে উঠে এসে ডাকল, দাদাবাবু! রাত এগারটা বাজল। খাবার জায়গা করব?

দয়ালের ডাক শুনে বিছানায় উঠে বসল নলিনী দারোগা। অবেলায় খাওয়ার জন্য রাতে কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না তার। দয়াল আবার জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, রাতে কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না দয়াল। তুমি খেয়ে নাওগে!

—একেবারে কিছুই খাবেন না? দুধটা গরম করে দিই তাই না হয় খান।

: দুধটা খেতে বলছ? আচ্ছা তাই গরম করে দাও! খেয়ে শুয়ে পড়ি।

গরম দুধের গ্লাসটা এনে দিয়ে দয়াল জিজ্ঞেস করল, মাথার যন্ত্রণাটা কমেছে? না কমে থাকলে একটা বড়ি—!

এক চুমুকে দুধটা খেয়ে নিয়ে নলিনী বসু উত্তর দেয়, বড়ির আর

দরকার হবে না। এখন যন্ত্রণা নেই। হঠাৎ পুকুরে স্নান করেছি তো, তাই শরীরটা!

—আমি সেই জন্যই জল এনে দেওয়ার কথা শুধিয়েছিলাম।

: তাতো শুধিয়েছিলে, কিন্তু শরদিন্দু যে পুকুরে স্নান করতে চাইল। বাধ্য হয়ে তাই ওর সঙ্গে আমাকেও যেতে হল।

—ওনারা এসে তো আজ বাড়িতে ঝড় বইয়ে দিয়ে গেছেন। আমাকে সেই ঝড়ের ধাক্কা সামলাতে হিমসিম খেতে হয়েছে। তাই সময় মত আপনার স্নান আহারের দিকে নজর দিতে পারিনি। অবেলায় স্নান করতে দেখেই আমি বুঝেছিলাম, আপনার শরীর— !

: আরে না-না, আমার শরীর ঠিকই আছে। ভাল ঘুম হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, ঝড় একটা বয়ে গেল কথাটা ঠিকই বলেছ।

দয়াল কিন্তু নলিনী দারোগার কথায় খুশী হল না। সে একান্ত আপন-জনের মতই বলতে লাগল, আপনি যাই বলুন না কেন দাদাবাবু, আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনার শরীরটা আগের চাইতে— ! কথাটা শেষ না করেই দয়াল বেশ জোর দিয়েই বলে ফেলল, এবার কিছুদিন ছুটি নিয়ে হাওয়া বদলে চলুন।

দয়ালের হাওয়া বদল করতে যাওয়ার প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না নলিনী দারোগার। সত্যিই দেহের এবং মনের উপর একটার পর একটা উটকো চাপ এসে পড়ায় শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে তার। কিছুদিন ছুটি নিয়ে কোথাও গেলে হয়ত শরীর ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু নতুন অফিসার এসে চার্জ না নেওয়া পর্যন্ত সে ছুটি নেবে কেমন করে ?

দয়াল মনিবের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে আপন খেয়ালেই বলে উঠল, নতুন বড়বাবু কবে নাগাদ আসবেন দাদাবাবু ?

: কি করে বলব বল। অন্য জেলা থেকে বদলি হয়ে আসছেন। কাজেই তাঁর আসতে দেরী হতে পারে। তিনি এলেই আমি ছুটি নেব। নতুন কাজের ভার নেওয়ার আগেই চল হাওয়া বদল করে আসি। তারপর নতুন অফিসের দায়িত্ব নেব। কি বল ?

—আমিও সেই কথাই আপনাকে বলব ভাবছিলাম। থানার ঝামেলা আর আপনার সইবে না দাদাবাবু।

: এই ক'বছরেই থানার উপর এত বিরক্ত হয়ে গেলে দয়াল? কথাটা শেষ করে একটু হাসল বোধহয় নলিনী বসু।

কোন জবাব দিল না দয়াল। মশারীটা ঠিক করে দিয়ে—আপন মনে কি যেন বিড় বিড় করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেল। মনিবের হাসি শুনে চাপা কণ্ঠে বলে ফেলল, আমি বিরক্ত হব কেন! পিছনে ফেউ লেগেছে। দু'দিন বাদে আপনি নিজেই বিরক্ত হয়ে পালাতে পথ খুঁজে পাবেন না!

পিছনে ফেউ লেগেছে। এই সতর্ক-বাণীটা কানে যেতেই গভীর চিন্তায় ডুবে গেল নলিনী বসু।

॥ দশ ॥

অতি তুচ্ছ ব্যাপারটা এত জটিলতা সৃষ্টি করবে, এটা বুঝতেই পারেনি শরদিন্দু। তাই তাকে অশান্ত পরিবেশের মধ্যেই ছুটির পর বাড়ি থেকে চলে যেতে হয়েছে, খবরটা গোপন রইল না! পারিবারিক শান্তি রক্ষার জন্য শরদিন্দু প্রথম থেকেই অনেক চেষ্টা করে আসছিল, কিন্তু মা ও মীতার ব্যবহার ও অপ্রিয় কথাবার্তায় যখন ঘটনাটি অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। তখন—। শরদিন্দুকে শেষ পর্যন্ত খুব উত্তেজিত ভাবেই বাড়িতে বলতে হয়েছে, তোমাদের যা খুশী কর, আমাকে এর মধ্যে জড়িও না। তবে এইটুকু মনে রেখো, তোমাদের কথাবার্তা—।

—আমাদের কথাবার্তা তোর যে ভাল লাগবে না তা তো জানি। বাপের সব গুণই তো তুই পেয়েছিস! সেও আমার কথা কোনদিন গ্রাহ্য করেনি। তুইও করিস না। সবই আমার অদৃষ্ট! নইলে—!

অদৃষ্টের কথা তুলতেই শরদিন্দু ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে আর বাড়িতে আসবে না এমন আভাষ দিয়ে বলে গেছে, তাহলে তোমরা তোমাদের অদৃষ্ট নিয়েই থাক। আমাকে কোনদিন আর বিরক্ত কর না।

কথাটা প্রমথবাবুর কানে যেতেই তিনি বলে উঠলেন, সর্বনাশ। ছেলেও বাবার কথারই পুনরাবৃত্তি করে গেল। আশ্চর্য- ভদ্রমহিলা এর মধ্যেই সব ভুলে গেলেন!

শরদিন্দুর কথাগুলো তার ঠাকুরমার কানেও কেন যেন খুব খারাপ লেগেছিল। তাঁর একমাত্র ছেলে শশিভূষণ একদিন স্ত্রীর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে ঠিক এই রকম কথাই বলে গেছল। তারপর সেই যে—সে বাড়ি থেকে চলে গেল—আর ফিরে এলো না! আজ পর্যন্ত তার কোন খোঁজও পাওয়া যায় নি। সাংসারিক অশান্তির জন্যই নাকি তিনি রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেছেন। অবশ্য এই নিয়ে পাঁচ জনে—পাঁচ রকম বলে!

জনরব শশিভূষণ গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। কে একজন বন্ধুর

দু'য়েক আগে তীর্থস্থান ঘুরে এসে বলেছিল, অমরনাথের পথে শশীভূষণের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে নাকি একজন ভৈরবীও ছিলেন!

মানুষ সুযোগ পেলে অনেকের নামে অনেক কিছু বলে। এমন দিন গেছে এই শশিভূষণের গুণগান না করে গাঁয়ের যদুনাথ জল গ্রহণ করতেন না। আজ তিনিই বলেন, জজসাহেবের কাছ থেকে ব্যবসা করার জন্য অতগুলো টাকা নিয়ে শেষটায় একটা মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে নিরুদ্দেশ হলি, ছিঃ-ছিঃ!

সুযোগসন্ধানী, অতি ধূর্ত যদুনাথের মন্তব্য শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়তে সময় বেশী লাগল না। কারণ তিনি শশিভূষণের প্রতিবেশী এবং জ্ঞাতিও বটেন; সুতরাং এই পরিবারের অতীত, বর্তমান অনেক ঘটনার সংবাদ রাখেন। এমন কি শশিভূষণ যখন অভাবে পড়ে ক'লকাতার বাসা তুলে দিয়ে গ্রামে এসে বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন থেকেই তার সুখ-দুঃখের একজন সমব্যথীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যদুনাথ সমাদ্দার। যদিও শশিভূষণের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে গাঁয়ের গোলমাল বাধিয়েছিলেন তিনিই।

সহজ সরল মানুষ শশীভূষণ সেদিন বুঝতেই পারেনি যে, যদুনাথ কি ধরনের লোক। সে যে তারই মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাচ্ছে, এটা যখন বুঝতে পারলেন তখন তিনি অথৈ জলে তলিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছেন। দেনার দায়ে জমি জায়গা, বাস্তুভিটেটুকু পর্যন্ত নিলাম হয় আর কি! সেই সময় আবার যদি জজসাহেব শশিভূষণের বিপদে সাহায্য না করতেন, তাহলে কি যে হ'ত বেচারার—তা বলা যায় না। সম্মানহানির ভয়ে সুমিত্রা দেবী নিজে গিয়ে সেদিন জজসাহেবের বাড়িতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। জজসাহেবের স্ত্রীকে বলেছিলেন, দিদি আমাদের বিপদ থেকে বাঁচান।

—বিপদ! কি বিপদ হয়েছে আপনাদের? অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গেই ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিলেন জজসাহেবের স্ত্রী।

: দেনার দায়ে আমাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নিলামের জন্যে ডিক্রী জারি করিয়েছেন সমাদ্দার মশাই। এইটুকু বলেই অঝোরে কাঁদতে আরম্ভ করেন ভদ্রমহিলা।

সুমিত্রাদেবীর কথা শুনে বিস্মিতা হন জজ-সাহেবের স্ত্রী। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি—তাই জিজ্ঞেস করেন, দত্ত মশাইর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শুনেছি সমাদ্দার মশাই। তাহলে তিনি—! প্রশ্নটা শেষ করার আগেই হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যায় তাঁর। অনেক দিন আগে জজ-সাহেবের মুখেই বোধহয় কথাটা শুনেছিলেন তিনি। মনের কথা গোপন রেখে ঠিক আগের মতই স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে বসেন—জজসাহেবের স্ত্রী, কত টাকা দেনা ছিল সমাদ্দার মশাইর কাছে?

: শুনছি তো প্রায় হাজার খানেক টাকা। সুদে-আসলে এখন আদালতের ডিক্রী জারি করেছেন, দেড় হাজার টাকার।

—দেড় হাজার টাকা!

হ্যাঁ, মামলার খরচ সমেত দেড় হাজার টাকা।

—মিত্রমশাই, ভদ্রলোকের কাছে অত টাকাধার করতে গেছলেন কেন?

: দিদি, সে অনেক কথা! এখন সেই ইতিহাস বলার সময় নেই। আপনি শুধু আমাদের মান-সম্মান রক্ষা করুন। নইলে আমায় পথে দাঁড়াতে হবে। এই অপমানের হাত থেকে আমাকে আপনার বাঁচাতেই হবে। আপনি যদি জজসাহেবকে বলে একটা ব্যবস্থা না করে দেন, তাহলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। আপনারা ছাড়া আমাদের আপনজন কেউ নেই দিদি, তাই বিপদের সময় আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

সুমিত্রাদেবীর কথা শুনে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন প্রমথবাবুর স্ত্রী। তিনি ভদ্রমহিলার বিপদের কি করতে পারেন তাই ভাবছিলেন। কিন্তু জজসাহেবকে না জানিয়ে তাঁর পক্ষে অতগুলো টাকার কোন ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। অথচ—!

: আপনি আমাকে কথা দিন দিদি। জজসাহেব ছাড়া কেউ আমাদের এই বিপদে রক্ষা করতে পারবে না। গাঁয়ের সকলেই তো আমার শত্রু। জানেন কেউ আমাদের ভাল চোখে দেখে না। আপনাদের জন্যই আজ পর্যন্ত গাঁয়ে টিকে আছি। জজসাহেবের ভয়ে আমাদের ভিটে ছাড়া করতে পারছে না। উনি পিছনে না থাকলে কবে আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হ'ত।

সেদিন স্ত্রীর মুখে সুমিত্রাদেবীর বিপদের বিবরণ শুনে প্রমথবাবু হঠাৎ

কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেছলেন। তিনি শুধু ছোট্ট একটি মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছিলেন, শশিভূষণকে আমি বার বার নিষেধ করেছিলাম। গ্রামে গিয়ে যদুনাথের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে যেও না। ও লোক কিন্তু মোটেই সুবিধের নয়। তখন শশী আমার কথা শোনেনি। আমি জানতাম যদুনাথ এই কাণ্ড করবে। শশীর কি দরকার ছিল ওর কাছে জমি-জায়গা বন্ধক রেখে বড়মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ? নিজের বিয়ের পরের ঘটনা মনে নেই তার !

জমি-জায়গা বন্ধক রেখে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ! তবে যে শুনেছিলাম, পাত্রপক্ষ এক পয়সাও বিয়েতে নেয়নি ? সমাদ্দার মশাই ওকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করিয়ে দিয়েছেন।

স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে জজসাহেব বলে উঠলেন, সমাদ্দার মশাই, আগে শশীকে আর একবার ডুবিয়েছিল। এবার মেয়ের বিয়েতে ডুবিয়েছে। সেই দেনার জন্যই তো জমি-জায়গা নিলামে উঠিয়েছে।

—তাই নাকি ! তাহলে এখন ওদের কি হবে ! ভদ্রমহিলা তার জন্যই আমার কাছে অত কান্নাকাটি করে গেলেন।

: উনি এখন কান্নাকাটি করবেনই। তখন অত খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিতে বাধা দেননি কেন ? নিজের সামর্থের বেশী ব্যয় করলে বিপদে পড়তেই হবে। তাছাড়া— !

—কিন্তু আমি যে ভদ্রমহিলাকে কথা দিয়েছি। উনি হয়ত কাল সকালেই আবার আসবেন।

: এলে বলে দিও শশিভূষণ যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলব। সেই যদুনাথের কাছে আবার— ! আশ্চর্য ! এরই মধ্যে সব ভুলে গেল শশী ?

সুমিত্রাদেবীর প্রতি স্ত্রীর সহানুভূতির কথা শুনেও বিরক্ত জজসাহেবের চোখে মুখে ঘৃণার ছাপ ফুটে উঠল। রাগে তিনি আর কোন কথাই বললেন না। গম্ভীরভাবে নিজের ঘরে চলে গেলেন। স্বামীর কথা শুনে এবং মেজাজ দেখে কল্যাণীদেবীর বুঝতে বাকি রইল না যে, শশিভূষণের উপর খুব অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন জজসাহেব। ভদ্রলোক এলে হয়ত খুব কড়া মন্তব্য শুনে যাবেন এই আশঙ্কায় কিছুটা বিব্রত বোধও করতে লাগলেন তিনি।

প্রমথবাবু, শশিভূষণের ব্যবহারে সম্প্রতি ক্ষুব্ধ হলেও কেন যেন তাঁর উপর তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তাই তাঁকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অনেকবার আর্থিক সাহায্যই করেননি, কিছু জমি-জায়গা পর্যন্ত দান করেছেন। কিন্তু ভদ্রলোক জজসাহেবের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েও নিজের ভুলের জন্য বারবার আর্থিক বিপর্যয়ে পড়েছেন। এমন দিন গেছে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে প্রায়ই তাঁকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। দরিদ্র বলে সকলে শশিভূষণকে যেমন অবহেলা করেছে, তেমনি বিশ্বাস করেনি কেউ তাঁকে কোনদিন, তাছাড়া নানা অপবাদ দিয়ে বেচারাকে সবাই লোকচক্ষে হেয় করারই আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছে।

শশিভূষণের বিরুদ্ধে যে যাই বলুক' যে যত অপবাদই দিক না কেন, প্রমথবাবু কোনদিন তাতে কান দিতেন না। কারণ তিনি তাঁকে খুব ভাল রকম চিনতেন। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর পারিবারিক ইতিহাস জানতেন, বরাবর সেই জন্যই শশিভূষণের উপর জজসাহেবের অত্যন্ত স্নেহ ও মমতা ছিল। বহুবার জজসাহেব, তাঁকে নানা বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেছেন। বিয়ে দিয়ে সংসারী হতে সাহায্য করেছেন।

জজসাহেবের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন শশিভূষণ। তিনি তাঁকে বিপদে-আপদে সাহায্য করেন। এটা শশীর আত্মীয়-স্বজনদের সহ্য হোত না। তাঁরা সুযোগ পেলেই তার বিরুদ্ধে এসে ভদ্রলোকের কাছে নানা অভিযোগ জানিয়ে যেতেন, উদ্দেশ্য শশিভূষণের প্রতি যাতে জজসাহেব বিরূপ হন।

অবশ্য কোন কোন অভিযোগ শুনে যে বিরূপ হতেন না তাও নয়। সময় সময় তিনি ক্ষেপেও যেতেন। শশীভূষণকে আড়ালে বকাবকিও করতেন। তথাপি সে পরদিন যখন তাঁর সামনে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াল, আশ্চর্যের বিষয়, জজসাহেব তখন স্নেহের সুরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিহে, তোমার সমাজসেবা আর দেশপ্রেম না, কি যে সব বল! তার কাজ কতদূর এগোল? আর রাজনৈতিক দাদাদেরই বা খবর-ঠবর কি?

—আর রাজনৈতিক দাদাদের কথা বলবেন না। দেশপ্রেম বলে কোন বস্তু তাঁদের নেই। যে যার তালে আছেন, সবাই আখের গোছাবার ধান্দায় ব্যস্ত। নইলে আজ দেশের অবস্থা এমন হয়! কত আশা করেছিলাম যে, এবার দেশ স্বাধীন হল—নেতারা আমাদের কথা ভাববেন। কিন্তু—!

: কিন্তু কেন! তাঁরা তো সর্বদাই দেশের ও দশের কথা ভাবছেন। তাছাড়া নতুন আবার—?

—না, নতুন কিছুই তাঁরা করেননি। তাঁদের সেই পুরোনো দাদাগিরি মনোভাব আজ পদে পদে নানা কাজের বাধা সৃষ্টি করছে। অর্থাৎ কিনা তাঁরা বলছেন, তোমরা কর্মী, কাজ করে যাও। ফল লাভের আশা ক'র না, আমরা সারাজীবন সংগ্রাম করব, তাঁরা নেতাগিরি করবেন। তাঁদের বাণী আর বিবৃতি শুনে আমাদের দিন কাটাতে হবে। আমরা একতলার মানুষ। চিরকাল এক তলাতেই থাকব। তাঁরা ক্রমশ উপর তলায় উঠে যাবেন। কিছু বলতে গেলেই ব্যস্—! শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দল থেকে বার করে দেবার ভয় দেখাবেন। তাঁরা যেহেতু নেতা হয়েছেন, সুতরাং নেতারা শত অন্যায় করলেও তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা কিছু বলতে পারব না। আরে বাবা, আমরা পিছনে না থাকলে তোরা কোন দিন নেতা হতে পারতিস্? আমাদের দৌলতেই তো—!

হঠাৎ শশিভূষণের কথায় বাধা দিলেন প্রমথবাবু। তিনি তাঁকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সেই বাসের পারমিটটা পেলে না বলেই বোধ হয় চটে গেছ?

—আজ্ঞে না, বাস রুটের পারমিট পাইনি বলে চটিনি। চটেছি অন্য কারণে। নিজেরা বেনামে সব—!

প্রমথবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি শশিভূষণের ক্ষোভের কারণ বুঝতে পেরেই আলোচনার প্রসঙ্গ অন্য দিকে নিয়ে যান। তিনি বেশ গম্ভীরকণ্ঠে বল্লেন, জীবনে অনেক কিছুই তো করলে, কোনটাতেই সাফল্য লাভ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হোল না! এভাবে আর কতদিন চলবে? ছেলেটি বড় হচ্ছে, তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে না! নাকি সেও বাপের মতন ঘাটে-ঘাটে ঘুরে বেড়াবে?

সাপের মাথায় ধুলোপড়া দিলে যেমন অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি অবস্থা হল শশিভূষণের। জজসাহেবের প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না ভদ্রলোক। সংসারের অভাব-অনটনের কথা মনে পড়তেই তাঁর সমস্ত উত্তেজনা হঠাৎ কর্পূরের মতন উবে গেল। চুপ করে বসে রইলেন তিনি।

অমৃত, দু'পেয়ালা চা দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে জজসাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, মা জানতে চাইলেন, উনি এখানে আজ খাবেন তো?

: হ্যাঁ, এত বেলায় উনি না খেয়ে যাবেন কেন! খাওয়া-দাওয়া সেরেই যাবেন।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরেই শশিভূষণ জজসাহেবের বাড়ি থেকে বাসায় ফিরেছিলেন। সেতো খুব বেশী দিনের কথা নয়। দেখতে-দেখতে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। শশিভূষণ গৃহত্যাগ করে চলে গেছেন। অনেক কষ্টে শরদিন্দু লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। সবই যেন জজসাহেবের মনে হয়, এইতো সেদিনের ঘটনা!

আজ সুমিত্রা দেবী, জজসাহেবের সহৃদয়তার কথা ভুলে গিয়ে থাকলেও, শশিভূষণের সেই আর্থিক বিপর্যয়ের দিনে নগদ দেড় হাজার টাকা দেওয়ার সন তারিখটি এখনও প্রমথবাবুর হিসাবের খাতায় স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। শরদিন্দু অবশ্য সেই টাকা পরে শোধ করে দিয়েছে। তবু বিপদের বন্ধুর সঙ্গে সুমিত্রা দেবীর হঠাৎ বিরোধ সৃষ্টি করাটাকে যুক্তি সঙ্গত মনে করেনি শরদিন্দু। তাই সে রাগ করেই বাড়ি থেকে চলে গেছে!

শরদিন্দুর চিঠিতেই সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারল নলিনী বসু। সে এই রকম একটা অঘটনেরই আশঙ্কা করেছিল সেই দিন। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ যে এতদূর গড়িয়ে যাবে- এবং শরদিন্দুর সঙ্গে এই নিয়ে মা ও বোনের বিরোধ চরমে গিয়ে পৌঁছবে, তা সে কল্পনাও করতে পারেনি! আজ তার কাছে মীতার ও তার মায়ের চরিত্র বড় বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছে! যেমন একদিন তাকে বিস্মিত করেছিল বাগবাজারের সেই চারু পাগলা! তার দেওয়ালের লিখন ছিল এই মনুষ্য চরিত্রের বিরুদ্ধেই।

আজ কৈশোরের ফেলে আসা সেই তপ্তোজ্জ্বল দিনগুলিতে পথে-প্রান্তে দেখা, আর কর্মজীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মেশা অসংখ্য মানুষ ও তাদের বিচিত্র চরিত্র বিশ্লেষণ করলে—এখন একটি কথা বার বার তার মনে উদয় হয়; কেন মানুষের এত বিচিত্র রূপ ও রূপান্তর? কেন তাদের মনে অত ঈর্ষা, এত দ্বন্দ্ব! অতীত জীবনের ঘটনা তাঁরা স্মৃতির মণিকোঠা থেকে এত সহজে মুছে ফেলেন কেমন করে? আজ ইচ্ছে করে, এর উত্তর—শুধাই জনে-জনে।

ঠিক এই কথাই আজ মনে হচ্ছে—প্রমথবাবুর।

প্রথম জীবনে তিনি যা দেখেছেন, এখনও যা দেখছেন, তার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান যেন তাঁর মনে সর্বদা এক অশান্ত ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে চলেছে। স্মৃতি সমুদ্রে অবগাহন করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন দুরন্ত জলোচ্ছাস। যার উত্তাল-তরঙ্গ দেখলে শুধু ভয়ই হয় না, আতঙ্কে সারা শরীর শিউরে উঠে! মনে ভয় জাগে, হয়ত সেই প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ভেঙে চুরমার করে দেবে কথার পর কথা দিয়ে গড়া এই আজব দুনিয়াটাকে।

প্রমথবাবুর অশান্ত মনের চিন্তার গতি হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বনশ্রীর একটি কথায়। সে বাবার কাছে এসে বলল, মীতার বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নইলে ও এমন কাণ্ড করবে কেন?

—কেন! কি হয়েছে মীতার? কি করেছে সে?

: ও আমাদের সম্পর্কে যা-খুশী তাই বলে বেড়াচ্ছে! তাই শুনে তনু কলেজ থেকে ফিরে ভীষণ কান্নাকাটি করছে, কলেজে নাকি ওকে বান্ধবীরা— !

কথাটা শেষ করতে পারল না বনশ্রী! লজ্জায় ও ঘৃণায় তার কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল। চোখের কোলে কয়েক ফোঁটা অশ্রু বিন্দু গড়িয়ে পড়ল। রাগ এবং অভিমানের সুরে সে বলে ফেলল, বাবা! এ' অপমান কিন্তু আমরা সহ্য করব না! এর ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে! আমি এখুনি অমেত্যকে নলিনীবাবুর কাছে পাঠাচ্ছি। তিনি এলে তাঁকেও আমি বলব, মীতা কেন এ' 'রকম নোংরা কথা বলে আমাদের অপমান করছে! আমরা তো তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই গেছলাম! তবে কেন সে— !

খুব শান্ত কণ্ঠে প্রমথবাবু বলে উঠলেন, ও ভদ্রলোকের দোষ কি, মা? মিছেমিছি তাঁকে ডেকে এনে এ'সব কথা শোনালে তিনি হয়ত অত্যন্ত লজ্জা পাবেন। তার চেয়ে বরং শরদিন্দুর মাকে ডেকে আমি বলি। তিনি মীতাকে সাবধান করে দেবেন।

: উনি তাঁর মেয়েকে সাবধান করে দেবেন! তাহলেই হয়েছে! মীতাকে ওর মা উস্‌কে দিয়েছেন। তিনিই তো সেদিন তনুকে— !

যৌবনোচিত লজ্জায় মুখখানা লাল হয়ে গেল বনশ্রীর। সে আর কোন কথাই বলতে পারল না। ক্ষুব্ধ, বেদনাহত হৃদয়ে বাবার সামনে থেকে নীরবে চলে গেল। মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগল মীতা ও তার মাকে।

তনুশ্রী ভেবেই পাচ্ছে না, মীতুদি কি করে ঐ কথাগুলো তার কলেজের বান্ধবীদের কাছে বলল! যে নলিনী দারোগার প্রশংসায় সর্বদা পঞ্চমুখ, সেই তাঁর বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে! তাছাড়া দিদির অন্তরঙ্গ বান্ধবী হয়ে আমার সম্বন্ধে—! ছিঃ ছিঃ মীতুদির মা, একথা মনে স্থান দিলেন কি করে? আমি তো ব্যাপারটা কল্পনাও করতে পারছি না। নলিনী বাবুর কানে এ' সব কথা গেলে তিনিই বা কি মনে করবেন!

নানা জনের মুখে মীতার অসংযত মন্তব্যের কথা শুনে বনশ্রী, দুঃখ ও বেদনায় অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েছে। বান্ধবীর কাছ থেকে এ'হেন ব্যবহার পাবে, এটা সে কোনদিন কল্পনাও করেনি, তাই বজ্রাহতের ন্যায় বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। একটা ভীষণ অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে আসছে। বেদনায় দুটি চোখ অশ্রু বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। তবু সে তনুশ্রীকে কোন কথা বলতে পারছে না। লজ্জায় তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার মতন ভাষাও খুঁজে পাচ্ছে না আজ। অথচ মীতার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার পিছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে—তা' সবই তনুশ্রী জানে, সেই কথা মনে হতেই, তার আরও কান্নায় নয়ন ভেসে যাচ্ছে।

—দিদি! তুই কাঁদছিস?

তনুশ্রীর আচমকা প্রশ্নে ব্যাকুল হয়ে উঠল বনশ্রী। ছোট বোনের অলক্ষ্যে চোখের জল মুছে ফেলতে চেষ্টা করে সে, কিন্তু পারে না। কম্পিত কণ্ঠের জবাবে ধরা পড়ে যেতে হয় তাকে। শত চেষ্টা করেও তনুশ্রীর প্রশ্নটাকে এড়াতে পারল না বনশ্রী। তাই সে বলতে বাধ্য হল, মীতার মন এত হীন এতো জানতাম না রে, ও নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে নইলে—!

দিদির অন্তরের কোথায় আঘাত লেগেছে তা বুঝতে পারল তনুশ্রী। তাই প্রসঙ্গটাকে হালকা করার জন্যই তাকে বলতে হল, খুব খিদে পেয়েছে, আগে যা হোক কিছু খেতে দে, তারপর আমি মীতুদির বাড়ি গিয়ে তাঁর পাগলামি ছুটিয়ে দিয়ে আসছি। চালাকি পেয়েছে। বেশী বাড়াবাড়ি

করলে মজা দেখিয়ে দেব। দরকার হলে থানায় গিয়ে নলিনী দারোগাকে— !

তনুশ্রীর কণ্ঠের বলিষ্ঠ উক্তিগুলো শুনে চঞ্চল হয়ে উঠল তার দিদি। সে সবিস্ময়ে জানতে চাইল, তুই ওদের বাড়ি গিয়ে ঝগড়া করবি ?

—হ্যাঁ, দরকার হয় থানায় পর্যন্ত যাব। ওদের ইত্রামি ছুটিয়ে দিয়ে আসব। চালাকি পেয়েছে !

ঃ এই ব্যাপার নিয়ে তুই থানায় গিয়ে কি করবি ?

—থানায় গিয়ে নলিনী দারোগাকে বলব, মশাই এখন আপনার বন্ধুর বোনের পাগলামী সামলান। নইলে কিন্তু ভাল হবে না।

আর এক নতুন দুর্ভাবনায় পড়ল বনশ্রী। কারণ সে তার ছোট বোনকে জানে, তনুশ্রী কিছুতেই এই অপমান সহ্য করবে না। দুরন্ত মেয়ে-হয়ত মীতার মাকে খুব অপমান করেই আসবে! নলিনী বাবুকে কি বলতে, কি বলবে তারও ঠিক নেই! শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারী হবে।

জলখাবার খেতে-খেতেই তনুশ্রী, দিদিকে বলতে লাগল—দিদি, তোর কোন ভয় নেই। মীতুদি পাগল হতে পারে। তাই বলে আমি পাগল নই। ভদ্রভাবেই মিথ্যা কুৎসা রটানর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসব। তবে কি জানিস দিদি ? মীতুদির মাকে এতদিন যত ভাল মানুষ মনে করতাম, তত ভাল মানুষ তিনি নন। আমাদের সঙ্গে পড়ে—মঞ্জুলা। তাদের বাড়ি মীতুদির মামার বাড়ির গাঁয়ে। তার কাছে আমি ওঁর সম্পর্কে অনেক কথা শুনে এসেছি। সে সব কথা বোধ হয় বাবাও জানেন না।

ঃ মঞ্জুলা, মীতার মায়ের কথা জানল কি করে ?

—ওর মায়ের বান্ধবী ছিলেন নাকি উনি। মঞ্জুলার মা, বাবাকেও চেনেন। ওরা একদিন আমাদের বাড়ি আসবে। মঞ্জুলার বাবা, সরকারী উকিল ছিলেন। সুরেশ বাবুর নাম নিশ্চয়ই বাবার মনে আছে। এক-সঙ্গেই দু'জনে অবসর গ্রহণ করেছেন।

॥ এগার ॥

সেদিন আর প্রমথবাবুকে ধর্মাবতার বলে সম্বোধন করতে হ'ল না—অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকিল—সুরেশচন্দ্র রায়কে। তিনি সপরিবারে বনশ্রীদের বাড়িতে আসতেই সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন—দত্ত মশাই নিজেই! তনুশ্রী, বান্ধবী-মঞ্জুলাকে উপরে নিয়ে গেল দিদির কাছে। অতিথি সমাগমের আনন্দে মুখর হয়ে উঠলেন গৃহস্বামী, আর তাঁর কন্যাদ্বয়।

দীর্ঘদিন পরে সুরেশবাবু, দত্ত মশাইকে দেখে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন? অনেক দিন থেকেই মনের ইচ্ছা ছিল আপনার সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ করার, কিন্তু সময় এবং সুযোগের অভাবে এতদিন তা' কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠেনি। আজ মেয়েই তাগিদ দিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এল। কথাটা শেষ করে একটু হাসতে চেষ্টা করলেন রায় মশাই।

—মেয়ে! বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি প্রমথবাবুর। সেই সঙ্গে শান্ত কণ্ঠের প্রশ্ন, কোন মেয়ে আপনার? একটির বিয়ে হয়ে গেছে না? তারপর তো ছেলে, কি যেন নাম তার? ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না!

: তার নাম—বীরু, অর্থাৎ বীরেশ। তারই ছোট—মঞ্জুলা। আপনার মেয়ে তনুশ্রীর সঙ্গেই কলেজে পড়ে।

—ও, তাই নাকি! ছেলেটি এখন কি করছে? লেখাপড়া শেষ করেছে নিশ্চয়ই!

: সেতো এখন সাংবাদিকতা করছে। লেখা-ঠেখারও একটু ঝোঁক আছে। দু'-একখানা বই লিখেছে। নামও বেশ করেছে সাহিত্যিক মহলে।

—সাহিত্যিক হয়েছে! খুব আনন্দের কথা। আজকাল তরুণ সাহিত্যিকরা সমাজের নানা দিক ও সমস্যা নিয়ে লিখছেন! দু'একজনের লেখা বই পড়েছি, ভালই লেগেছে। তা' বীরেশের লেখা বই পেলেও পড়ে দেখব, কেমন লিখছে। তনুশ্রীকে বলব, লাইব্রেরী থেকে এনে দেবে।

: বীরেশের লেখা বই, আপনাকে লাইব্রেরী থেকে আনিয়ে পড়তে হবে কেন! ও নিজে এসে বই দু'-একদিনের মধ্যে দিয়ে যাবে। সাপ্তাহিক

একখানা বাঙলা সংবাদপত্র প্রকাশ করছে। সেটাও আপনাকে নিয়মিত পাঠাতে বলব।

সুরেশবাবু, সংবাদপত্রের কথা তুলতেই বিরক্ত হলেন দত্ত মশাই। তিনি বললেন, আজ কাল সংবাদপত্র বিশেষ পড়ি না। পড়তে ভালও লাগে না।

: তা' যা বলেছেন, আমারও ভাল লাগে না। কারণ কাগজ খুললেই তো যত রাজ্যের খুনোখুনি, রাজনৈতিক লড়াইয়ের সংবাদ! নেতাদের বিবৃতি আর পাল্টা বিবৃতি! এ'ছাড়া আজ—এ' কেলেঙ্কারী, কাল ঐ কেলেঙ্কারী! প্রকৃত সু-সংবাদ বলতে কোন কাগজেই কিছু থাকে না। যা থাকে তা' হল বন্ধ্ আর ধর্মঘটের দুঃসংবাদ। ঐ দুটোর যেন আজকাল প্রতিযোগিতা চলছে!

—দেশে সু-কাজ কেউ করলে তো তার সু-সংবাদ বেরুবে! প্রায় সকলেই তো কু-কাজ করে বেড়াচ্ছে। নখ-দন্তহীন ব্যাঘ্র হয়ে পড়েছি, তাই এখন সবই আমাদের সহ্য করতে হচ্ছে। নইলে দেশের এই দুঃসময়ে—!

দত্ত মশাইর মুখে অপ্রিয় সত্য কথাটা শুনেই নিমেষে তা' লুফে নিলেন সুরেশ বাবু। তারপর বেশ তির্যক ভাষায় বলতে আরম্ভ করলেন, দেশ ভাগের পরই যেন দেশের দুঃসময় আরম্ভ হয়েছে। এক শ্রেণীর স্বার্থপর লোভী লোক, কু-কর্মের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে! খাদ্য ও ঔষধে ভেজাল, চোরাকারবার, কালবাজারী, দুর্নীতির ছড়াছড়ি। মানুষের অস্থি, মজ্জার প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধে রয়েছে্ নানা কু-মতলব। যার ফলে সর্বত্র আজ এত দুর্নীতি! যত দিন যাচ্ছে আমাদের দুর্গতি যেন তত বেড়েই চলেছে। তারপর মরার উপর খাঁড়ার ঘা, অগ্নিমূল্য সব জিনিসের!

কথাগুলো শুনে দুঃখের হাসিতে ঘরখানার স্তব্ধতা ভাঙতে চাইলেন দত্ত মশাই। তিনি তাঁর কর্ম জীবনের সেই তেজোদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, সুনীতি যখন দেশে ছিল, তখন দুর্নীতি দুর্মূল্য মানুষের কাছে ঘেঁষতে পারেনি? এখন সু-নীতি বলতে কিছু নেই! সর্বত্র রন্ধ্রে রন্ধ্রে এত দুর্নীতি!

একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে হতাশ ভাবে সুরেশ বাবু বলেন, সুখ-শান্তি বলে আজকাল মানুষের মনে কোন পদার্থ নেই। এখন প্রাণ বাঁচাতে সবারই প্রাণান্তকর অবস্থা! সব দেখে-শুনে মনে হয়, যত তাড়াতাড়ি চোখ বুঁজতে পারি ততই মঙ্গল, নচেৎ কপালে হয়ত আরও দুঃখ আছে।

—হ্যাঁ, স্বাধীনতা যদি স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত—!

: ঐ স্বেচ্ছাচারিতার জন্যই তো আজ জনসাধারণের এত কষ্ট আর দুর্দশা, জানিনা এর শেষ কোথায়। কত দুঃখ যে—!

—কিসের দুঃখের কথা বলছেন কাকাবাবু?

আচমকা প্রশ্নটা কানে যেতেই দৃষ্টি ফেরান সুরেশবাবু—দেখলেন, তনুশ্রী চা ও জলখাবার নিয়ে ঘরের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। তার সঙ্গে মঞ্জুলাকে দেখে তিনি বললেন, জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করেছিস্ মঞ্জু?

মঞ্জুলা, দত্ত মশাইকে প্রণাম করতেই তাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন প্রমথ বাবু। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, তোমার বড় দিদির বিয়েতে আমি গেছলাম। তখন তুমি—?

: খুব ছোট্ট ছিলাম। মিষ্টি গলায় উত্তর দিলে মঞ্জু।

—তনুশ্রীর সঙ্গে তুমি পড়? তোমারও কি বাঙলায় অনার্স?

: হ্যাঁ।

—দাদা তো সাহিত্যিক হয়েছেন শুনলাম। তুমি কি হবে?

: এম, এ, পাশ করতে পারলে, অধ্যাপনা করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু শিক্ষা জগতের অবস্থা দেখে-শুনে কি করব তাই এখন ভাবছি। কবে যে আমাদের পরীক্ষা হবে তারই তো ঠিক নেই! গতবারের পরীক্ষার ফল এখন পর্যন্ত বেরোয়নি।

মেয়ের কথা শুনে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন সুরেশবাবু। তিনি বিনয় সহকারে বলে উঠলেন, একটি ভাল পাত্রের সন্ধান দিন না। ওর বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

সুরেশবাবুর কথার উত্তরে দত্ত মশাইরও ঐ একই নিবেদন। তিনি সহাস্যে বললেন, আপনি একটি পাত্র খুঁজছেন! আমার যে দরকার দু'টি। পেলে দু'জনকেই এক সঙ্গে পাত্রস্থ করতে পারি।

ওদের দু'জনের আলোচনায় বাধা দিয়ে তনুশ্রী বলে—চা, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কাকাবাবু! আগে ওটা খেয়ে নিন।

গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতেই প্রশ্নটা হঠাৎ রাখলেন সুরেশবাবু। আপনার বড় মেয়েটির জন্য পাত্র স্থির হয়ে আছে শুনেছিলাম।

দত্ত মশাই এবার দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকেন, না, পাত্র ঠিক স্থির হয়ে নেই। তবে একটি পাত্রকে মনে-মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু—!

: বড্ড বেশী দাবী-দাওয়া করে বসেছে বোধ হয়? আজ কাল কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ-মায়ের তো ঐটাই মহাসমস্যা!

—নাঃ দাবী দাওয়ার প্রশ্ন এখনও উপস্থিত হইনি। তবে—!

: তাহলে আর অসুবিধা কোথায়? আমি তো দাবী-দাওয়ার ভয়েই ভাল পাত্রের দিকে এগোতে সাহস পাচ্ছি না।

হঠাৎ পাত্র সম্পর্কে এই আলোচনার মোড় বাঁকা পথে চলে যেতে পারে, এই ভেবে প্রমথবাবু কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেলেন। সমস্যাটার কথা মনে হতেই তিনি একবার পিছন ফিরে তাকাতে চেষ্টা করেন। যেখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে অতীত ইতিহাসের জীর্ণ, ছিন্ন-ভিন্ন কয়েকটি মলিন পৃষ্ঠা। যা ঘাটলে খুঁজে পাওয়া যাবে এর মূল সূত্র।

সে আজ অনেক দিন আগের কথা সূত্রের সূচনা সেইদিন থেকেই—।

অবিভক্ত বাঙলার তখন ঘোর দুর্দিন, ১৩৫০ সাল। ঘরে-ঘরে হাহাকার গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরের সর্বত্র সেদিন চলছিল দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব নৃত্য। চারিদিকে সর্বহারাদের বুকফাটা আর্তনাদ, মৃত্যুর ভয়াবহতার দৃশ্য তখন প্রত্যক্ষ করেও যাঁরা দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত মানুষকে বঞ্চিত করে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তাঁরাই ১৯৪৬-এর দাঙ্গার ভয়াল-ভয়ংকর দিনে—দিশেহারা হয়ে বিচার প্রার্থনা করেছিলেন না, ধর্মাধিকারে? তাঁরা সেদিন ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, না? ধর্মাবতার! আজ আমাদের জীবন ও ধর্ম বিপন্ন! লাঞ্ছিত শত শত নর-নারী! গৃহহারা, সর্বহারাদের ক্রন্দনে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত! এ' রাজনীতি! না পাশব নীতি? এই প্রশ্নে তাঁরা বিচার চেয়েছিলেন না বিদেশীদের রাজ দরবারে?

নাঃ কিছুই ভোলেননি স্বাদেশীক প্রমথবাবু। সবই তাঁর মনে আছে। আজ পরিষ্কার তাঁর মনে পড়ছে বিদেশী রাজশক্তির উদ্ধত জবাব, চোখের সামনে ভেসে উঠছে বিচারের ফলাফলের দৃশ্য!

খণ্ডিত ভারত স্বাধীন হ'ল ১৯৪৭ সালে। সেই স্বাধীন ভারতের মসনদে বসলেন দেশের মানুষ। তাঁরা ছিলেন ভারতবাসীর প্রিয়জন, ছিলেন জননায়ক। স্বাধীনতা লাভের আনন্দে জনতার সেদিন কি উল্লাস! কি উন্মাদনা জেগেছিল জনস্রোতের মধ্যে! কত আলোকসজ্জা হয়েছিল তখন পথে প্রান্তরে! স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা কারান্তরাল থেকে পেলেন মুক্তি। তাঁদের শত সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল সংগ্রামের সেই অগ্নিমন্ত্র বন্দে মাতরম্। আনন্দের বন্যায় ভেসে গেল দিক থেকে দিগন্ত। উৎসবে মুখরিত হ'ল চারিদিক। সেই সুযোগে অর্থ পিশাচরা স্বাধীনতা উৎসবের মুনাফা লুটে নেয়নি? তাঁরা কারা! কোন্ দেশের লোক? তাদের বিচার কি আমরা করতে পেরেছিলাম?

তারপর দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। সর্বনাশা দেশ বিভাগের ফলে এল বাস্তুহারার জনস্রোত! তাই দেখে স্বার্থান্বেষী, অর্থ-পিশাচদের শ্যেন দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠল। যে, যে ভাবে পারল তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল। সর্বহারাদের মূলধন করে শুরু হল ক্ষমতা-লোভীদের আন্দোলন। অপরদিকে আরম্ভ হ'ল দুর্নীতি। বাস্তুহারাদের দৌলতে অনেকেই ফেঁপে ফুলে উঠল। মিথ্যা জাল জচ্চুরীর লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল রিলিফ অফিসগুলো। দুর্নীতি পরায়ণ অফিসারদের বিচারের নামে আরম্ভ হল আইনের প্রহসন! সেখানেও রাজনীতির দাবা খেলায় হেরে গেল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। শুরু হ'ল সত্যের বদলে অসত্যের জয় যাত্রা। চলতে লাগল রাজনৈতিক জুয়াখেলা। সাধারণ মানুষ নেতাদের কথার ফুলঝুরিতে বিভ্রান্ত হয়ে—!

অতীত স্মৃতির রোমন্থন করতে গিয়ে নিজেকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন ক্রুদ্ধ দত্ত মশাই। তাঁর সম্বিৎ ফেরালেন আগন্তুক সুরেশচন্দ্র রায়। তিনি এবার দক্ষ কৌঁসুলির মতই তাঁকে শুধালেন, আচ্ছা আপনার সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামী, স্নেহ-ভাজন শশিভূষণবাবুর খবর কি? তিনি এখন কোথায়? এম. এল. এ-ঠেম. এল. এ—হয়েছেন নাকি!

ভদ্রলোক শশীভূষণ বাবুর কথা তুলতেই ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠল প্রমথবাবুর মুখখানিতে। তিনি অতি সংযতকণ্ঠে জবাব দিলেন, রাজনীতির আধুনিক চালে সে হেরে গিয়েছে। চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ করার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার নেই। তাই সে কিছু করতে না পেরে বহু কাল যাবৎ নিরুদ্দেশ! আমি তার সঠিক খবর বলতে এখন পারব না। তবে ওর পরিবারের সকলেই এখানকার বাড়িতে থাকে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। একমাত্র ছেলে শরদিন্দু, সরকারী চাকরী করছে। ছোট মেয়ে কলেজে পড়ে. ঐ ছেলেই সংসার চালাচ্ছে। কদিন আগে ছুটিতে সে বাড়ি এসেছিল। দিন কয়েক হল আবার কর্মস্থলে চলে গেছে।

সুরেশবাবুর অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন, শরদিন্দু ছেলেটি কেমন? রোজগার-ঠোজগার কেমন করে? শুনেছি ওর বাল্যবন্ধু, আমাদের থানার অফিসার-ইনচার্জ। নলিনী বসুর সঙ্গে আবার বীরেশের খুব ভাব। ভদ্রলোক মানুষ নাকি খুবই ভাল। বিয়ে-থা করেন নি। বয়স ও খুব একটা বেশী নয়, বীরেশ বলে, ঐ রকম সৎ অফিসার আজ-কাল বড় একটা দেখা যায় না। ভাবছি বীরেশের সঙ্গে একদিন যাব থানায়। আলাপ করে আসব তাঁর সঙ্গে, আমার মত ওর নাকি মাছ ধরার বাতিক আছে!

—তা' আছে। ছোট্ট জবাবটি দিলেন প্রমথবাবু।

নলিনী বসুর কথা আবার বলতে লাগলেন সুরেশবাবু, গোয়েন্দা বিভাগে ছিলেন ভদ্রলোক, থানা অফিসারদের মতন মনোবৃত্তি নয় তাঁর। বীরেশ প্রায়ই ওর কাছে যায় সংবাদ সংগ্রহ করতে। সে তো—!

অন্যমনস্ক ভাবে কথাগুলো বোধ হয় এতক্ষণ শুনে যাচ্ছিলেন দত্ত মশাই। স্মৃতিপটে কি যেন খুঁজছিলেন! হয়ত আবার অতীত ইতিহাসের কথাই ভাবছিলেন।

এবার অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে দৃষ্টি ফেরালেন প্রমথবাবু. বর্তমানের প্রতি। তিনি নলিনী দারোগার প্রশংসা শুনে বলে উঠলেন, সৎ অফিসার হয়েও ভদ্রলোক কিছুই করতে পারেন নি। শুনেছি, উকিল পাড়ার এক মামলায় চার্জ সীট্ দেওয়ার পর থেকেই ওঁকে সরাবার জন্য স্থানীয় অনেকে উপর মহলে দরবার করেছেন! ভদ্রলোকের নেহাৎ

সার্ভিস রেকর্ড ভাল ছিল তাই—প্রমোশন হয়ে গেল। নইলে বেচারার যে, কি ঘটতো কপালে তা' কে জানে!

: নলিনী বাবুর প্রমোশন হয়ে গেল নাকি?

সুরেশচন্দ্র রায়ের কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্নের জবাবটা প্রমথবাবুর পরিবর্তে দিল তনুশ্রী। সে চায়ের সরঞ্জামগুলো গোছাতে গোছাতে বলল, জানেন কাকাবাবু! ভদ্রলোক—ডি, আই, ও হয়ে সদরে চলে যাচ্ছেন। আমরা যেদিন ওঁর বাড়িতে বেড়াতে গেছলাম, সেই দিনই তো অর্ডারটা উনি পেলেন। ভদ্রলোকের কথাবার্তায় বুঝলাম, থানার কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার সংবাদে তিনি খুব খুশী! অল্প দিনের মধ্যেই বোধহয় তাঁকে এখান থেকে চলে যেতে হবে!

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন সুরেশবাবু। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি বলে উঠলেন, একজন ভাল অফিসার ছিলেন নলিনীবাবু। লোকে ভয়ও করতো তাঁকে. কোর্টের উকিল, মোক্তাররা· নলিনী দারোগার তদন্ত রিপোর্টের খুব প্রশংসা করে। সবাই বলে, ভদ্রলোক দারোগা না হয়ে যদি বিচারক হতেন তাহলে—।

—এ্যাঁ! কি বললেন?

হঠাৎ সুরেশবাবুর কথার মাঝখানে বাধা দেওয়ার জন্যই খুব সম্ভব প্রমথবাবু প্রশ্নটা করে বসলেন। কারণ এতক্ষণ তিনি একটা চাঞ্চল্যকর বিচার কাহিনীর কথাই চিন্তা করছিলেন। অসাধারণ সে কাহিনী, আর তার বিচারক ছিলেন স্বয়ং তিনি। আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে কঠোর দণ্ড দিতে হয়েছিল তাঁকে। ঢহামান্য হাইকোর্ট থেকেও সেই দণ্ডই বহাল রাখা হয়। কারণ হত্যাপরাধ সমাজে অতি ঘৃণ্যতম অপরাধ বলেছিলেন সেদিন প্রধান বিচারপতি।

আসামীর কৌঁসুলি ঘটনাটিকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা পারেননি। কারণ দেশে তখন আইনের কড়া শাসন ছিল। আইনানুরাগী মানুষও ছিল। মানবতা, মনুষ্যত্ববোধ, প্রেম-ভালবাসায় পরিপূর্ণ থাকত তাঁদের হৃদয়। দয়া-মায়ার আকর ছিলেন তাঁরা। শুভবুদ্ধির দ্বারা সমাজ ও সংসার পরিচালনা করতেন সেই সব মানুষ। সততা এবং নিষ্ঠা বলে একটা জিনিস ছিল তাঁদের। পাপ-পুণ্যতে বিশ্বাসী,

সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত নর-নারীর অভাব তখন ছিল না বাঙলা-দেশে। যুগ যন্ত্রণা তাঁরাও ভোগ করে গেছেন। তবে তার রূপ ছিল অন্য রকম, এরই পাশাপাশি দেখা যেত আর একটি চিত্র।

সেদিনও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুব সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাঁরাও সামাজিক বিপ্লবের কথা বলতেন। তাঁদের বজ্রকণ্ঠে প্রায়ই শোনা যেত একটি কথা—, ঘুনধরা সমাজ, কু-সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মন, তার উপর রয়েছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়। অভাবে জর্জরিত মানুষের বাঁচার পথ রুদ্ধ। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের ঘরে নিত্য হাহাকার, তাদের অন্ন নেই! পরণে বস্ত্র নেই। নেই মাথা গোঁজার প্রয়োজনীয় ঠাঁই। সমাজপতিদের অত্যাচার-উৎপীড়নে তারা সর্বদাই বিব্রত। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস নয়। বাঁচতে হলে—রাজতন্ত্রের পদাঘাতের বিরুদ্ধে করতে হবে বিদ্রোহ।

একদিন সত্যিই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল হাজার-হাজার যুবক। শশিভূষণ ছিল তাঁদেরই মধ্যে একজন। বিদেশী রাজতন্ত্রের ভাষায় তখন তাকে বলা হত রাষ্ট্রদ্রোহী। তাঁদের ক্রিয়াকলাপ, গতিবিধির খবর যাঁরা রাখতেন তাঁরাই জানেন, ওরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দেশ-মাতৃকার চরণে। জীবন ও যৌবনের কোন রকম সুখ চিন্তাই ছিল না তাঁদের। সংগ্রামী মন নিয়েই তাঁরা দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেরিয়েছেন। ওদের আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয়। তাঁরা সবার নমস্য। কিন্তু সেই সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় অর্জিত গণতন্ত্রের আজ একি রূপ! স্বাধীনতা লাভের এত দিন পরেও কেন আজ ঘরে ঘরে হাহাকার? কেন আজ মানুষ বিচারের দাবীতে পাষাণে কপাল ঠুকে মরছে? কেন তারা নীরবে নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন করছে?

এক লহমার মধ্যে প্রমথ দত্তর মনের ভেতর একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতন সারা দেহের রক্তে জেগে উঠেছিল ঢেউ। উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ বোধহয় থর থর করে কাঁপছিল। তাই তিনি সুরেশবাবুকে কিছু বলতে পারছিলেন না। শুধু অন্তরের অন্তস্থলে অনেকক্ষণ ধরে অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করে যাচ্ছিলেন।

সাগরের বালুকাতটে অশান্ত তরঙ্গাভিঘাতে অসহায় শুক্তিকার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে দত্ত মশাই কি যেন বলতে চেষ্টা করছিলেন। তাঁর

সেই চেষ্টাকে প্রতিহত করে দিলেন সুরেশবাবু। তিনি বললেন, আমরা পুরান দিনের মানুষ। প্রগতিশীল যুগে ক্রমশ আমরা অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়েছি! আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতারও যে একটা মূল্য আছে, তা কেউ মানতে চায় না। অথচ নতুন যুগের যাঁরা মানুষ, তাঁরা আজ পর্যন্ত কোন সমস্যার সমাধানও করতে পারছেন না। যতদিন যাচ্ছে সমাজ জীবনে ততই সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি, চারিদিকের পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে! কি ভাবে যে, এর হাত থেকে মুক্তি পাব জানি না।

বিচারকের দৃষ্টি নিয়েই সুরেশ বাবুর কথাগুলো পর্যালোচনা করতে লাগলেন প্রমথ দত্ত। তিনি অতি সূক্ষ্ম ভাবে তৌলদণ্ডের কাঁটা নিরীক্ষণ করার মতই কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, হতাশগ্রস্ত অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কৌসুলির চোখের দিকে। যেমন তাঁকে একদা তাকিয়ে থাকতে হ'ত কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান প্রতিবাদীর প্রতি।

মৃদু হেসে বৃদ্ধ দত্ত মশাই বলে উঠলেন, স্বাধীনতা লাভের পর দেশের অনেক পরিবর্তন তো এই ক'বছরে দেখলাম। যে কোন উন্নতিকামী দেশে স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে, সঙ্গে এই রকম পরিবর্তন হতে পারে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়বোধ করছি কি দেখে জানেন? আমরা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছি। সমস্যা সৃষ্টির মূলে তো রয়েছি আমরাই! আমাদের চরিত্রের দিকে একবার তাকান, তাহলেই মুক্তির পথ—!

জীবন ও যুগ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি লাভের পথ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েই হঠাৎ কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল প্রাক্তন বিচারপতি প্রমথ দত্তর। তিনি কেন যেন অন্য জগতের চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়লেন। গুরুদেবের বাণী তাঁর অন্তরকে বড়-চঞ্চল করে তুলল। নিজের অজ্ঞাতেই মুখে এসে গেল গীতার সেই পরম সত্য উক্তিটি—

"লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মনঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥
কাম ক্রোধ বিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥"

সহসা দত্ত মশাইর ভাবান্তর লক্ষ্য করে সুরেশবাবু বলে উঠলেন, আপনার বাড়িটি আমার কিন্তু ঘুরে দেখা হ'ল না। শুনেছি, নানা ফুল ও ফলের গাছ আছে আপনাদের বাগানে।

—আরে কি আশ্চর্য! এতক্ষণ নানা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে, বলতে বাগান দেখানোর—।

: না-না তাতে কি হয়েছে। ওর জন্য আপনার সংকোচের কোন কারণ নেই। আমি নিজেই তো বাগান দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করি নি। আসলে কি জানেন? এখন কোথাও গেলেই বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ছাড়া অন্য কোন কথা হয় না। আর এই সব আলোচনা একবার আরম্ভ হলেই ব্যস্। একটার পর একটা—প্রসঙ্গ আপনা থেকেই এসে পড়ে। আমরা অতীত দিনের মানুষ, বর্তমান যুগের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে হারানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন না করে পারি না।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন—আমরা এখন রোমন্থনকারী জীবই হয়ে যাচ্ছি বটে। তাইতো নিভৃতে বসে প্রতিদিন অতীত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করি। আমার স্ত্রীর ফুলের বাগান করার খুব সখ ছিল। সেই বাগান তৈরী করিয়েছিল। তাঁর সাজান বাগান যাতে শুকিয়ে না যায়, তার জন্য মালীদের কাজ তদারক করি। বাকি সময়টা—!

: আর কাটতে চায় না তো? আমারও ঐ এক অবস্থা। সহাস্যে মনের কথা প্রকাশ করে ফেললেন সুরেশবাবু।

দুই বৃদ্ধ কথা বলতে, বলতে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করতেই, যোগেন ও হরেন মালী—হাতের খুড়পি মাটিতে রেখে প্রণাম জানাল। ব্যস্ত হয়ে চন্দ্রমল্লিকার গাছগুলোর সঙ্গে বাঁধা কঞ্চির বাঁধন শক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

মালীদের ব্যস্ততা দেখে দত্ত মশাই, যোগেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে, গাছগুলোতে যে সার দিতে বলেছিলাম দিস্‌নি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ সকালেই সার দিয়েছি। গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়ে রাখছি। ক'দিন শিশির পাক। তারপর সার দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দেব!

: চমৎকার বসন্ত-মালতীর গাছ হয়েছে দেখছি। দু'দিন পরেই তো

ফুলে গাছ ভরে যাবে। ঘন সবুজ পাতার আড়ালে সাদা থোকা, থোকা ফুল ফুটলে— !

সুরেশ বাবুর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে দত্ত মশাই বলে উঠলেন, বনশ্রীর মায়ের বড় প্রিয় ফুল ছিল এই বসন্ত-মালতী। সে রোজ ভোরে সাজি ভর্তি করে ফুল তুলে ঠাকুর বাড়ি পাঠিয়ে দিত। একেতো সাদা ফুল তার উপর অত্যন্ত সুগন্ধ ! ঠাকুর মশাই খুব খুশী হতেন সেই ফুল দিয়ে পুজা করে। তিনি বলতেন, শুভ্র ফুলের মতই তোমাদের জীবনে শান্তি বিরাজ করুক, প্রতিদিন ঈশ্বরের চরণে এই প্রার্থনা করি।

: তাঁর সে প্রার্থনা তো ব্যর্থ হয়নি ! তিনি ভাগ্যবতী নারী ছিলেন, স্বামী আর কন্যাদের রেখে, শান্তিলোকে চলে গেছেন ! তাঁর আত্মার শান্তি— !

কথা ক'টি আর শেষ করতে পারলেন না সুরেশ বাবু। দত্ত মশাইর সজল আঁখি দু'টির দিকে তাকিয়েই তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করতে লাগলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল—দত্ত মশাইর স্ত্রীর সেই শান্ত, সুন্দর, মমতাময়ী রূপের কথা। তিনি ছিলেন ঠিক লক্ষ্মী-প্রতিমার মতন। তাঁর যেমন ছিল রূপ, ঠিক তেমনি ছিল গুণ। লোকে বলত, দত্ত মশাইর ভাগ্যের উন্নতির মূলে ছিলেন কল্যাণী দেবী ! তিনি শুধু সুগৃহিণীই ছিলেন না। ছিলেন দত্ত মশাইর ভাগ্যলক্ষ্মী। তাঁর শুভাগমনের পর থেকেই সংসারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত পদোন্নতি লাভ করেছিলেন প্রমথবাবু ! তাই তিনি বন্ধু বান্ধবদের ঠাট্টা করে বলতেন, আরে বাপু—স্ত্রী ভাগ্যে ধন একথা মিথ্যা নয়। দেখছ না স্ত্রীর ভাগ্যেই আমার—!

মঞ্জুলার মা সেই কথাই এতক্ষণ বলছিলেন, বনশ্রীদের। তিনি প্রমথবাবুর প্রশংসা করতে গিয়েই বলে ফেললেন, উনি ভাগ্যিস সেবার আমাদের গাঁয়ে ঘটনা চক্রে গিয়ে পড়েছিলেন। নইলে সুমিত্রাদিকে নিয়ে যে কি কেলেঙ্কারীই হত তার ঠিক নেই। ওঁর চেষ্টাতেই শশিভূষণ বাবুর সঙ্গে সুমিত্রাদির বিয়েটা হয়েছিল। অবশ্য তোমার মা কল্যাণীদিই এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

—তাই নাকি ? বিস্ময় ভরা বিরাট প্রশ্ন বনশ্রীর।

: হ্যাঁ, সে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ! তোমার বাবা তখন আমাদের

মহকুমা হাকিম ছিলেন। গাঁয়ের একটা অনুষ্ঠানে উনি সেবার সভাপতিত্ব করতে গেছলেন। সঙ্গে কল্যাণীদিও ছিলেন। সেইদিন গোধূলি লগ্নে সুমিত্রাদির বিয়ে। বেলাবেলি বর আসার কথা। তাই কন্যা পক্ষরা সকলে পথ চেয়ে বসেছিল কখন বর আসে। দেখতে-দেখতে বেলা শেষ হয়ে গেল। প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয় আর কি। গোধূলি লগ্ন উত্‌রে যাওয়ার উপক্রম, অথচ বর আসছে না দেখে বাড়ির লোকজন ব্যস্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ খবর এল পথে বরযাত্রীর সঙ্গে অন্য আর একটা গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটায় বর গুরুতর আহত হয়েছে। সজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করতে নিয়ে গেছে। এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদে বিয়ে বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এল। দিশেহারা হয়ে পড়লেন তখন কন্যাপক্ষ। তাঁরা কি করবেন, অসহায় বোধ করতে লাগলেন। সুমিত্রাদির বাবা, মা এবং বড় ভাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, লগ্নভ্রষ্টা মেয়ের কি হবে? চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন সবাই।

—তার পর? একনিঃশ্বাসে, একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে বসল—বনশ্রী আর তনুশ্রী।

: এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সংবাদ শোনামাত্র দত্ত সাহেব সভাপতির আসন থেকে উঠে ছুটে গেলেন, মহকুমা হাসপাতালে। তিনি গিয়ে দেখলেন সাংঘাতিক অবস্থা বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। বরযাত্রীরা বিনা মেঘে বজ্রাহত। সকলে বেদনায় বিহ্বল। শোকে মুহ্যমান পাত্রের পিতা, দত্ত সাহেব এর সামনেই, বুক ফাটা আর্তনাদে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এই পর্যন্ত বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মঞ্জুলার মা। তারপর আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে, ধরা গলায় বলে উঠলেন, তোমার মা আর বাবা, দু'জনে দুই পক্ষের লোকজনদেব সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

—সেদিন বিয়ে—!

: হ্যাঁ, সেদিন বিয়ে আর হবে না আমরাও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসাধ্য-সাধন করলেন দত্ত সাহেব। তিনি বললেন, আজ রাত্রে যে ভাবেই হোক মেয়েটির বিয়ে দিতে হবে। নইলে আত্মগ্লানিতে শেষ পর্যন্ত মেয়েটি হয়ত আত্মহত্যাই করে বসবে। তোমার মাও তাই

ভাবছিলেন সুমিত্রাদির মনের অবস্থা দেখে। তাঁর চেষ্টাতেই সেই রাত্রে শশিভূষণবাবুর সঙ্গে সুমিত্রাদির বিয়ে হয়ে গেল। খুবই নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যে ওঁদের বিয়ে দিয়ে দিলেন দত্ত সাহেব, কি করবেন! এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। লগ্ন ভ্রষ্টা তার উপর কুলক্ষণা মেয়ে—!

—শশিভূষণবাবুকে তখন বাবা পেলেন কোথায়?

: বোধ হয় উনি সেদিন সকালেই কি একটা কাজের জন্য দত্ত সাহেবের কাছে এসেছিলেন। তোমার মায়ের পরামর্শেই তাঁকে এনে কাজটা সুসম্পন্ন করা হয়েছিল। বুঝলে, একেই বলে দৈবের লিখন। কার যে, অদৃষ্টে বিধাতা পুরুষ কি লিখেছেন, তা বলা শক্ত।

দৈবের লিখন! এই ছোট্ট কথাটি মুহূর্তের মধ্যে গভীর রেখাপাত করল সবার মনে। স্তব্ধতা বিরাজ করছিল ভাববিহ্বল চারটি সুকোমল নারী হৃদয়ের অন্তঃস্থলে। বেদনার্ত বনশ্রীর মুখে অস্ফুট ভাবে প্রতিধ্বনিত হ'ল মাত্র কয়েকটি শব্দ—অদৃষ্ট লিপি! কে জানে কার ভাগ্যে কি আছে।

॥ বার ॥

সেদিনের ঘটনার পর থেকেই কিন্তু নিজের অদৃষ্টের বিড়ম্বনার কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করছিলেন সুমিত্রা দেবী। সেই সঙ্গে বিবেকের দংশনে মন ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল তাঁর। তাই আজ হয়ত ভাবছেন—জীবন যুদ্ধে পরাজিতা, অভিশপ্তা নারী তিনি, নইলে এমন করে একটার পর একটা অঘটন ঘটবে কেন তাঁর জীবনে! সুখ ও শান্তির স্বাদ কেন পেলেন না তিনি? আর পাঁচ জন নারীর মতই তাঁরও মনে তো কামনা বাসনা ছিল। সুখের সংসারের স্বপ্ন একদিন তিনিও দেখেছিলেন। স্বামী পুত্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চিন্তা কোন নারীই কখনো করতে পারে না। কোনদিন তিনি তা কল্পনাও করেন নি। তবু কেন তাঁর ভাগ্যে তাই ঘটল! কেন তাঁর জীবনে এত দৈব দুর্বিপাক! শান্তি কি জীবনে তার আসবে না! ব্যর্থতার অভিশাপ থেকে তিনি কোনদিন মুক্তি কি পাবেন না!

মায়ের কথা ভাবলে বড় দুঃখ হয় শরদিন্দুর। সত্যিই সাংসারিক জীবনে শান্তি কোনদিন পাননি তিনি। বাবার মতন ভাগ্যের সঙ্গে তাঁকেও আজীবন লড়াই করতে হয়েছে। ছোট-বেলা অনেক কষ্ট পেয়েছেন দু'জনে। যৌবনে তাঁরা নানাভাবে চেষ্টা করেছেন সুখের সংসার গড়তে। অভাব-অনটনের মধ্যে দু'টি মেয়ে ও একমাত্র পুত্রকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে গিয়ে ধার দেনায় ডুবে গেছলেন বাবা। তার উপর বড় বোনের বিয়ে দিতে তাঁকে বাস্তু ভিটেটুকু বন্ধক রাখতেও হয়েছিল। যা' ছাড়াবার জন্য—!

আর ভাবতে পারেনা শরদিন্দু, বেশীক্ষণ এ'সব কথা ভাবলে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে তার। তবে একটা কথা সব সময়ে শুধু চিন্তাই সে করে না, বহুবার মাকে স্মরণ করিয়ে পর্যন্ত দিয়েছে, যে প্রমথবাবুর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তিনিই আমাদের সর্বহারা হতে দেননি, চিরকাল আগলে রেখেছেন। সর্বদা আমার মঙ্গল চিন্তা করেন। শুধু কি তাই, তাঁর সুপারিশেই তো চট্ করে চাকরীটা পেয়েছিলাম।

এই সেদিন পর্যন্ত শরদিন্দুর মা, সে কথা স্বীকারও করেছেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর কেন যে মানসিক পরিবর্তন ঘটলো আজও তা বুঝে উঠতে পারল না বেচারা শরদিন্দু। সমগ্র ব্যাপারটাই তার কাছে রহস্যজনক এবং বড় অদ্ভুত মনে হচ্ছে। যাঁদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের মধুর সম্পর্ক, যাঁরা সুখে, দুঃখের সমব্যথী। তাঁদের সঙ্গে রাতারাতি তিক্ততা সৃষ্টি হ'ল কেন? এই কেনর জবাবটা খুঁজে পায় না সে। শুধু ভাবে, তবে কি কারও স্বার্থে—।

ঠিক এই কথাটাই ভাবছিল নলিনী বসু। নতুন বড় দারোগাকে থানার চার্জ বুঝিয়ে দেওয়ার পর সহকর্মীগণ, সকলে যখন তাঁকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলতে লাগল, স্যার আমরা যদি কোন অন্যায় করে থাকি, তাহলে আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন। আপনার কাছ থেকে এতদিন যে স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি, তা' যেন চিরকাল অক্ষুন্ন থাকে। আমরা কেউ চিরদিন এক জায়গায় থাকতে পারব না। পরস্পরের ব্যবহার-টুকুই আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চিত থাকবে।

সহকর্মীদের কথা ক'টি অতি সাধারণ সৌজন্যমূলক হ'লেও তার মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা আছে। বিশেষ করে নলিনী বসুর স্নেহমুগ্ধ মেজবাবু ও ছোটবাবুর প্রতিটি কথায় তারই অভিব্যক্তি। সত্যিই এরা সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করে, প্রকৃত ভালবাসে, নিঃস্বার্থ সে ভালবাসা।

সত্যেনবাবু তো পরিহাসচ্ছলে বলেই ফেললেন, স্যার, আমরা খুব আশা করেছিলাম—এর পরের শুভ কাজটা আপনি এখানেই সেরে যাবেন।

ছোটবাবুর কথা শুনে হেসে উঠল নলিনী বসু। হাসতে-হাসতেই সে বললে, আরে মশাই আপনি তো জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী। কথায় কথায় সকলকে গ্রহরত্ন ধারণ করতে বলেন। গ্রহ সঞ্চারের ফলাফল নিয়ে সর্বদা পর্যালোচনা করেন। আজ চলুন আমার বাসায়। কোষ্ঠীটা দেখে বলবেন, কেন শুভ কাজটার এত বিলম্ব ঘটছে! আদৌ কোনদিন সেই শুভদিন আমার জীবনে আসবে কিনা, তা যদি বলতে পারেন, তাহলে বুঝবো আপনি সত্যিই জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

—কি যে বলেন স্যার। আপনি করছেন না তাই, নইলে কবে শুভ কাজটা হয়ে যেত। আমরা কিছু কিছু খবর তো রাখি।

দুই সহকর্মীর মুখে একই কথা উচ্চারিত হতেই নলিনী বসু আচম্কা বলে উঠল, সর্বনাশ করলেন তো? দু'জনের মুখেই এক কথা। অসময়ে এখন কেউ আবার এসে উপস্থিত হবে না তো।

—আপনি আবার এ'সব মেয়েলী সংস্কারও মানেন নাকি?

একটু তির্যক ভাষায় নলিনী বসু জবাবটা দিল, মানিনা অনেক কিছুই। তবে মনের সংস্কার যাবে কোথায়। নইলে কোষ্ঠী দেখার কথা বলি? জানেন তো ঠেকায় পড়লে আমরা দেবমন্দিরে ধর্ণা দিই, মানত করি। জ্যোতিষীর বাড়ি দৌড়াই। গ্রহ-শান্তির জন্য রত্ন ধারণ করে মনের সাহস বজায় রাখি। আসলে সবই—।

দুই সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে কথা বলতে বলতে, দাদাবাবুকে অসময়ে হঠাৎ বাসায় ঢুকতে দেখে দয়াল ঠাকুর অবাক হয়ে গেল। প্রথম থেকেই সে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল ছোটবাবুর মুখের দিকে। কারণ ওঁদের আলোচনার কিছুই বুঝতে পারছিল না সে। তবে সত্যেন বাবুর দু' একটা কথা শুনে তার মনে হ'ল বিয়ে-সাদির আলোচনাই চলছে। কান পেতে সব কথা শুনতে লাগল দয়াল। দাদাবাবুর বিয়ে হবে, এটা তার ভাবতেও যে ভাল লাগে!

সত্যেনবাবুই আবার কথাটা তুললেন, জানেন স্যার, জাতকের যদি জায়া স্থানে বুধগ্রহ শুভ থাকে, এবং যদি চন্দ্র বলবান হয়, তাহলে জাতকের সুন্দরী স্ত্রী লাভ হবেই। সেই সঙ্গে শুক্র শুভ থাকলে তো কথাই নেই। শুক্র ও চন্দ্র যদি জন্ম রাশিচক্রে পরস্পর সপ্তমে অথবা সপ্তম এবং দ্বিতীয় স্থানের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে প্রণয়মূলক!

—তাই নাকি? শুভ বুধ, শুক্র আর বলবান চন্দ্রের এত ক্ষমতা!

: হ্যাঁ স্যার, বড় বড় জ্যোতিষীরা এই কথাই বলেন। তাঁরা অবশ্য আরও একটা কথা বলে থাকেন, সপ্তমস্থ বৃহস্পতি জাতককে স্ত্রী সুখে-সুখী করে। কিন্তু রাহু, শনি অথবা মঙ্গলের কু-দৃষ্টি পড়লেই সর্বনাশ! অবশ্য এরা যদি শুভ হয়—!

সত্যেনবাবুর বক্তব্য শেষ হবার আগেই নলিনী বসু নিজের কোষ্ঠীটা বার করে দিয়ে বললে, নিন এবার দেখে বলুন আমার রাশিচক্রের কোথায় বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র আর চন্দ্র অবস্থান করছেন? তবে হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত যেন

বলবেন না। 'মনসা চিন্তয়েৎ কর্ম, বচসা নঃ প্রকাশয়েৎ।' প্রবাদ বচনটি বলার পর হেসে উঠল তিন জনেই।

দয়ালকে তিন পেয়ালা চা তৈরী করতে বলে, স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে সিগারেট ধরাল নলিনী বসু।

ভদ্রলোকের কথার ধরণ দেখেই সত্যেনবাবু, তাঁর মনের দুর্বলতা কোথায় তা' বুঝতে পারলেন। তার পর কোষ্ঠীটার উপর চোখ বুলিয়ে প্রবাদ বচনটি বলার উদ্দেশ্য ধরে ফেললেন। তাই তিনি কি বলবেন ভেবে পেলেন না। বার-বার খালি হিসাব কষতে লাগলেন। কারণ লগ্ন আর সপ্তমে অবস্থিত গ্রহগুলি তাঁকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। রাশিচক্রে যা দেখছেন, তা ভাষায় প্রকাশ করতেও পারছেন না।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আবার গম্ভীর মেজাজে সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল নলিনী বসু। তারপর বেশ তির্যক ভাষায় বলতে শোনা গেল, কি হল! একেবারে চুপ মেরে গেলেন যে? প্রবাদ বচনটা শুনে ঘাবড়ে গেছেন বোধ হয়? না না ঘাবড়াবার কিছু নেই। আপনি যা দেখছেন তাই বলুন। ও বিষয়ে আমার কিন্তু মনে কোন সংস্কার নেই।

—না স্যার, সংস্কারের কথা ভাবছি না। ভাবছি—আপনার মতন লোকের এ'রকম রাশিচক্র হয় কি করে! জন্ম সময়টা ঠিক আছে তো! লগ্নটা!

: বাবা, জ্যোতিষী জানতেন। তিনিই কোষ্ঠী করে রেখে গেছেন। অবশ্য জন্ম সময়টা ঠিক আছে কি না বলতে পারব না। আমাদের বাড়িতে ঘড়ি ছিল বোধ হয় মেলানো—!

—তাহলে তো লগ্ন ভুল হওয়ার কথা নয়। আমি অবশ্য কোষ্ঠী বিচার খুব ভাল একটা বুঝি না। তবে সামান্য যতটুকু বুঝি বা জানি তাতে বলতে পারি, যাঁর লগ্নে সপ্তম পতি মঙ্গল, শনি যুক্ত এবং জায়া স্থানে পাপ গ্রহের পূর্ণ— !

সত্যেনবাবুর অসমাপ্ত মন্তব্যের জের টেনে নলিনী বসু বলতে লাগল, জায়া স্থানে পাপ গ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি থাকায়, জাতকের বিবাহে বিঘ্ন এবং লগ্নে শনি আর মঙ্গল যুক্ত জনিত দোষের জন্য স্ত্রী সুখের হানি, এমন কি দ্বিভার্যা যোগ বা কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এই তো?

নলিনী বসুর কণ্ঠে তাচ্ছিল্য ভরা কথাকটি শুনে আঁতকে উঠলেন মেজবাবু। তিনি বললেন, সর্বনাশ! আপনারও দ্বিভার্যা যোগ! সপ্তমস্থ অশুভ গ্রহের ফল যে, কি সাংঘাতিক তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তাচ্ছিল্য করবেন না স্যার—প্রতিকার করুন, নইলে আমার মতন সারা জীবন ভুগতে হবে।

: আপনার মতন ভুগতে হবে মানে! ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। কেন কি হয়েছিল আপনার ?

আত্মকথা প্রকাশে এবার মুখর হয়ে উঠলেন মেজবাবু। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে তিনি বললেন, দেখছেন তো আমার পারিবারিক জীবন! প্রথম জীবনের ঘটনা আরও দুঃখের। যৌবনের উন্মাদনায় ভাগ্য—অদৃষ্ট এ'সব শব্দকে আজকের তরুণ-তরুণীরা যেমন উপেক্ষা করে, তারুণ্যের শক্তিকে চলমান জীবনের প্রধান হাতিয়ার মনে করে থাকে, আমিও একদিন তাই ভাবতাম, সেই শক্তির জয়গান করে বেড়াতাম। কলেজে ইউনিয়ন করতাম। বিপ্লবের বক্তৃতা দিতাম। যুব শক্তির অপচয় রোধ করার জন্য অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতাম। সু-সংস্কৃতির প্রচারকার্য চালাবার উদ্দেশে পত্রিকা প্রকাশ করতাম। কফি হাউসের আড্ডায় কখনও উষ্ণ, কখনও শীতল ছোট্ট পেয়ালার বুকে তর্কের ঝড় বইয়ে দিতাম। কাজল পরা কোন তরুণীর দৃষ্টি আমার প্রতি আকৃষ্ট হলে, নিজের বাচনভঙ্গীর জন্য নিজেই গর্ব অনুভব করতাম। তখন কি জানতাম—জীবন এত জটিল? তখন চিন্তাই করিনি—তারুণ্যের শক্তি, যৌবনের উন্মাদনা নদীর জোয়ার-ভাঁটার মতই ক্ষণভোগ্য! ক্ষণস্থায়ী তার মাধুর্য, ক্ষণস্থায়ী তার রূপের সৌন্দর্য। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে—চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় স্বপ্ন স্মৃতিসৌধ। ছিঁড়ে যায় জীবন বেদের সকল পৃষ্ঠা।

মেজবাবুর প্রেমের কাহিনীর গৌরচন্দ্রিকায় বিরক্ত বোধ করছিল নলিনী বসু। কাজেই তাঁকে মাঝ পথে থামিয়ে দেওয়ার জন্যই সে বলতে বাধ্য হল, আরে মশাই আপনার সপ্তমস্থ অশুভ গ্রহের ফলাফলের কথা আগে বলুন। কলেজ লাইফে অনেকের অনেক কিছুই ঘটে। আপনারও তখন কি ঘটেছিল, এখন আর শুনে লাভ নেই। তার চাইতে বরং—।

মনের আবেগ এবার সংযত করে নিলেন মেজবাবু। দয়ালের কাছে

থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল চেয়েও খেলেন। তারপর সংক্ষেপে বলতে লাগলেন, এক বান্ধবীকে গোপনে বিয়ে করেছিলাম। রেজেষ্ট্রী ম্যারেজের কথাটা তার এবং আমায় বাড়ির কেউ জানত না। ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন দুই পরিবারেই প্রচণ্ড বিক্ষোভের ঝড় উঠল। কোন পক্ষই আমাদের সমর্থন করল না! বাবা পরিস্কার বলে দিলেন— স্বেচ্ছাবিবাহে যত রোমাঞ্চই থাক না কেন, আনুষ্ঠানিক বিবাহের মতন জিনিস হয় না। অগ্নি সাক্ষী করে মন্ত্রপাঠের মধ্যে যে প্রাণপ্রাচুর্য আছে, তাকে যদি তোমরা কুসংস্কার মনে কর! স্বেচ্ছাচারিতাই যদি তোমাদের সংস্কৃতি হয়, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। আমি শুধু একটি কথাই বলব, যে সন্তানের বিবাহ পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে, বাবা-মায়ের অশ্রু ঝরায়, তাকে আমি কোন মতেই—!

কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না মেজবাবু। কণ্ঠে বেদনার সুর বেজে উঠল, তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে আসার উপক্রম হতে দেখেই সত্যেন বাবু বলে উঠলেন, স্যার! বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এটা কিন্তু সপ্তমস্থ অশুভ গ্রহেরই প্রতিক্রিয়া। সাধারণতঃ জাতকের উপর পাপ গ্রহের প্রভাব থাকলে, এ'রকম হয়ে থাকে। নীচু জাতের মেয়ের পাণি গ্রহণ করলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই!

এতক্ষণ নলিনী বসু একমনে মেজবাবুর প্রণয় কাহিনী শুনছিল। সত্যেন বাবুর মন্তব্যে তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখে মুখে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। মনে পড়ে গেল শরদিন্দুর কথা। চোখের উপর ভেসে উঠল— মীতার জন্মদিনের সেই মধুময় সান্ধ্য মজলিসে বসে বাক্যালাপের দৃশ্যটি। রোমাঞ্চকর সেই ক্ষণটির স্মৃতিচারণ করতে গিয়েই মনের জানালায় উঁকি দিল সেই অতি চঞ্চলা তরুণীটি। চোখে মুখে তার বিক্ষুব্ধ ভাব। মনের মধ্যে মহা-জিজ্ঞাসা! এক কথায় মেয়েটি রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ার উপক্রম আর কি!

হ্যাঁ—তনুশ্রীর কথাই ভাবছিল নলিনী বসু। সেদিনের সেই ঘটনার পর ওরা যখন মীতাকে কিছু না বলেই চলে গেছল, তখনই সে বুঝতে পেরেছিল—ওদের মর্যাদাবোধ কতখানি, হবে না কেন! অমন বাপের মেয়ে যখন, তখন বুঝতেই হবে ছেড়ে কথা কওয়ার মতন মেয়ে নয় ওরা।

বড় জন যদিও বা রয়ে সয়ে যায়, কিন্তু ছোট জন সে পাত্রীই নয়। দরকার হলে সে হয়তো সোজা থানায় এসেই হাজির হবে।

নলিনী বসুর অনুমান মিথ্যা হ'ল না। পরদিন সকালেই তার বাসায় ধূমকেতুর মতন এসে উপস্থিত হ'ল তনুশ্রী। সে যেমনটি তাকে কল্পনা করেছিল, ঠিক তেমনটিই যেন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করতে লাগল!

— কি! আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেছেন নিশ্চয়ই?

: না, অবাক হওয়ার কি আছে। তবে ভাবছি এই সাত সকালে তুমি আমার বাসায় একলা কেন? খবর দিলে তোমাদের বাড়িতে আমিই না হয় যেতাম।

—আপনাকে আর আমাদের বাড়িতে যেতে হবে না। একবার যাওয়ার ঠ্যালায় যা দুর্নাম ছড়িয়েছে, তাই আগে সামলাই।

: দুর্নাম! কিসের দুর্নাম? বিস্ময়পূর্ণ প্রশ্ন নলিনী বসুর।

কান্না জড়িত কণ্ঠ তনুশ্রীর। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সে বলতে থাকে, মীতুদিরা, মা—মেয়ে দু'জনেই আমার নামে যা' নয় তাই বলে বেড়াচ্ছেন। আমি নাকি আপনাকে বশীকরণ করেছি। যত সব মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে—। তাই আমি ওঁদের নামে ডায়েরী করতে এসেছি। চালাকি পেয়েছে ওরা। ভদ্রঘরের একজন কুমারী মেয়ের নামে—।

: তোমার নামে ওরা যা' নয় তাই বলে বেড়াচ্ছেন। মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন। তাই তুমি ওঁদের নামে ডায়েরী করতে এসেছ? সত্যিই দেখছি তোমার ছেলে-মানুষী বুদ্ধি এখনও যায় নি। আরে বাবা, মানুষের কথায় এত বিচলিত হলে চলে? নাঃ তোমার সম্পর্কে দেখছি শরদিন্দু ঠিকই বলে, তুমি—!

—আপনি হাসলে কি হবে! আমি ওদের নামে আজ ডায়েরী করাবই। দরকার হয় মানহানির—।

: মামলা করবে? হেসে উঠল নলিনী বসু। তারপর দয়ালকে ডাকল। দয়াল ঠাকুর আসতেই নলিনী বসু বললে, দিদিমনি এসেছেন। ওকে এককাপ কফি খাওয়াও। কফির সঙ্গে আর কি দেবে?

—না, আমি কিছু খাব না।

ঃ আরে তাই কি হয়! সকাল বেলায় থানায় ডায়েরী করাতে এসেছ, খালি মুখে ফিরবে কেন? আর কি খাবে বল। জান না! পুলিস যেমন ঘুস খায়, তেমনি কর্তাব্যক্তিদেরও খাওয়ায়। তোমার মতন কর্তা-ব্যক্তিকে হাতে পেয়ে না খাইয়ে ছাড়া কি ঠিক হবে— ?

এবার কান্নার বদলে অভিমানে ভেঙ্গে পড়ল। বেশ ঝাঁঝাল গলায় তনুশ্রী বললে, আপনার আর কি। আপনি প্রমোশন পেয়ে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। শরদিন্দুদাও সেই যে, রাগারাগি করে বাড়ি থেকে চলে গেছেন, তাঁর আর কোন খবরই নেই। ওঁদের এখন যত রাগ আমাদের উপর। আমরাই নাকি—।

ঃ থামলে কেন? বল, সব শুনি। ডায়েরীটা লেখাতে হবে তো।

—শুনে আর কি করবেন? পারেন তো আপনার বন্ধুকে ট্রাংকল করে বলুন, একবার বাড়ি আসতে। তিনি এসে এর যা' হয় একটা হেস্ত-নেস্ত করে যান, নইলে—!

দয়ালঠাকুর দু' পেয়ালা গরম কফি আর জল খাবার এনে টেবিলে রাখতেই, তনুশ্রী ক্ষেপে উঠল। সে ঝগরাটে মেয়ের মতই বলে উঠল, আমি কি রাক্ষস?

তুমি রাক্ষস হতে যাবে কেন? হাসিতে ঘরখানা ভরিয়ে দিয়ে নলিনী বসু তাকাল তনুশ্রীর সুন্দর মুখখানির দিকে।

—তবে এত খাবার কি হবে। আপনি খান। আমি শুধু কফিটা খাচ্ছি।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতেই তনুশ্রীর, মন মেজাজ যেন একটু শান্ত হয়ে এল। এক ঝলক হেসে বললে, দয়ালদা। তুমি এত চমৎকার কফি বানাতে পার?

বিনয়ে মাথানত করল দয়াল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, আর এক পেয়ালা খাবেন? করে দেব?

—না, না। তোমার দাদাবাবুকে বরং আর এক পেয়ালা তৈরী করে দাও। দুধ এই রকম বেশী দিও। বেশ হয়েছে কফিটা।

কৌতুক প্রিয় নলিনী বসু। হঠাৎ তনুশ্রীর মেজাজের পরিবর্তন দেখে একটু নীচু গলায় বলে ফেলল, দেখলে ঘুসের কি অসাধারণ ক্ষমতা? খেলেই

গরম মেজাজ বরফের মতন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ব্যস্ তাহলেই কর্মফতে। এই জন্যই তো মানুষ ঘুষ দেয়। এই যেমন ধর, আমি তোমাকে—! না-না, ওঁরা বলেছেন—তুমি আমাকে ব-শী ক-র-ণ। .

তনুশ্রীর ঠাণ্ডা মেজাজ আবার গরম হয়ে গেল। উত্তপ্ত কড়াইয়ে শীতল জল পড়লে যেমন ছ্যাক্ করে উঠে, ঠিক তেমনি সে ছ্যাক্ করে উঠল, বললে, আপনি আমাকে কি বলতে চান? ডায়েরী করাতে এসেছি বলে, যা' মুখে আসে তাই—।

কথা ক'টি বার তিনেক বলেই তনুশ্রী, চোখের জল ফেলতে আরম্ভ করল। অভিমানে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করেও রইল। বেচারা দয়ালঠাকুর, আর দু' পেয়ালা কফি তৈরী করে এনে খুব ফ্যাসাদে পড়ে গেল। দু'জনকে নীরব দেখে সে কি করবে তা' ভেবেই পাচ্ছিল না।

শরদিন্দুর প্রিয়-বান্ধবীর ছোট বোনকে, এখন কি করে সামলাবে নলিনী বসু। ভদ্রলোক বলতে গেছল এক, আর সে বুঝল তার উল্‌টো। এই সাত সকালে বেশ শুক্‌নো ফ্যাসাদ সৃষ্টি করল তো, মেয়েটি এসে।

তনুশ্রীর সঙ্গে এরপর কি ভাবে কথা বলবে, সেই চিন্তাই করছিল নলিনী বসু। দক্ষ অফিসার হলে কি হবে। এ' রকম মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ে কত বাঘা-বাঘা অফিসার যে ঘায়েল হয়, তার অনেক কাহিনী সে জানে। তাই নিজেকে সামলাবার জন্যই তাকে বলতে হল, নাও কফিটা খেয়ে থানায় চল, ডায়েরীটা করিয়ে দিই।

সহসা এক অপরূপ-রূপ ধারণ ক'রে বসল তনুশ্রী। তাঁর মনে অভিমান, চোখে-মুখে রূঢ়-যৌবনোচিত অব্যক্ত ভাবের প্রকাশ। ভাষায় কেমন যেন অসংলগ্ন সুর। ঠিক সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলার জন্য বোধ হয় সে প্রস্তুত হয়ে আসেনি, তাই অবস্থা বিপাকে পড়ে তাকে তখন বলতে হ'ল, ডায়েরী আপনাকে করিয়ে দিতে হবে না। দয়া করে এখনই শরদিন্দুদাকে একটা ট্রাংকল করুন। তাঁকে বলুন, কালই যেন তিনি বাড়িতে চলে আসেন। নইলে ভীষণ একটা তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে যাবে ওঁদের সঙ্গে বাবার। তিনি কিছুতেই কোন অপমান সহ্য করবেন না। ব্যস্, যাক্ এই কথাটা তাঁকে জানিয়ে দিন। আমি চললুম।

: তনুশ্রী শোন। যেও না—!

ঝড়ের বেগে কথাগুলো শেষ করেই, বিদ্যুৎ গতিতে তন্বুশ্রী চলে গেল, কোন কথা শুনল না। একবার পিছন ফিরেও সে তাকাল না। ঠিক যেন রুদ্রানী! রণচণ্ডী ভাবলেও বোধহয় ভুল হবে না।

বিস্ময়ে হতবাক নলিনী বসু। রহস্যানুসন্ধানীর চোখের সামনেই, মেয়েটি এ'রকম একটা রহস্যের আবরণ বিছিয়ে দিয়ে গেল! সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা এ' পর্যন্ত সে কিছুই বুঝতে পারেনি। এর রহস্যভেদ করতে হ'লে তার মতন লোককেও বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করতে হবে। নচেৎ তন্বুশ্রীর ব্যাপারটা তার কাছে সম্পূর্ণ রহস্যাবৃতই থেকে যাবে। ওর রুদ্র মূর্তি ধারণের কারণটা আদৌ বোঝা যাবে না।

তন্বুশ্রী চলে যাওয়ার পর নলিনী বসুর কণ্ঠে নারী চরিত্রের এক অপূর্ব ব্যাখ্যা, 'আশ্চর্য! এরা যে কখন কি রূপ ধারণ করে, তার কারণ খুঁজে বার করা কি সহজ কথা! স্বয়ং দেবাদিদেব রুদ্রাণীর দশ-মহাবিদ্যা রূপ ধারণের কারণ জানতেন কি? জানলে তিনি ছিন্নমস্তা রূপ দেখে অমন বিচলিত হতেন না।'

দয়াল ঠাকুর, হঠাৎ তার দাদাবাবুকে বিচলিত হতে দেখে অবাক হয়ে গেল। সেও দিদিমণির ঝড়ের বেগে চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে লাগল। বেশ তো মেয়েটি। কিন্তু সে অমন করে এসে চলে গেল কেন?

॥ তের ॥

অনেক চিন্তা ভাবনার পর শেষ পর্যন্ত, তনুশ্রীর সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যই শরদিন্দুকে ট্রাংকল করতে হ'ল নলিনী বসুর। তাছাড়া তাকে যখন খুব শীঘ্রই এখান থেকে চলে যেতে হবে, তখন শরদিন্দুর উপস্থিতিতে দু'টি পরিবারের ভুল বুঝাবুঝির দরুণ যে—তিক্ততা সৃষ্টি হতে চলেছে, তারও একটা মীমাংসা করে দিয়ে যাওয়া প্রয়োজন বলে সে মনে করছে। কারণ তা' না হলে বেচারা শরদিন্দু হয়ত সারা জীবন অশান্তি ভোগ করবে! একটা অস্বাভাবিক কিছুও ঘটে যেতে পারে দুই পরিবারে! সুতরাং ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে ঠিক হবে না।

থানা থেকে নলিনীর ট্রাংকল পেয়ে বাড়িতে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, এই চিন্তায় অস্থির হয়েই কর্মস্থল থেকে ছুটে আসতে হয়েছে শরদিন্দুকে। সে ষ্টেশনে নেমে বাড়ি যাওয়ার পথে, প্রথমেই দেখা করতে গেল থানায় বন্ধুর সঙ্গে, তাই তার অতি দ্রুত পদক্ষেপ, মনও অত্যন্ত চঞ্চল এবং ভয়ার্ত।

নতুন কর্মভার গ্রহণের পূর্বে দিন কয়েক অন্য কোথাও ঘুরে আসার পরিকল্পনা করছিল—নলিনী বসু।. সব শুনে দয়াল ঠাকুর বললে, রথযাত্রা এসে গেল দাদাবাবু। চলুন পুরীর জগন্নাথদেবকে দর্শন করে আসি। সেই সঙ্গে সমুদ্র স্নান— !

বন্ধুর বাসায় ঢুকেই শরদিন্দু বেশ হকচকিয়ে গেল! নলিনী বসুর জরুরী ট্রাংকল পেয়ে সে, অতদূর থেকে ছুটে এলো, আর এখানে দিব্বি আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে তিনি সমুদ্র স্নানের স্বপ্ন দেখছেন!

—কি ব্যাপার! আমাকে আরজেণ্ট ট্রাংকল করে, তুমি দিব্বি আরাম কেদারায় শুয়ে-শুয়ে, সমুদ্র স্নানের স্বপ্ন দেখছ? বন্ধুর কাছে বেশ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বিস্ময়পূর্ণ প্রশ্নটাই রাখল শরদিন্দু।

: কি আর করি বল, আমরা পাপী-তাপী মানুষ। জীবনে এত দিন পুণ্য সঞ্চয় করার কোন সুযোগই যখন এল না, তখন সমুদ্র স্নান, দান করে ইহকালে যদি কিছু পুণ্য লাভ হয়, তাতে ক্ষতি কি? বয়স বাড়ছে, পরকালের কথা ভাবতে হবে না! তাছাড়া—।

অতি শান্ত এবং সংযত ভাষায় নলিনী বসুর জবাব শুনে, শরদিন্দুর মনের উদ্বেগ অনেকটা কেটে গেল। সে বুঝে নিল ট্রাংকলের পিছনে কোন দুঃসংবাদ নেই। আশ্চর্য। তাহলে হঠাৎ কেন ও আমায় ট্রাংকল করলে? মনের স্বগতঃ প্রশ্ন, নিজের মনের মধ্যেই ঘুরপাক্ খেতে লাগল শরদিন্দুর।

বন্ধুর মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরেই মৃদু হেসে স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে নলিনী বসু বলে উঠল, কি হে, আর্জেণ্ট্ ট্রাংকল পেয়ে খুব ভয় পেয়ে গেছ বলে মনে হচ্ছে?

—তা' একটু পেয়েছিলাম বৈকি, তুমি হলেও ভয় পেতে।

: ভয় পেতাম কি হে। রীতিমত ভয় পেয়েই তো তৎক্ষণাৎ ট্রাংকল করতে হয়েছে। এখন তাড়াতাড়ি বাড়িতে চলে যাও। সন্ধ্যার পর এসো, চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। তখন সব কথাবার্তা হবে। ইতিমধ্যে আমার জরুরী কাজগুলো সেরে ফেলি। নতুন বড়বাবু এসেছেন, তাঁকে সাত আট দিনের মধ্যেই কোয়ার্টার খালি করে দিতে হবে। ওঁর স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সাত দিনের মধ্যেই এসে পড়বেন।

দু'মিনিট কি যেন চিন্তা করে নিল শরদিন্দু, তারপর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি তাহলে সাত-আট দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাবে?

: হ্যাঁ, নতুন কর্মভার গ্রহণ করার আগে পনেরো দিন ছুটিতে যাচ্ছি। ছুটি শেষ হলেই নতুন পদের দায়িত্ব—।

—গ্রহণ করবে। নলিনী বসুর বাক্যের শূন্য স্থান পূর্ণ করে দিয়েই শরদিন্দু উঠে দাঁড়াল। সেই অবস্থায় সে আবার প্রশ্ন ক'রল, ছুটিটা তাহলে পুরীতেই কাটিয়ে আসবে ঠিক ক'রলে?

: দেখি, প্রভু জগন্নাথের কি ইচ্ছা। তিনি যদি টানেন তাহলে যাব। শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার সৌভাগ্য তো সবার হয় না কিনা, তাই—।

দয়াল ঠাকুর ভক্ত মানুষ। দাদাবাবুর কথায় সে খুব খুশী হয়েই বলে ফেলল, শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার মন যখন একবার হয়েছে, তখন আমরা এবার যাবই। রথের চাকার ধুলো মাথায় নেওয়ার, আর সমুদ্র স্নানের সাধ আমার অনেক দিনের।

শরদিন্দুকে শুনিয়ে শুনিয়েই নলিনী বসু বলে দিল, দয়ালের সাধ এবার আমাকে মেটাতেই হবে। ওর বয়স হয়েছে, কি জানি কবে পটু করে

মরে-ঠরে যাবে তার ঠিক নেই। কাজে-কাজেই বেচারার শ্রীক্ষেত্র দর্শনের ইচ্ছাটা মিটিয়ে দিই কি বল?

একটু মুচ্‌কি হাসির রেখা ফুটে উঠল নলিনী বসুর বাল্যবন্ধুর ঠোঁটের ফাঁকে। সে দু'পা এগিয়ে যেতে যেতেই বললে, তুমি শ্রীক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখ, আর আমি কুরুক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাই। সন্ধ্যার পর যদি না আসি, তাহলে একবার খোঁজ খবর নিও।

শরদিন্দু ঠিকই বলেছে, তাদের বাড়ি এখন প্রায় কুরুক্ষেত্রই বটে! সেই কুরুক্ষেত্রের ভয়েই তো নলিনী বসু তাকে শীঘ্র বাড়ি চলে আসতে অনুরোধ করেছে। ভয় ও ভাবনা যে তারও হচ্ছে না, তা কিন্তু নয়। কারণ ব্যাপারটা সে সবই বুঝতে পেরেছে। তবে শেষ পর্যন্ত শান্তি রক্ষার জন্য!

দুটি পরিবারের শান্তি বজায় রাখার জন্যই তনুশ্রী যে, তলায়-তলায় এই কাণ্ড করেছে, তা' কিন্তু শরদিন্দু বুঝতেই পারেনি। বরং তার আশঙ্কা ছিল—বনশ্রীকে নিয়ে, সেই হয়ত ট্রাংকল করিয়েছে—এই ভাবতে-ভাবতেই শরদিন্দু, দত্ত বাড়ির সামনের পথ অতিক্রম করে চলে গেল।

অসময়ে শরদিন্দুকে সাইকেল রিক্সায় বাড়ির দিকে যেতে দেখে—অমেত্য, কেন যেন একটু অবাক হয়ে গেল। তাই সে তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় ঢুকে ছোড়দিদিমণিকে সামনে পেয়ে বলল, ওবাড়ির দাদাবাবু—এইমাত্র এলেন।

—কে এলেন? ইচ্ছাকৃত একটু অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়ে তনুশ্রী আবার অমেত্যকে প্রশ্নটা করল, কে এল! কার কথা বললে তুমি?

: সীতাদিদির দাদার কথা বলছি গো। এই মাত্র সাইকেল রিক্সায় তিনি আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেলেন।

—ও তাই বুঝি! তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে কথাটা বললে তনুশ্রী! সঙ্গে সঙ্গে এক পলক তাকাল রাস্তার দিকে—।

বাড়ির ভেতর থেকে বনশ্রী, অমেত্যকে ডাকতেই সে চলে গেল। তনুশ্রীও তার পিছু নিল। অতি সতর্কভাবে দিদির প্রতি তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অমেত্য, এই শুভ সংবাদটি তো সবাইকে, মানে কর্তাবাবুও বড়দিদিমনিকে জানাবে। তখন উভয়ের মানসিক অবস্থাটা অনুধাবন করতে না পারলে, তার গোপন কৌশলটি হয়ত মাঠে মারা পড়বে। এমন

কি আবহাওয়া অনুকূল না হয়ে, প্রতিকূল অবস্থাও সৃষ্টি করতে পারে। তার ফলে সবই ভেস্তে যাবে। নিজেও অপদস্থ হবে নলিনী বসুর কাছে। ভদ্রলোক তখন— ।

নাঃ তেমন কিছু ঘটল না। বরং সংবাদটা শুনে তনুশ্রীর বাবা ও দিদি—যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন, এটাই সে বুঝতে পারল। সুতরাং এর পরের মতলবটা কি উপায়ে হাসিল করা যায়, সেই চিন্তা এখন তার মাথায় ঘুরতে লাগল। দক্ষ দাবা খেলোয়াড়ের মতই তনুশ্রীকে এবার নিজের ঘুঁটি সামলাবার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হবে। নইলে— !

কি একটা কাজে বনশ্রী বাবার ঘরে এসেছিল। তাকে দেখেই প্রমথবাবু বলে উঠলেন, বিকেলে আমাকে একবার মীতার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। অমেত্যকে বলে রাখ, ও যেন গাছ থেকে গোটা দুই ভাল কাঁঠাল কেটে আনে।

—মীতার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন !

: হ্যাঁ, শুধু হাতে যাব কেন ! অমেত্য আমার সঙ্গে ঐ কাঁঠাল দুটো নিয়ে যাবে। শরদিন্দুর ঠাকুরমা অম্বুবাচী পালন করেন। তাঁকে আমি প্রত্যেকবার কিছু ফল-মূল দিই না ?

—সে আমি কাল পাঠিয়ে দেব বাবা। আপনাকে আর কষ্ট করে ওদের বাড়ি আজ যেতে হবে না। ওরা যদি আবার সামনা-সামনি কোন রকম অসম্মানজনক— !

: আরে না, না। আমাদের ওরা পিছনে যাই বলুক না কেন, আমি নিজে ওদের বাড়ি গেলে দেখিস ব্যাপারটা সব মিটে যাবে। তাছাড়া শরদিন্দু যখন রাগারাগি করে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর, আবার এসেছে—তখন আমার একবার গিয়ে বিরোধটা মিটিয়ে দিয়ে আসা দরকার। সামান্য ব্যাপারে মা ছেলের মনোমালিন্য—হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া আমরা যে ওদের শত্রু নয়, এটাও তো শরদিন্দুর মাকে ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে !

বাবার মন্তব্যের পর, বনশ্রী আর কোন কথা বলল না। কিন্তু তনুশ্রী এসে আপত্তি জানিয়ে বলল, না, বাবা ! আজ অন্ততঃ আপনি ওদের বাড়ি যেতে পারবেন না যদি যেতেই হয়, কাল নয়ত পরশু যাবেন।

ছোট মেয়ের আপত্তির কারণ প্রমথবাবু বুঝতে পারলেন। এখনও যে, তার মীতাদের উপর যথেষ্ট রাগ রয়েছে, তা' তিনি বেশ স্পষ্টই বুঝে নিলেন। তাই তাঁকে শরদিন্দুদের বাড়িতে যাওয়ার পরিকল্পনা সেদিনের মতন পরিত্যাগ করতে হ'ল।

অকস্মাৎ শরদিন্দুর বিনা সংবাদে আগমনের ফলে সমগ্র বাড়িটার আবহাওয়া হঠাৎ যেন কেমন বদলে গেল! মীতা তো দাদাকে দেখে আকাশ থেকে পড়ার মত বলেই ফেলল, কি ব্যাপার! ধূমকেতুর মতন এসে উপস্থিত হলে যে?

—খেয়াল হল তাই চলে এলাম। আসল ব্যাপারটা ইচ্ছা করেই চেপে গেল শরদিন্দু।

দাদার জবাবটা যেন, কেমন-কেমন লাগল মীতার, মনের মধ্যে সংশয় দানা বাঁধতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ দরজার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চোখে ও মুখে তার সন্দেহের ছাপ, কারণ—!

শরদিন্দু রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর অনেক জল বয়ে গেছে সুবর্ণরেখার বুক দিয়ে। অনেক পলি মাটিও জমেছে, দত্তবাড়ির ভাঙ্গা ঘাটের কোলে।

মাটির পুতুলের মতন দরজার পাশে মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, খেঁকিয়ে উঠলেন সুমিত্রা দেবী। তিনি বলে উঠলেন, হ্যাঁরে, চায়ের জল চাপাতে হবে না? ওকে কিছু খেতে দিতে—!

মায়ের কথায় বাধা দিল শরদিন্দু। শান্ত—অতি সংযত তার কণ্ঠস্বর না, আমি এখন চা খাব না। নলিনীর বাসায় এই মাত্র চা খেয়ে এলাম। খুব স্বাভাবিক ভাবেই কথাকটা বললে শরদিন্দু, তার মাকে।

মা ও বোনের কানে কিন্তু কথাটা ভাল লাগল না, কাজেই তৎক্ষণাৎ সুমিত্রাদেবী বেশ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কবে এসেছিস?

—কবে এসেছিস মানে! মায়ের কথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হল শরদিন্দু।

মীতা—দাদার মনের ভাবটা বুঝতে পেরেই একটু ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে চেষ্টা করে, মানে আবার কি! বন্ধুর বাড়িতে এসে উঠেছ, তাই মা জিজ্ঞেস করছে।

—ও! ঐ একটি শব্দ উচ্চারণ করেই শরদিন্দু থেমে গেল। সে ব্যাপারটা নিয়ে আর কথার জাল বিস্তার করতে দিল না। একমনে নিজের স্যুটকেসটা খুলে মীতার জন্য আনা নূতন কাপড়টা বার করে দিয়ে বলল, নে তোর কলেজে যাবার জন্য কাপড়টা এনেছি।

মীতা দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। কাপড়খানা হাতে নিয়ে সে চাপা গলায় বলে, কলেজে আমি আর যাব না।

—কেন? কলেজে আর যাবি না কেন! এরপর বি. এ. পরীক্ষা দিতে হবে না? বি, এ, পাশ না করলে কোন চাকরীই পাবি না।

বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতেই মীতা চুপ করে গেল। সদ্য প্রকাশিত পার্ট-ওয়ান এর পাশ কোর্সের তিনটে পেপারে ব্যাক পাওয়ার খবরটা লজ্জায় সে দাদাকে আর বলতেই পারল না। কারণ তার দাদা খুব আশা করেছিল, সে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করবে।

মীতাকে চুপ করে থাকতে দেখে শরদিন্দুর প্রশ্নের পর প্রশ্ন—তোর পরীক্ষার ফল কি হল? রোল নম্বরটা আমার জানা থাকলে, গেজেট দেখে আসতে পারতাম। খবরের কাগজে দেখলাম, এবার নাকি বহু ছেলে-মেয়ে বি, এ, পার্ট-ওয়ান পরীক্ষায় ব্যাক পেয়েছে!

শরদিন্দু এতগুলো কথা বলার পরও মীতা কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে সুমিত্রা দেবী প্রমাদ গুণতে লাগলেন। কারণ তিনি জানেন যে, বোনের পরীক্ষার ফল শুনলেই ছেলে ভীষণ—!

মীতার পরীক্ষার ফল শুনে ভীষণ সমালোচনা করছিল তার কলেজের বান্ধবীরা, তারা বলছিল, ওর পরীক্ষার ফল এবার এই রকম হবে তাতো জানা কথা। শেষের দিকে মীতা যে ক্লাসই ক'রত না! তমাল বরণের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় বসে রোজ আড্ডা দিত, আর সবার কাছে নলিনী দারোগার নামে যা' নয় তাই বলে বেড়াত! ক'মাস আগেও যে ছিল নলিনী দারোগার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সেই এখন তার চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ করে বেড়াচ্ছে! ইউনিয়নের ছেলেদেরও লেলিয়ে দিয়েছে তাঁর পিছনে। তারা নাকি—।

সার্বজনীন সমালোচনার আসরে হঠাৎ সেদিন যবনিকাপাত ঘটাল সেই পাগলটি এসে। যে প্রায়ই পথে-পথে ঘুরে নিজের প্রতারিত জীবনের অসংলগ্ন কাহিনীগুলো বলে পথচারীদের সতর্ক করে দেয়। কেউ কেউ

তার কথা, নেহাৎ পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়ে পথ অতিক্রম করে চলে যায়। আবার অনেকে কৌতূহল বশতঃ ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে পাগলের কথাগুলি শোনে। কারণ লোকটি পাগল হলেও তার বক্তব্য অনেকেরই হৃদয় স্পর্শ করে, চিত্তে চাঞ্চল্য ঘটায়।

অশোক রাস্তায় কোনদিন পাগলামী করে না, তবু সে আজ সকলের কাছে পাগল বলেই পরিচিত। তার প্রতিটি কথায় মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, সামাজিক অন্যায় আর সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নানা প্রতারণার কাহিনী। শ্রোতাদের কাছে সেই কাহিনী অবিশ্বাস্য মনে হলেও অশোকের অন্তরের অন্তস্তলে তার প্রত্যেকটি কথার মূল্য অনেক, কারণ সবই যে ধ্রুব সত্য। সত্যের মূল্যায়ন, অসত্যের কাছে আজ পরাজিত, তাইতো সে পথে-পথে চীৎকার করে ঘুরে বেড়ায়—। কখনও শান্ত, কখনও উত্তেজিত তার কণ্ঠস্বরের বিচিত্র ধ্বনি শুনে পথচারীরা থমকে দাঁড়ায়। যাঁরা তাকে চেনে অশোকের প্রতারিত জীবন কাহিনী জানে, তাঁরা কিছুক্ষণের জন্য হয়ত একটা তপ্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে—হুঁ একেই অদৃষ্ট বলে! বেচারা ভদ্রলোকের ঘরের ছেলে! ও কি ছিল আর আজ কি অবস্থা তার!

স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা সবাই চেনে অশোককে। তাইতো অত্যন্ত দয়ার চোখে সকলে তাকে দেখে থাকে। তার প্রত্যেকটি কথা শুনতে তাদের খুব ভাল লাগে।

অশোক পাগলার কথাগুলো শুনতে, কলেজের ছেলে-মেয়েদের ভাল লাগবে না কেন? তার যে তীব্র রসবোধ আছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের উপর অশোকের শ্লেষাত্মক মন্তব্যগুলো শুধু শোনার মতই নয়, ভাববার মতও বটে। কিন্তু এ'সব মন্তব্যের বিচার বিশ্লেষণ কেউ কি করবে!

সেদিন কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েদের পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে সমালোচনা করতে দেখে হঠাৎ সে বলে উঠল, কি! দিদিদের মুখে আজ হাসি নেই যে? বিশ্ববিদ্যালয় সবাইকে ঠকিয়েছে?

কথাটা শেষ করেই অশোক, অদ্ভুত ভঙ্গীতে হেসে উঠল। তারপর হাসতে-হাসতেই সে বলে চলল, ঠগবাজ—সবাই ঠগবাজ! নাও আবার তোমরা বাপের অর্থ আর নিজেদের শ্রম নাশ কর। ফের পরীক্ষা দিয়েও

কি রেহাই পাবে? ফলাফল জানার জন্ম সেই ছয়মাস বসে থাকতে হবে, বুঝলে। কিছু বলতে যাও, দু'হাজারী তিনহাজারী মাইনের বাবুরা, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের বাণী শোনাবে। তাঁরা বাণী-বিদ্যাদায়িনী জমিদারীর এখানকার সোলএজেন্ট যে! তাঁদের খেয়াল-খুশী মতই বিশ্ববিদ্যালয় চলছে, দেখছনা!

অশোকের মন্তব্য শুনে মেয়েরা উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। সকলকে হাসতে দেখে পাগলা অশোক ভীষণ রেগে উঠে বলতে লাগল, 'আমার কথা শুনে তোমরা হাসছ! বলি, বাপের কষ্টার্জিত টাকা গুলোর কি কোন দাম নেই? এই যে রোজ পয়সা খরচ করে কলেজে আসছ, মাসে-মাসে মাইনে দিচ্ছ, পরীক্ষার ফি গুনছ, হোস্টেলের খরচ মেটাচ্ছ, এ'গুলো যোগাতে বাপের মৃত্যুশ্বাস উঠছে তার খবর রাখ?

ইউনিয়নের জি. এস. পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বেশ কৌতুক করেই বললে, কি অশোকদা, আজ তুমি আমাদের বাপ নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করলে কেন?

—ক'রবনা! সকালে মণি স্যাকরার দোকানে এক ভদ্রলোক এসে, দু'গাছা সোনার চুড়ি নিয়ে সেকি কান্নাকাটি! তাকে জিনিস বন্ধক রেখে একশ টাকা ধার দিতেই হবে। তাঁর ছেলে-মেয়ের কলেজের মাইনে, আর ব্যাক পরীক্ষার ফি দেবেন—। মাসের শেষ এখন, নাও বোঝ ঠ্যালা! মানে—মরতে মরণ সানাই ওলার! আজকাল ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়ার খরচ জোগাতেই বাপ-মায়ের দফা-রফা। তারপর তাদের বিয়ে চাকরী! সেতো আকাশ-কুসুম। অর্থাৎ ঠগীদের পাল্লায় পড়ে তোমরাও ঠগবাজ হও। এখন দেখছনা তাদেরই যুগ। নইলে তোমাদের এই অবস্থা হয়?

॥ চৌদ্দ ॥

গত তিন দশকের স্মৃতিচারণ করতে বসে নলিনী বসু কেন যেন অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করে আজ জন-জীবনের বিবর্তন দেখে। তাই তাকে আবার নতুন ভাবে পর্যালোচনা করতে দেখা যায় সমাজ ও মানব জীবনে অধুনা সৃষ্ট বৈপ্লবিক চেতনা ও তার প্রতিক্রিয়ার উপর।

কালের কুটিল গতির সঙ্গে-সঙ্গে সত্যিই অনেক পরিবর্তন ঘটেছে আমাদের, যার প্রকাশ এখন দেখা যাচ্ছে প্রতিটি নর-নারীর চরিত্র, আচার ও আচরণের মধ্যে। কত তফাৎ সেই পুরোন যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের। আজকাল একটা যুগ-যন্ত্রণায় যেন আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—সবাই। নিত্য নতুন যন্ত্রণার চাপে আমাদের জীবন জর্জরিত, ক্ষুব্ধ সকলে। তবু নানা প্রতিকূলতায় আমাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সর্বদাই মন বিদ্রোহী হয়ে উঠছে।

পুরোন যুগকে পেছনে ফেলে রেখে আজ নতুন যুগের এমন একটা সন্ধিক্ষণে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে নলিনী বসু, যার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে তাকে বার-বার শুধু ঐ যুগ-যন্ত্রণার কথাই ভাবতে হচ্ছে।

ভাববারই কথা, কারণ প্রমোশন পাওয়ার পর সে বাস্তব জগৎ থেকে যেন অনেক দূরে সরে এসেছে। এখন অফিসে গেলেই তার কাছে আসে শুধু নানা তথ্যপূর্ণ বিবরণ আর বিচিত্র সব বিশ্লেষণের তাগাদার জরুরী ফাইল। যার উপর ভিত্তি করে তাকে গোপনে তৈরী করে দিতে হবে রাজনৈতিক দাবা খেলার ঘুঁটি। সেই খেলার হারজিতের তালিকায় হয়তো মারা পড়বে- অশ্ব, গজ, নৌকো নয়তো ঘায়েল হবে রাজা, উজির। তারপর শুরু হবে আবার নতুন কৌশলের খেলা। যার ধকল সামলাতে হবে তাদেরই।

নতুন কর্মস্থলের সব দেখে-শুনে, কত সময় আপন মনে হেসে উঠেছে নলিনী বসু। সেই হাসির অন্তরালের লুকিয়ে আছে তার দারোগা জীবনের অনেক তদন্ত কাহিনী। সেই সব রহস্যপূর্ণ তদন্ত কাহিনীর সূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে, কত দিন তাকে সমাজের নানা বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্য দেখতে হয়েছে তার ঠিক নেই! প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে কল্পনাতীত বহু ঘটনা, যা

ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, লিখে রাখা যায়না দিনলিপির মলিন পৃষ্ঠায় তবে একটা কথা বলা যায়, বাহ্যিক ঢকানিনাদে মানুষের প্রকৃত রূপ জানা যায় না। তাঁদের রূপ ও স্বরূপ এর রহস্য বুঝতে হলে যেতে হবে—কটু-সমালোচনার মধ্যে, সেই তিক্ততাতে যেয়ে কাজ নেই। বরং যাদের বাকচাতুর্যে আমরা সাময়িক মুগ্ধ হয়ে ভ্রান্ত পথে পা দিই, তাঁদের—।

এর বেশী ভাবতে পারে না নলিনী বসু। হঠাৎ তার ভাবনার খেই কোথায় যেন হারিয়ে যায়। ঠিক শরদিন্দু সেদিন যেমন নলিনীকে সাংসারিক অশান্তির কথা বলতে এসে কথার খেই হারিয়ে ফেলে উদাস মনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল, তেমনি তাকেও কয়েক মিনিট চুপ করে বসে থাকতে হল এই মুহূর্তে।

দাদাবাবুকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে দয়াল ঠাকুর এসে বললে, ডাকঘরে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, যেতে হবে না?

দয়ালের কথায় নলিনী বসু যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। তাড়াতাড়ি সে পুরীর হোটেলের ম্যানেজার বাবুকে চিঠিখানা লিখে ডাকে পাঠিয়ে দেয়।

হঠাৎ ব্যক্তিগত জরুরী কাজের জন্যই নলিনী বসুকে পুরী যাওয়ার দিন বদলাতে হয়েছে। নির্ধারিত দিনের এক সপ্তাহ পরে তারা যাবে আপাততঃ তাই স্থির করতে হল।

হাসতে হাসতে সত্যেন বাবু এসে, নলিনী বসুকে বললেন, স্যার! আমার কথা তাহলে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল বলুন। আমি তো আপনাকে বলেই ছিলাম—বাসস্থান পরিবর্তন, আর দূর ভ্রমণে দেখবেন আপনার এখন বাধা আসবে! দেখলেন তো শেষ পর্যন্ত তাই হল!

প্রাক্তন সহকর্মীর কথায় উত্তর কি দেবে, তাই ভাবছিল নলিনী বসু। কারণ তাঁর কোষ্ঠী বিচার করে সত্যেনবাবু অনেক কথাই সেদিন বলেছিলেন। তিনি বার বার সংশয়ও প্রকাশ করেছিলেন ঐ ছুটিতে যাওয়ার ব্যাপারে। লগ্নস্থ গ্রহগুলির অবস্থান সম্পর্কেও তাঁর মতামত খুব আশা-ব্যঞ্জক নয়। কারণ যাঁর—!

সত্যেনবাবুকে আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে দিল না নলিনী বসু। সে বলে উঠল, আরে ভাই—ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। ও নিয়ে চিন্তা করে লাভ কি!

—ভাগ্য তো স্যার আপনার খারাপ নয়। পঞ্চম পতি, নবম এবং দশম-পতি, আপনাকে শুভ ফল দিচ্ছে। যা' একটু গোলমাল ঐ সপ্তমপতিকে নিয়ে! দেখুন শেষ পর্যন্ত কি হয়।

মানুষের চিত্ত-দুর্বলতা ঐ সপ্তম অর্থাৎ জায়া স্থানেই, নলিনী বসু তা' ভাল করেই জানে। বোধহয় সেই জন্যই শরদিন্দুকে ডাকিয়ে সেদিন খোলাখুলি বলে দিল ব্যাপারটা! বাল্য-বন্ধুকে সে ভুল বুঝে, নিজের পারিবারিক অশান্তির জন্য হয়তো দায়ী করতে পারে, এ' দুর্ভাবনাও তার কম ছিল না।

দুই পরিবারের বিরোধের কারণটা এতদিন পরে বুঝতে পারল শরদিন্দু। কিন্তু মীমাংসার পথ খুঁজে বার করতে পারছে না। নিতান্ত অসহায়ের মতনই সে বললে, ব্যাপারটা যে ভাই এত জটিল আকার ধারণ করবে, আদৌ তা আমি বুঝতে পারিনি। যদি—!

: এর মধ্যে যদির কিছু নেই শরদিন্দু। সংসারে এ'রকম অনেক অশান্তি ঘটে থাকে, যার মোকাবিলা ঠিক মতন করতে না পারলেই মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সুতরাং তোমার পক্ষে এর মীমাংসা করে ফেলাটা, কঠিন কিছুই নয়।

নলিনী বসুর কথা শুনে—দুঃখের ম্লান হাসি ফুটে উঠল শরদিন্দুর ঠোঁট-দু'খানিতে। সে এবার বললে, যত সহজ তুমি মনে করছ, ঠিক তত্টা সহজে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে পারলে তো ভালই হোত, কিন্তু তা' পারছি কৈ? মীতার মাথা ঠিক নেই। সে কেমন যেন, আবোল-তাবোল বকছে! মা বলছেন, ও নাকি কাকে রেজেষ্ট্রী ম্যারেজ করতে চায়। মুস্কিল হল পাত্রটি আমাদের স্ব-জাতি, মানে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়! তার সঙ্গে—!

কথাটা শেষ করতে পারল না শরদিন্দু, হঠাৎ থেমে গেল।

বন্ধুর অসমাপ্ত বক্তব্যটা কি, তা বুঝে নিতে নলিনী বসুর কোন অসুবিধা হল না। তবে এই ধরনের কথা শরদিন্দুর মুখে আজ তাকে শুনতে হবে, তার জন্য সে বোধহয় প্রস্তুত ছিল না। কারণ আর যাই হোক, মীতার মতন মেয়ে হঠাৎ এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, নলিনী বসু তা বিশ্বাস করতে পারছে না। কারণ সত্যিই তাকে সে স্নেহ করত, ভালবাসত। নিষ্কাম সেই ভালবাসাকে ওরা যদিও অন্য রূপ দিতে চেষ্টা করেছিল, পারেনি। তাই বোধহয় এত যন্ত্রণা, বিড়ম্বনা।

বনশ্রীও প্রথমটায় বিশ্বাস করতে চায়নি ঘটনাটা! কিন্তু সে যখন সমস্ত ব্যাপারটা তমুশ্রীর মুখ থেকে শুনল, তখন মীতার প্রতি তার মন বিরূপ হয়ে উঠল। তাকে বলতে শোনা গেল, ও শেষ পর্যন্ত এই কাণ্ড করে বসল! ছিঃ ছিঃ, এখন লোকের কাছে মুখ দেখাবে কি করে?

মীতার কাণ্ড-কারখানা দেখে, অবাক হয়ে গেছে তমুশ্রী! দিদিকে সে ফস্ করে বলেই ফেলল, তমাল বরণ মীতুদির চাইতে বয়সে বেশ ছোট। সম্পর্কেও খুব সম্ভব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, ওরা এবার একসঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছিল। দু'জনেই ফেল করেছে।

সেদিন কার কাছে যেন ঘটনাটা শুনেছেন প্রমথবাবুও। সংবাদটাকে তিনি শত্রুর কুৎসা প্রচার মনে করে প্রথমটায় উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনশ্রীর কাছে বিস্তারিত সব শুনে অত্যন্ত বিস্ময় বোধই শুধু করলেন না, মর্মাহত হয়ে বললেন, একি করল মেয়েটা?

আজ বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির অবস্থা প্রমথবাবুর অজানা নয়। তাই তিনি যুগচেতনার সুফল ও কুফলের কথা চিন্তা করছিলেন। এরই পাশাপাশি তাঁর মানস মুকুরে ভেসে উঠছিল সামাজিক অবক্ষয়ের নানা করুণ দৃশ্য! অত্যন্ত বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি স্বগতোক্তি করতে তাই বাধ্য হলেন, এই কি আমাদের কল্যাণকর সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি?

একটা অব্যক্ত উত্তেজনায় প্রমথবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মানসিক যন্ত্রণাকে তিনি কিছুতেই শান্ত করতে পারলেন না। অর্থনীতি, সমাজনীতির নানা জটিল প্রশ্ন তাঁকে বড় বিব্রত করে তুলল। শত চেষ্টা করেও তিনি সেই প্রশ্নগুলির জবাব খুঁজে পেলেন না, নিজেকে তাই খুব অসহায় বোধ করতে লাগলেন।

বাবার মনের অবস্থা বুঝতে পারল বনশ্রী। তাই সে এসে, অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চেষ্টা করল। কারণ তাতে প্রমথবাবুর চিত্ত-চাঞ্চল্যজনিত ক্লেশ অনেকটা লাঘব হবে। নইলে রাতে ঘুমোতে পারবেন না। রক্তের চাপ বেড়ে গেলে হয়ত বিপদ ঘটাতেও পারে! ক'দিন আগেই তো অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

শরদিন্দুর পারিবারিক ঝামেলার সংবাদ শুনে বনশ্রী মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মনে যে, সে খুব অশান্তি বোধ করছিল তাতে কোন সন্দেহ

নেই। মীতার মতিভ্রংশের কথাও চিন্তা করলে দুঃখ হয়। কারণ সে মীতাকে অন্তরঙ্গ বান্ধবী রূপে গ্রহণ করেছিল, ভালবেসেছিল অত্যন্ত গভীর ভাবে। সেই ভালবাসার মর্যাদা রক্ষা করতে পারল না মীতা। মূল্য দিল না তাদের বন্ধুত্বের! হতাশায় বিভ্রান্ত হয়ে ভুল বুঝল প্রিয় বান্ধবীকে। ভুল করে ঝাঁপ দিল অকূল সাগরে।

সত্যিই দত্ত পরিবারকে ভুল বুঝেছে মীতা, আর সেই ভুল বোঝানোর মূলে ছিলেন তার মা! ওরা প্রকাশ্যে এ কথা স্বীকার অবশ্য এখন পর্যন্ত করেনি। তবে প্রমথবাবুর কাছে শরদিন্দু সে কথা স্বীকার করে গেছে। তার জন্য ক্ষমা চাইতে গিয়ে তার চোখ দুটি ছল-ছল করে উঠেছিল! তাই বেশীক্ষণ সেদিন প্রমথবাবুর সামনে বসে থাকতে পারেনি, চলে গেছে।

শত্রুর অভাব নেই মিত্র পরিবারের। আরও শত্রুদের হাসাল মীতা। তাঁরা সুযোগ পেয়ে এখন কত কথাই না বলছে। অথচ এর বিন্দু বিসর্গ কিন্তু শরদিন্দু জানে না। সাংসারিক কলা-কৌশল, কিংবা ছল চাতুরির ধারও সে ধারে না। সাধারণ মানুষের মতই মা-বোন, এবং অন্যান্য পরিজন নিয়ে একসঙ্গে থাকতে চেয়েছিল বেচারা। একটা সুখী পরিবার গড়ার স্বপ্নও দেখত সে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই নির্মম পরিহাস যে সামান্য একটা ভুলের জন্য এই পারিবারিক দুর্ঘটনা!

ঘটনা যত সামান্যই হোক না কেন, স্নেহবৎসল প্রমথ দত্তর অন্তর, মিত্র পরিবারের ভবিষ্যৎ চিন্তায় বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। বার-বার তিনি শরদিন্দুদের ও তার মায়ের কথা বলছিলেন। তাঁর ধারণা বোধহয় সুমিত্রা দেবীর ঔদাসিন্যের ফলেই এই অঘটন ঘটেছে। তিনি যদি সতর্ক থাকতেন, তাহলে মীতা মতিভ্রষ্টা হতে পারত না। শুধু প্রমথ বাবুই নয়, এ'কথা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন অনেকে বলছে।

যে যাই বলুক, নলিনী বসু কিন্তু অন্য কথা বলেছে। কারণ তার অভিজ্ঞতা থেকে সে এ'ধরণের মন্তব্য করলে বিস্ময়ের কিছু নেই। বরং তার মন্তব্য এখন পর্যালোচনা করে দেখলে বোঝা যাবে, নলিনী বসুর দৃষ্টি কত গভীরে। কতটা সহানুভূতিশীল তার মন। কৈশোরে যে মনে সহানুভূতির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল—বাগবাজারের চারু পাগলার খেওয়ালের জিখন দেখে, সেই চঞ্চল কিশোর মন আজ পরিণত

বয়সে ধীর-স্থির। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রকাশ তাঁর প্রতিটি সংলাপে। বলিষ্ঠ বাচন ভঙ্গীর কোথাও ভাবের আবেগ নেই। নেই তাতে কোন উত্তপ্ত উচ্ছ্বাস। আছে কেবল বাস্তব জগতের বঞ্চিত, অবহেলিত, রিক্ত কয়েকটি জীবনের অব্যক্ত বেদনার সাময়িক অভিব্যক্তি।

শতাব্দীর ইতিহাসে এ' অভিব্যক্তি নতুন নয়। ব্যর্থ-প্রেম যুব মানসে কি কেবল জিঘাংসা সৃষ্টি করে! না, নর-নারীর সুকোমল প্রবৃত্তিগুলি বিনষ্ট হয়ে এক পাশবিক চরিত্রে পরিণত হয়?

এটা নিছক আজকের মানুষের সুখ-দুঃখের কথা কিংবা কারও মামুলি প্রশ্ন নয়। ভারতীয় প্রাচীন মহাকাব্যের মধ্যেও রয়েছে সেই এক মহা-জিজ্ঞাসা।

এই জিজ্ঞাসা অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও তেমনি রয়েছে। শুধু গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে, যন্ত্রণা ক্লিষ্ট জন-মানসে নিত্য নতুন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, জিজ্ঞাসা চিহ্নর সংখ্যা একের পর আর একটি বাড়িয়ে দিচ্ছে। সেই জিজ্ঞাসা চিহ্নগুলি কি কালের কষ্টি-পাথরে শুধু আঁকাই থাকবে!

—না।

বিবেকবাণী শুনে চমকে উঠল নলিনী বসু। একবার ফিরে তাকাতে চেষ্টা করল ধূসর পদচিহ্নগুলির দিকে।

সেদিনও সৃষ্টি হয়েছিল অস্থির জনমানসে নিত্য নতুন ঢেউ, যন্ত্রণা-বেদনার সকরুণ চিত্র—। লক্ষ লক্ষ যন্ত্রণাদগ্ধ মানব প্রত্যক্ষ করেছে প্রেম ও ভালোবাসা, যখনই পরিণত হয়েছে লালসার বহ্নিশিখায়। তখনই দেখা দিয়েছে রক্তাক্ত সংগ্রাম, পাশব শক্তির আস্ফালন, দানবের অট্টহাসিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হলেও ধ্বংস করতে পারেনি কোনদিন সত্য, শিব, সুন্দরকে। যাকে কেউ আজও অস্বীকার করতে পারেনি, এমন কি ভারতের লোকায়ত্ত শাসনও না। সেই সত্য, শিব ও সুন্দরের সু-সংস্কৃত রূপই দেখাতে পারে এখন অস্থির যুব-মানসে মুক্তির আলোক বর্তিকা। অশান্ত হৃদয়ে দিতে পারে শান্তির প্রলেপ। সৃষ্টি করতে পারে এক নতুন ভাষা, নতুন জীবনাদর্শ। কিন্তু তেমন ভাষ্যকার খুঁজে পায় না নলিনী বসু। তাই অন্তরের কথা অন্তরেই থেকে যায়, ভাষায় রূপায়িত হয় না।

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

গ্রাম্য-কিশোর।

রহস্যের অন্তরালে।

দুই-ভাই।

গ্রামের-কথা।

শ্রীমতীর স্বাক্ষর।

রূপ ও রূপান্তর।

ক'লকাতা শহরের আদিকথা।

পৃথিবীর রূপান্তর।

সমাজসেবীর দিনলিপি।

সমাজসেবীর নানা কথা। (রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত)

যস্মিন দেশে যদাচারঃ।

সদানন্দের নতুন গল্প।

সদানন্দের নানা গল্প।

নতুন-পাঠশালা।

জীবন সংগ্রামের কথা।

তার মাঝে পাড়া ঘুরে এলাম।

সিদ্ধের ফলেই য় গল্প।

মীতা মতিভ্রষ্টার কথা নয়।

পর অনে য়ী ভারত।

ভারতের ধর্মসাধক।

ঠাঁই নাই।

ঢেউয়ের পর ঢেউ।

রুদ্র-পলাশ।

প্রভৃতি